কান্না

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক —ময়ূখ বসু
১৯৬০
৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক —রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদশিল্পী—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ছয় টাকা পঞ্চাশ ন.প.

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত

পরম-প্রীতিভাজনেষু

সাধারণ সংসারী মানুষ হ'লে হয়তো ক্রোধের এবং ক্ষোভের পরিসীমা থাকত না। মর্মান্তিক আঘাতে হয়তো যন্ত্রণায় অধীর হয়ে বলে উঠত—"তুমি যাও, তুমি যাও—এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও। শুধু আমার সামনে থেকে নয়, আমার আশ্রয় থেকেই তুমি চলে যাও। আর না—যথেষ্ট হয়েছে।" কিন্তু ফাদার ন্যাথানিয়েল বিশ্বাস বিচিত্র মানুষ। প্রকৃতি বিচিত্র—জীবনের অতীত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতও বিচিত্র। সংসারে সর্বস্ব হারিয়েও ঘোরতর সংসারী। পাড়াপ্রতিবেশী পরিচিত সকল জনেই তাঁকে ভালবাসে—একটি পরম স্নেহ পোষণ করে এই মানুষটির জন্য। শ্রদ্ধাও করে সাধারণ মানুষ—ফকীর ব'লে থাকে তাঁকে। বলে—এই তো আসল ফকীর আদমী। বড়মানুষেরা—বিশেষ ক'রে কৃশ্চান সমাজের বড়লোকেরা তাঁকে সন্ন্যাসী ফকীর বলে না কিন্তু বলে 'গুড সোল'—ভালমানুষ।

কলকাতায় এলিয়ট রোডের এলাকায় একখানি বাড়িতে বাস করেন। সংসারে নিজের কেউ নেই; একটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে তিনি ছেলেবেলা থেকে পালন করেছেন; জন এবং লনা। তাদের দেখেশোনে একটি প্রৌঢ়া—তাকে ফাদার ন্যাথানিয়েল থেকে জন লনা সকলেই চাচী বলে ডাকে। এই চাচীও কুড়োনো মেয়ে; ফাদার ন্যাথানিয়েলের সংসারে আশ্রয় পেয়েছিল মন্বন্তরের সময়;—যে বছর অন্নাভাবে গ্রামের মানুষেরা শহরে এসে পথে পথে একটু ফ্যান একমুঠো এঁটোকাঁটা চেয়ে চেয়ে ফিরেছে এবং পথের উপর পড়ে মরেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সেই বৎসর। ১৯৪২।৪৩ সালে। চাচী তার স্বামীর সঙ্গে ফ্যান এবং এঁটোকাঁটার প্রত্যাশায় কলকাতা এসেছিল—বাড়ি সুন্দরবন অঞ্চল—এসে কলকাতায় চেয়ে খেয়ে যখন পেট ভরেনি তখন ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে খেয়ে বাঁচতে

চেষ্টা করেছিল। সেই সময় একদিন বর্ষার রাত্রে তারা এসে আশ্রয় নিয়েছিল ফাদার ন্যাথানিয়েলের বাড়ির ফালিটাক বারান্দার উপর। ফাদার ন্যাথানিয়েল রাত্রে যখন তাঁর বেহালাখানি বগলে ক'রে বাড়ি ফিরলেন তখন দাওয়ার ধারে চাচীরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই জ্বরে প্রায় বেহুঁশ। ন্যাথানিয়েল তাদের বাড়ির ভিতর দিকে বারান্দার একটুকরো ঘরে জায়গা না দিয়ে পারেন নি। তখন বাড়িতে তাঁর লোকের মধ্যে বুড়ো চাকর গোমেশ আর পাঁচবছরের লনা। সেই অসুখে চাচীর স্বামী মারা গেল—চাচী থেকে গেল ফাদারের সংসারে। লনার জন্য দরকার ছিল চাচীর মত একটি আয়ার। ফাদার ন্যাথানিয়েল বলেছিলেন—দেখো বেটী, আমি কৃশ্চান—আমার ঘরে থাকতে যদি তোমার মনে হয় ধর্ম গেল তবে থাকতে আমি বলব না। চাচী বলেছিল—আমাকে তাড়িয়ে দিও না বাবা আমি মরে যাব। তুমি আমার বাপ। হেসে ন্যাথানিয়েল বলেছিলেন—থাক। আমার ঘরে থাক তুমি। আজ থেকে তুমি আমার চাচী। গোমেশ বুড়ো আপত্তি করে নি। তার ভার কমবে। ওই বাচ্চা মেয়ের ভার কি পুরুষমানুষ বইতে পারে!

চাচী এর পর এই প্রৌঢ় ফাদার আর লনার মমতায় এমনই জড়িয়ে গেল যে সেই মমতার বলে সেই-ই হয়ে উঠল সংসারের প্রায় সর্বময়ী। লনার ছেলেবেলা রিউম্যাটিক ফিভার থেকে একখানি পা প্রায় অক্ষম হয়ে গেছে, অনেক দিন পর্যন্ত হাঁটতে পারে নি; অনেকে মনে করত ও মেয়ে কোনদিনই হাঁটতে পারবে না, কিন্তু চাচী তার অদম্য উৎসাহে এবং সযত্ন সেবায় আঙুল ধরে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে তাকে যেন খানিকটা সক্ষম ক'রে তুলেছে। বিনা সাহায্যেই সে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে হাঁটে। ছেলেবেলা রাত্রে সে তেল গরম ক'রে মালিশ করেছে—গল্প বলেছে; লনার জীবনে মায়ের স্নেহের অভাব সে ঘটতে দেয় নি। ফাদার ন্যাথানিয়েল বেহালা বাজান। কলকাতার নাম-করা বেহালা-বাদক ন্যাথানিয়েল। ইংরিজী,

দেখলে ফাদার দেওয়াল থেকে একটা ছবি খুলে হাতে নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছেন। তাকে দেখে যেন খানিকটা চমকে উঠে ছবিখানা হাতে নিয়ে ওঘরে চলে গেলেন। লনার ঘরে। তারপর ফাদার বিকেলবেলা তাঁর বেহালাখানি নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেলে চাচী ছবিখানা দেখেছিল। ছবিখানা ফাদারের মরা ছেলে মেয়ের ছবি। সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল—ছেলেটার মুখের সঙ্গে ফাদারের ছেলের আশ্চর্য মিল। এরপর আর সে কোন কথা বলে নি এ নিয়ে।

এমন কি যে দিন ছেলেটার জ্ঞান হ'ল, যখন সে এই বাড়িঘর সাজসরঞ্জাম ফাদার ন্যাথানিয়েলকে দেখে বিহ্বল হয়ে তাকাচ্ছিল—যখন ফাদার হাসিমুখে তার বিছানার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—ভাল মনে হচ্ছে, কি খাবে? এবং তার উত্তরে যখন ছেলেটা দুটো আঙুল মুখের উপর রেখে বলেছিল—বিড়ি, একঠো বিড়ি দিজিয়ে! তখনও চাচী ফাদারকে কিছু বলে নি। শুধু সেই দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল মাত্র।

সেই ছেলে! নাম ছিল বাচ্চি। তাই সে বলেছিল। তার নাম আজ জন। ফাদার ন্যাথানিয়েল তাকে কৃশ্চান ধর্মে দীক্ষা দিইয়ে ছেলের মত যত্নে আজ বাইশ বছরের জোয়ান করে তুলেছেন। যে ঝঞ্ঝাট ওর জন্য পুইয়েছেন তার কথা মনে হলে চাচী শিউরে ওঠে। খুনের দায়ে পড়েছিল। অবশ্য মিথ্যে দায়, কিন্তু ফাদার তার জন্যে মকর্দমা চালিয়েছেন—খালাস করেছেন। বার বার পালাতে চেষ্টা করেছে—বার বার তাকে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আটকে রেখেছেন। স্কুলে পাঠাতে সাহস করেন নি—হয়তো কি করবে—হয়তো পালাবে, বাড়িতে পড়িয়েছেন। একতাল ময়লাকে ধুয়ে ধুয়ে জীবনের মধু মিশিয়ে মিশিয়ে তাকে চন্দন করতে চেয়েছেন। সেই ছেলে তাঁর মুখের উপর এমন

উদ্ধতভাবে অপমান করতে পারে—কঠিন কথা বলতে পারে—এবং বললে ফাদার ন্যাথানিয়েল মাথা হেঁট ক'রে সহ্য করেন—এর চেয়ে মর্মান্তিক বিস্ময় আর কি হ'তে পারে! অন্য যে কেউ হোক সে বলে উঠত—যাও যাও, এই মুহূর্তে তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যাও। চলে যাও, চলে যাও। তোমার মুখ আমি আর দেখতে চাইনে। তুমি চলে যাও! কিন্তু ফাদার ন্যাথানিয়েল বিচিত্র মানুষ। তিনি শুধু দৃঢ়স্বরে 'না সে হয় না। সে অনুমতি তোমাকে আমি দেব না।' বলেই মাথা হেঁট ক'রে ওঘরে চলে গেলেন।

* * *

জন—পথে কুড়োনো ছেলে বাচ্চি—তার একটা জন্মগত গুণ ছিল। আশ্চর্য গুণ। তবে ওই একটাই গুণ, গুণ বল গুণ শক্তি বল শক্তি। এবং সেইটেই ফাদার ন্যাথানিয়েলকে আরও মমতায় আচ্ছন্ন করেছিল। সেটা হ'ল ওই পথের বাচ্চাটার মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং সংগীত-পারঙ্গমতা। সেটা তার জন্মগত বিদ্যার মত, গান শুনবামাত্র শিখতে পারত। না—আরও একটা সম্পদ ছেলেটার ছিল—সে তার রূপ। এবং সে রূপের সঙ্গে ফাদারের মরা ছেলের সাদৃশ্য। তাঁর ছেলেও মারা গিয়েছিল বারো তেরো বছর বয়সে—এক দিনে ছেলে মেয়ে দুইই মারা গিয়েছিল। কিন্তু বারো বছর পর্যন্ত তাঁর ছেলের সংগীতবোধের কোন পরিচয় পান নি। কণ্ঠস্বরও তার গানের উপযুক্ত সুমিষ্ট ছিল না। ফাদার ন্যাথানিয়েল এককালে ধর্মযাজকত্ব গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু তাঁর নিজের সংগীতের প্রতি আসক্তি এবং সহজ পারঙ্গমতা তাঁকে এমন ক'রে টেনেছিল যে ধর্মযাজকত্ব থেকে তিনি প্রায় বিতাড়িত হয়েছিলেন! প্রায় এই হেতুই বিতাড়িত হবার পূর্বেই তিনি এ সম্মানিত পবিত্র কর্ম থেকে নিজেই অবসর নিয়েছিলেন।

কয়েক পুরুষ ধরেই তাঁরা কৃশ্চান। বাপ পিতামহ তাঁদের সমাজে কৃতী ব্যক্তি ছিলেন, ভাল চাকরিই শুধু করতেন না,

মর্যাদাবোধেও সম্মানিত মানুষ ছিলেন। তাঁর পিতামহ তাঁদের সমাজে প্রথম কৃশ্চান হলেও তাঁরা ভারতীয় তাঁরা বাঙালী—এই আন্দোলনের যাঁরা প্রবর্ত্তন করেন—তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট জন ছিলেন। ঘরে বাংলায় কথা বলার, ধুতি পাঞ্জাবি শাড়ি পরার প্রথা প্রচলন করেন। সে কালের কলকাতার বিশিষ্ট প্রগতিশীল বাঙালীদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেন এবং বাঙালী কৃশ্চান সমাজকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইংরেজদের প্রভুত্ব এবং প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। পিতামহ ছিলেন গ্রাজুয়েট এবং সরকারী চাকুরে। বাপ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সমাজের ধর্মযাজকত্ব ন্যাথানিয়েল রমেশ বিশ্বাসও বাপের পর ধর্মযাজকত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ভুল হয়েছিল তাঁর। তাঁর বাপও ভুল করেছিলেন। তিনিই তাঁকে এ পদ গ্রহণ করিয়েছিলেন। ধর্মানুরাগ ঈশ্বরভক্তিতে তাঁর খাদ ছিল না। কিন্তু এই জীবনে পরিপন্থী হয়েছিল এই সংগীতানুরাগ এবং সহজ সংগীত-পারঙ্গমতা।

ছেলেবয়সেই তাঁর এই শক্তির বিকাশ দেখে তাঁর বাবাই তাঁকে ধর্মসংগীত শিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। শিক্ষক রেখে নিয়মিত শিক্ষা যাকে বলে তাই দিয়েছিলেন। তারপর তাঁদের সমাজে এবং তাঁদের চার্চেও ধর্মপ্রচারের জন্য বাংলাভাষায় কৃশ্চান ধর্মপুস্তক অনুবাদের সঙ্গে বাংলাভাষায় গান রচনারও ঢেউ এল। সুযোগ হ'ল তাঁর দেশীয় সংগীতের সঙ্গে পরিচয়ের এবং শিক্ষার। বাংলার ব্রহ্মসংগীত তখন বাংলা সংগীতে নতুন প্লাবন এনেছে। সেই গানের মধ্যে তিনি আশ্চর্যভাবে বাঙালী প্রাণের ঈশ্বরানুরাগ ও তাঁর কাছে প্রার্থনা প্রকাশের পথ পেলেন। তারই সঙ্গে সংগীতব্যাকরণের মধ্য দিয়ে দেশীয় মার্গসংগীত থেকে খেয়াল টপ্পা ঠুংরির স্বাদ পেলেন। ধর্মের প্রয়োজনে সংগীতচর্চা করতে এসে সংগীতরসের সেই আনন্দের মধ্যে ডুবলেন—যার মধ্যে সুর ও সংগীতই মুখ্য—ভাষা ও ভাব গৌণ। এরই আকর্ষণে তিনি খুঁজে খুঁজে কলকাতার

বড় বড় বাড়িতে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের গানের জলসা হলে শুনতে যেতেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করতেন। তখন তাঁর বাপ গত হয়েছেন—তাঁর বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ,—সংসারে স্ত্রী নীলিমা এবং একটি ছেলে একটি মেয়ে। সমাজে প্রতিবাদ উঠল। ধর্মযাজক কর্তৃপক্ষও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। স্ত্রী নীলিমার দেহে এক পুরুষ পূর্বের শ্বেতরক্ত সংসর্গ-গৌরবে তার আচার আচরণে ছিল এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা অরুচি। তাদের সমাজে সে ছিল বর্ণগৌরবে গরবিনী। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের দু'চারজন তার প্রতি আকৃষ্টও ছিল—লরেটোতে পড়ত। নীলিমা ফাদার ন্যাথানিয়েলকে বিয়ে করেছিল—তার একটি হেতু ছিল তাঁর গান। কিন্তু কিছুকাল পর হয়তো তার মোহভঙ্গের পর এই গান নিয়েই সে ন্যাথানিয়েল রমেশ বিশ্বাসের বিরোধী হ'ল। সে দৃঢ়ভাবে বললে—এই ভাবে তুমি ওদের সমাজে ওই চরিত্রভ্রষ্ট লোকগুলির সঙ্গে মেলামেশা করতে পার না। যেখানে মদ চলে উচ্ছৃঙ্খলতা চলে সেখানে যাওয়া চলবে না তোমার। ন্যাথানিয়েল রমেশ বিশ্বাস চেষ্টা করেছিলেন দূরে সরে আসতে কিন্তু তা পারেন নি। ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহ জটিল হয়ে উঠল। এরই মধ্যে অপবাদ রটল—রমেশ বিশ্বাস এক বিখ্যাত ধনীর বাগানে গিয়েছিল যেখানে কলকাতার বিখ্যাত গহরজান উপস্থিত ছিল এবং গান গেয়েছে। এরপর এল ঝড়। রমেশ বিশ্বাসের জীবন তছনছ হয়ে গেল। তিনি কোন প্রতিবাদ না করে ধর্মযাজকত্ব ত্যাগ করলেন। স্ত্রী আদালতে ডাইভোর্স কেস আনলে তিনি সেখানেও আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। ডাইভোর্স হয়ে গেল। ছেলে জন তখন এগার বছরের, মেয়ে লনা আট বছরের। তারা তাঁর কাছেই রইল। নীলিমা তাদের জন্য কোন দাবিও জানালে না। কারণটা বোঝা গেল মাসখানেক পর; এক মাস পরই নীলিমা একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কর্মচারীকে

বিবাহ ক'রে চলে গেল পাঞ্জাব অঞ্চলে। ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে অপমানিত রমেশ বিশ্বাস প্রায় ঘরে মুখ লুকিয়েই রইলেন এর পর। একমাত্র পুরনো চাকর গোমেশ ছাড়া আর কেউ রইল না সংসারে। সে নিয়ে আক্ষেপ করলেন না ন্যাথানিয়েল রমেশ বিশ্বাস। সংগীত চর্চা আর বই পড়া নিয়েই নতুন জীবন আরম্ভ করলেন। কিছু বন্ধু তাঁর ছিলেন যাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন, বুঝতেন—তাঁরা তাঁকে পরিত্যাগ করেন নি। তাঁদের দু'একজন যাঁরা খুব অন্তরঙ্গ তাঁরা তাকে বললেন আবার বিয়ে করতে। কিন্তু বিশ্বাস তা করলেন না। বললেন—আর না। দেখ যে অপবাদ রটে গেল তারপর হয়তো কোন মেয়েই আমাকে বিশ্বাস করবে না। সুতরাং—। ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলেন—না। এ বেশ আছি।

তা ছিলেন। সত্যই মনের শান্তি একটা পেয়েছিলেন। শুধু মনেই নয় ঘরেও। ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই মায়ের খুব অনুগত ছিল না। দিনরাত্রি অনুযোগ অভিযোগের তিক্ততা রইল না সংসারে। ছেলে মেয়ে দুজনে অহোরাত্রি মায়ের জন্য শঙ্কিত ত্রস্ত থাকত—তারা হাসতে খেলতে—উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে পেয়ে বাঁচল। বিয়েটাই বোধ হয় রমেশ বিশ্বাসের ভুল হয়েছিল। এই শ্বেতরক্তগরবিনী লরেটো-শিক্ষিতা নীলিমা যৌবনের ধর্মে শুধু বিশ্বাসের গান শুনেই তাঁকে বিয়ে করতে চায় নি—নীলিমার বাপ মাও নীলিমাকে উৎসাহিত করেছিল ন্যাথানিয়েলকে বিয়ে করতে; তার কারণ বিশ্বাসের বৈষয়িক অবস্থা। বিশ্বাসের পিতামহ বড় সরকারী চাকুরে ছিলেন এবং তার সঙ্গে করেছিলেন কিছু শেয়ারের কারবার; তার থেকে এণ্টালী অঞ্চলে খানতিনেক বাড়ি এবং কিছু জমি কিনে গিয়েছিলেন। বাপ সে সম্পত্তি বাড়ান নি কিন্তু তার উন্নতি করেছিলেন আয় থেকে। ন্যাথানিয়েলের একখানা বাড়িতে নীলিমারা ভাড়াটে ছিল। তাদের দেহে শ্বেতরক্তের প্রসাদ থাকার গৌরবেই তারা বরাবরই সাহেবী কেতায় থেকেছে—

তাতে আয় হিসেব ক'রে ব্যয় করার পদ্ধতি নয় ব্যয় হিসেব করে আয় যেমন করেই হোক করতে হয়। সেই কারণে মেয়েকে ন্যাথানিয়েলের ঘরের গৃহিণী ক'রে তাকে সুখী দেখতে চেয়েছিল। হয়তো বা বাড়িভাড়া সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছিল। নীলিমা এ বাড়িতে এসে বছর দুয়েকের মধ্যেই নিজেকে অসুখী মনে করেছিল। সবচেয়ে অসুখী হয়েছিল জনের জন্মের পর। ছেলে হয়েছিল কালো। এবং কালো স্বামীর জন্য মনের গোপন ক্ষোভ এবং লজ্জা এইবার অবাধ্য হয়ে মাথা ঠেলে উপরে এসেছিল। নীলিমার আর দুই বড় বোনের একজন গার্ড গৃহিণী—সে গাউন পরে—ছেলেমেয়েরা ইংরিজী ছাড়া কথা বলে না, বাংলা জানেই না। হিন্দী জানে—তাও নেটিভদের সঙ্গে বলে। অন্য একজন আসামে থাকে—তার স্বামীও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, চা-বাগানের কর্মচারী। তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে তার ছেলে কালো জন যখন নেটিভ হয়ে গেল তখন তার ক্ষোভের সীমা রইল না। লনা এর পর জন্মাল, লনা অবশ্য মায়ের মত খানিকটা রঙ পেয়েছিল কিন্তু তাতে নীলিমার ক্ষোভ মিটল না। কারণ রঙ পেয়েও লনা বাঙালীই হ'ল—ন্যাথানিয়েল বাড়িতে ইংরিজী চালাতে দেন নি। এ থেকেই সংসারের অসন্তোষ উত্তাপে শুকিয়ে শুকিয়ে দাহ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল—তাতেই লাগল আগুন। এবং আগুন ধরিয়ে দিয়ে নীলিমা বেরিয়ে চলে গেল।

ন্যাথানিয়েল অপমানিত হয়েও সুখী হলেন। জন এবং লনাকে নিয়ে গোমেশের সাহায্যে বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে শুরু করলেন। আর্থিক সচ্ছলতা ছিল, ছেলেকে মেয়েকে নানান জিনিস কিনে দিয়ে খুশী করলেন। ছেলেমেয়েকে মা খুব কাছে নিত না সুতরাং তাকে ভুলতেও তাদের খুব বেগ পেতে হ'ল না। ন্যাথানিয়েল নিজে কিনতেন নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র। নীলিমা থাকতে এতে বাধা পেতেন, এবার বাধা ঘুচে গেছে। শুধু

কিনতেনই না কিনে এনে কিছুদিন ধরে সেটিকে নিয়েই পড়তেন ; কয়েক মাসের পর সেটিকে আয়ত্ত ক'রে আবার নতুন কিছু ধরতেন। এবং এই সময় গায়ক এবং যন্ত্রী হিসেবে খ্যাতিও পেলেন তিনি। মজলিশে এদেশী গানের আসরে যেমন যেতেন তেমনি কলকাতার ইউরোপীয় সংগীতের আসরে যেতেন। একটি বিশিষ্ট অর্কেস্ট্রা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হ'ল। তাদের কাজ নিতেও তিনি দ্বিধা করলেন না। অনেকে ব্যঙ্গ করলে। কোথায় সম্মানিত পুরোহিতের পদ আর কোথায় অর্কেস্ট্রার বেহালা বাজিয়ে—মিউজিসিয়ান—আর্টিস্ট! একজন গোঁড়া কৃশ্চান বললে—at last—ন্যাথানিয়েল কৃশ্চানধর্মের অ্যাঞ্জেলত্ব থেকে হিন্দুদের কিন্নর কিন্নরী অপ্সর অপ্সরীর রাজ্যে ধপ করে পড়ে গেলে!

ন্যাথানিয়েল উত্তর দেন নি।

নিজের মনে এ প্রশ্ন তাঁর বার বার উঠেছে। তিনি বিচার ক'রে দেখেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন—হয়তো ধর্মযাজকত্ব প্রভুর সেবা নিয়ে থাকলে ভাল হ'ত। কিন্তু গানকে জীবনে ভালবেসেছেন, সংগীতের তিনি চর্চা করেন—এতে তিনি অধর্ম করেছেন পাপ করেছেন এ কথা তিনি স্বীকার করেন না।

এক এক সময় মনে হয়—বাঈজীরা যে আসরে গান গেয়েছিল বা গায় সে আসরে যাওয়ায় পাপ তাঁর হয়েছে। আবার মনে হয়েছে—তিনি তো কোন নীতিহীন গর্হিত আচরণ সেখানে করেন নি। হ্যাঁ স্বীকার করেন—তারা বেশভূষা ও প্রসাধনের মার্জনায় অপরূপা হয়ে আসরে যখন এসেছে বা গান গাইতে গাইতে সংগীতরস বিলাসের স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছে কণ্ঠস্বরলহরীতে—হাতের লীলায়িত ভঙ্গিতে—কটাক্ষলীলায়—তখন মন চকিত হয়েছে বইকি, হ্যাঁ হয়েছে; কিন্তু ঈশ্বর তো সাক্ষী—তিনি তো জানেন তিনি নিজেকে সংযত করেছেন—ধ্যানীর মত যোগীর মত চিত্তের তরঙ্গ-বিক্ষোভকে শান্ত করেছেন। অনুভব করেছেন—এই

যে রূপসী নারী এই যে সংগীতপটীয়সী—এর এই নিবেদনই তো তার জীবন-নৈবেদ্য—সে তো এ নৈবেদ্য মানুষের কাছে তুলে ধরে নি, মানুষকে সাক্ষী রেখে তুলে ধরেছে তাঁরই উদ্দেশ্যে।

এ কথা একদিন রমেশ বিশ্বাস যুক্তি হিসেবেই বলেছিলেন নীলিমাকে। বলেছিলেন—তোমার সেই বিখ্যাত গল্পটির প্রশংসা করার কথা মনে কর নীলিমা। সেই যে একজন জাদুকর—গভীর রাত্রে সকলের দৃষ্টির অগোচরে চার্চের অল্টারের সামনে তার জাদুবিদ্যা দেখিয়ে খুশী হ'ত, ভাবত তার জীবন সার্থক হ'ল। সেইটে যদি মানতে পার তো এটা মানতে পার না কেন? তাদের কলাবিদ্যার মধ্য দিয়ে এও তাদের জীবনের নিবেদন।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল নীলিমা। বলেছিল—আর কিছু দিন পর তুমি দেখছি রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে ওই গানগুলোকে নিয়ে মাতবে। ভণ্ড ব্যভিচারী তিলকধারী হিন্দুদের সঙ্গে বসে কাঁদবে। চার্চ অথরিটি ঠিক করছেন তোমাকে বের ক'রে দিয়ে।

নীলিমা চলে গেছে কিন্তু তার এ কথাটি অনেকটা সত্য হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে শুধু সাহিত্যরস এবং সুরের মধ্যে সংগীতরসই তিনি অনুভব করেন না, এখন আরও গভীর কিছু, ভগবদ্‌রস বলতেও তাঁর দ্বিধা নেই, পেতে আরম্ভ করেছেন। ভগবানের সঙ্গে একটি বিচিত্র মধুর অতিমধুর সম্পর্কের সন্ধান যেন পাচ্ছেন। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শুধু পিতা প্রভু ও সন্তান ভক্তের সম্পর্কই নয়—সে আরও ব্যাপক—জীবনের সব স্থান জুড়ে রয়েছে সে সম্পর্ক। পিতা-পুত্র, প্রভু-ভক্ত, মাতা-সন্তান, প্রিয়-প্রিয়া, পুত্র-পিতা, বন্ধু-মিতা সব—সব সম্পর্কই হ'তে পারে তাঁর সঙ্গে। যশোদা আর কৃষ্ণের রাধা আর কৃষ্ণের বৃন্দাবনের রাখাল ও কৃষ্ণের সম্পর্কগুলি আশ্চর্য। শুধু আশ্চর্য নয়—আশ্চর্যরূপে সত্য। কি পবিত্র কি গভীর!

নীলিমা চলে যাওয়ার পর বৈষ্ণবপদাবলী তিনি কিনে

এনেছিলেন—পড়তেন। সমস্তগুলি নির্বিকারভাবে আস্বাদন করতে পারতেন না; তাঁর রুচিতে বাধত। তিনি বেছে বেছে তাঁর রুচিমত পদগুলি নকল ক'রে তাঁর নিজের জন্য একখানি পদাবলী সংকলন করতেন। জন লনা মাকে ভুলে সহজ হয়ে আসছিল। তাঁর সংসারটি তাদের আনন্দকোলাহলে মুখর হয়ে থাকত।

তিনি উপরের দিকে মুখ ক'রে বলতেন—হে প্রভু, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই শেষ নেই।

প্রতিদিন বিকেলে বেরিয়ে রাত্রে কাজ সেরে ফিরে ছেলে মেয়েকে নিয়ে প্রার্থনায় এই কথাগুলি নিয়মিত নিত্য বলতেন। তারপর তাদের শিয়রে বসে একটি তারের যন্ত্র নিয়ে অতি মৃদু ধ্বনি তুলে ঘুমপাড়ানী গান বাজাতেন। কোন দিন গল্প বলতেন। তারা ঘুমিয়ে গেলে জানালার ধারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন। ভাবতেন। নানান পথে ঘুরে ফিরে এলোমেলো ছন্দে চলতে চলতে শেষ এসে দাঁড়াতেন একটি কথায়—এই ভালো হে ঈশ্বর—এই ভালো। আমার জীবনে কোন ছলনা আমি রাখব না। আমি স্বীকার করছি বাসনাকে কামনাকে। কিন্তু তুমি সাক্ষী আমি তাদের স্বীকার ক'রেও তাদের সংযত করি, শাসন করি। এ যদি পাপ হয় তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো।

হয়তো এও ঈশ্বরের কাছে পাপ। নইলে ন্যাথানিয়েলের সংসারে নিষ্ঠুরতম আঘাত এল কেন? অতি নিষ্ঠুর অতি ভয়ংকর আঘাত।

বারো বছরের জন—ন বছরের লনা। একদিনে একসঙ্গে মহামারী মারাত্মক কলেরায় আক্রান্ত হ'ল। সেদিন ১৪ই অক্টোবর। আগের রাত্রি থেকে মেঘলা আবহাওয়া ছিল—সকাল থেকে সে মেঘাচ্ছন্নতা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসতে লাগল—রিমিঝিমি বৃষ্টির সঙ্গে এলোমেলো হাওয়া। দুপুরে তারই মধ্যে ন্যাথানিয়েল বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বড় একটি অর্কেস্ট্রা ছিল।

বিকেল হ'তে হ'তে বৃষ্টি প্রবল থেকে প্রবলতর হ'ল—খবর ঘোষিত হ'ল—সাইক্লোন। সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রিকালে লাস্য-সমারোহময়ী কলকাতা নিঝুম হয়ে পড়ল। ন্যাথানিয়েলদের বাজনাও তাড়াতাড়ি শেষ হ'ল। ন্যাথানিয়েল যখন বের হলেন চৌরিঙ্গীর কর্মস্থল থেকে তখন রাস্তাঘাট জনশূন্য। এক আধখানা ফিটন আর কয়েকখানা রিক্‌শা ছাড়া গোটা চৌরিঙ্গীতে কোন যানবাহন ছিল না। অনেক কষ্টে একখানা রিক্‌শা ক'রে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর বাড়ির দরজায় একহাঁটু জল। বাড়ি ঢুকতেই গোমেশ ম্লান মুখে বললে—ফাদার! গোমেশ তাঁকে ফাদার বলা ছাড়ে নি।

তিনি হেসে বলেছিলেন, আমার জন্যে ভাবছিলে ?

—না ফাদার! জন—লনা—

কি ? তারা বাড়ি নেই ?

আছে ফাদার। কিন্তু তারা কেমন করছে।

কেমন করছে ? মানে ? কি করছে ?

পেটের বেদনা। বমি করেছে—দাস্ত হয়েছে।

চমকে উঠেছিলেন ন্যাথানিয়েল। ছুটে ভিতরে গিয়ে ছেলে মেয়েকে দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন। সর্বাগ্রে চোখে পড়েছিল দুজনেরই চোখের চারিপাশে একটি কালো গহ্বরের মত বৃত্তরেখা।

দুজনেই অসাড়—নির্জীব।

ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন—ডাক্তার। পথে নেমেছিলেন একহাঁটু জলের মধ্যে। মুষলধারে বৃষ্টি প্রচণ্ড বাতাসের বেগে তীরের মত বিঁধছিল মুখে।

পথে জনমানব নেই। গাড়ি নেই রিক্‌শা নেই। কেউ নেই।

সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে পাশের বাড়ির ছাদ থেকে একখানা কাঠের ঘরের টিনের ছাদ উড়ে চলে গিয়েছিল। সেইটে যেন তাঁর কাছে মনে হয়েছিল নিষ্ঠুর ভবিতব্যের অট্টহাস্য।

গাড়ি পান নি—সেই দুর্যোগের মধ্যে কোন রকমে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। ডাক্তার আসেন নি—বাড়ির দরজায় এসেও ফিরে ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—পারব না যেতে এর মধ্যে। প্রেসক্রপসন করে দিচ্ছি আপনি নিয়ে যান। কাল সকালে যাব।

প্রেসক্রপসনেও ওষুধ মেলে নি। সব ডাক্তারখানা বন্ধ। বড় ডাক্তারখানা কোনটা খোলা ছিল কি ছিল না তিনি জানেন না, তিনি যেতে পারেন নি।

ভোর হতে হতে জন, বেলা নটা দশটায় লনা মারা গিয়েছিল।

তিনি মাথার শিয়রে স্তম্ভিতের মত বসে ছিলেন। ভেবেছিলেন—ঈশ্বরের রোষ? প্রিয় বেহালাখানাকে বের ক'রে ভাঙব বলে স্থির করেছিলেন। সেখানা মেঝের উপর পড়েই ছিল। লনা এবং জনকে সমাধিস্থ ক'রে ফিরে এসে সেখানা চোখে পড়েছিল। ভাঙব বলে বাক্স খুলে বের ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলেন—তারপর বাজাতে শুরু করেছিলেন।

* * * *

এরপর কিছুদিন ন্যাথানিয়েল একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন। লোকে বলত—মাথা খারাপ হয়েছে। তারপর একদিন বেরিয়ে এটর্নী সলিসিটারের বাড়ি হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন। নিজের সম্পত্তির শুধু একখানি বাড়ি রেখে দুখানা বাড়ি তাঁদের চার্চে দান করলেন—যে জমিটা ছিল সেটা বিক্রি ক'রে বেরিয়ে পড়লেন ভবঘুরের মত। বছর তিনেক এইভাবেই কেটেছিল। বাড়িতে গোমেশ থাকত। খরচ তাঁর এটর্নী দিতেন। মধ্যে মাঝে হঠাৎ আসতেন—মাসখানেক কি পনের দিন থাকতেন—আবার একদিন চলে যেতেন। আলখাল্লা পরতেন, নিরামিষ খেতেন। লোকে বলত লোকটা হিন্দু হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গের বেহালাটি ছাড়েন নি। যখন আসতেন তখন সঙ্গে আনতেন নানান ধরনের এদেশী গানের যন্ত্র। কলকাতায় আসতেন ওই সেপ্টেম্বরের

শেষে—অক্টোবর মাসটা থেকে চলে যেতেন। এর মধ্যে বর্ষাবাদলার রাত হলেই ন্যাথানিয়েল একসময় বেহালাটি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন—ওই কবরস্থানে। ওখানকার যারা গেটকীপার ওয়াচার তারা ফাদারকে চিনত, ভালবাসত; তিনি ওদের খুশী ক'রে টাকা পয়সা দিতেন—তারা জন এবং লনার কবর দুটি পরিষ্কার ক'রে রাখত। তারা বলত এবং আজও বলে পাগ্‌লা বাবাসাহেব। ছেলে মেয়ে একদিনে মরে যাওয়ায় মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। নইলে দুর্যোগের রাত্রে কেউ আসে কবরখানায় বেহালা বাজাতে? তিনি যেতেন—তারা বলত—বাবাসাহেব, এই গেটের এখান থেকেই বাজান। কখনও সে কথা শুনতেন, কখনও বলতেন—খুলে দাও—খুলে দাও—ভিতরে যেতে দাও। তিনি বাজনা বাজাতেন। গেটওয়ালা বলে—বাবাসাহেব বলে, জান এই যে বাজনা এ আমি এক খুব বড় ফকীর ওস্তাদের কাছে শিখেছি। এ বাজালে কবরের মুখ সব খুলে যাবে। যারা ভিতরে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে তারা চোখ মেলবে। তারা খুব খুশী হবে—বুঝবে ওরা মরে গিয়েছে বলে আমরা ওদের মাটি চাপা দিয়ে একদম ভুলে যাই নি।

তিন বছর পর হঠাৎ একবার অসময়ে এপ্রিল মাসে গোমেশ টেলিগ্রাম পেল—আমি যাচ্ছি। একজন আয়া ঠিক ক'রে রেখো।

কন্যাকুমারিকা থেকে এল টেলিগ্রাম।

সেইবার ফিরে এলেন ন্যাথানিয়েল—সঙ্গে তিনবছরের ওই একপা পঙ্গু মেয়ে লনা। আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখ—ওই শৈশবেও সে চোখের দৃষ্টি যেমন বিষণ্ণ—তেমনি শান্ত। দেহ তার দুর্বল কিন্তু মুখখানি ঢলঢলে—একমাথা রেশমের মত চুল। তার নাম দিয়েছেন ফাদার—লনা! বাংলা ভাষা বোঝে না, হিন্দী বোঝে না—শুধু নামটা বুঝেছে—লনা বলে ডাকলে ফিরে তাকায়। নাম শুনে গোমেশের চোখে জল এসেছিল। কিন্তু এ মেয়েকে নিয়ে বড় মুশকিলে পড়ল সে। এ যেন বোবা। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে

তাকিয়ে থাকে, কাঁদেও না, ক্ষিধে লাগলেও কাঁদে না—শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। যেখানে বসিয়ে রাখে সেইখানেই বসে থাকে। খেলনা কাছে দিলে নাড়েচাড়ে কয়েকবার তারপর হাঁ ক'রে আকাশ বা বাড়ি বা উড়ন্ত পাখীর দিকে তাকিয়ে থাকে। হাসেও না। হাজার সমাদরেও না। গোমেশ কত ভঙ্গি ক'রে নাচে কত অঙ্গভঙ্গি করে—তার মুখখানি প্রসন্ন হয়—ঠোঁটের রেখায় একটু ভীরু হাসি ফোটে—কিন্তু তার বেশী নয়। বরং লোক না থাকলে একলা অবস্থায় স্বচ্ছন্দ কিছুটা হয়, একটা পা খোঁড়া—ভাল হামাগুড়ি দিতেও পারে না—হেঁচড়ে হেঁচড়ে একটু একটু নড়েচড়ে বেড়ায়। এই পর্যন্ত। আয়া জন দুই পর পর এল—কিন্তু কয়েকদিন পরই ফাদার তাদের জবাব দিলেন। একজন বকেছিল—বলেছিল—কোথাকার বোবা খোঁড়া মেয়ে রে বাবা! দুধ দিয়েছি বোতলে ধরেই বসে আছে। জিজ্ঞাসা করছি—কি হ'ল? ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েই আছে। খাবি খা, না খাবি নিজেই মরবি ক্ষিদেতে! এই—শুনছিস?

ফাদার বাইরে থেকে বাড়ি ঢুকছিলেন। তিনি এসেই লনাকে কোলে তুলে দুধের বোতলটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং গোমেশকে ডেকে বললেন—ওই মেয়েটির মাইনে মিটিয়ে দাও। সাত দিনের মাইনে বেশী দিয়ো। ওকে দিয়ে হবে না।

এরপর এসেছিল একজন হিন্দুস্থানী আয়া। লনা তাকে ভয় করত। ফাদার তাকেও বিদায় করলেন। তারপর বললেন—থাক গোমেশ। ওকে আমিই দেখব। তুমি তো রয়েছই। নোংরা কাচবার একজন লোক চাই, তাই দেখ।

ন্যাথানিয়েল ঘোরতর সংসারী হয়ে সংসারে বাঁধা পড়লেন। লনাকে শেখালেন গোমেশের নাম। প্রথম ওইটেই শিখেছিল লনা। গোমেছ। তারপর—ফাদার। গোমেশের কাছে শুনে ওটা শিখল—ফাদা! তারপর—দলি। গোমেশের লোমওয়ালা ছোট

কুকুরটার নাম ডলি। সেটা আশ্চর্যভাবে লনাকে ভালবেসেছিল। তার গায়ে ঠেস দিয়ে গিয়ে বসত। লনা তার নরম তুলোর মত রোঁয়াগুলি হাতের মুঠিতে ধরে বসে থাকত। আর ভালবাসত সে পাশের বাড়ির লক্কাপায়রাগুলিকে। সেগুলি বসে থাকত তাদের বাড়ির ছাদের আলসেতে। লনা দু'হাত বাড়িয়ে ডাকত—আ! মধ্যে মধ্যে সেগুলি এ বাড়ির আলসেতে ছাদেও আসত, গোমেশের কুকুরটার সঙ্গে তাদের একটা জানাশোনা ছিল—সে ওদের ধরবার চেষ্টা করত না। বরং গোমেশ পায়রাগুলোকে রুটির টুকরো ছোলা কলাই ছড়িয়ে দিলে ডলিও এসে ওদের সঙ্গে খেতে শুরু করত। ভিজে ছোলা হ'লে সে ছাড়ত না—শুকনো হ'লে শুঁকে ছেড়ে দিত এবং রুটির টুকরোর বেলা মধ্যে মধ্যে এক-একবার ঘেউ ঘেউ ক'রে তাড়া ক'রে হটিয়ে দিয়ে সবটাই খাবার চেষ্টা করত। লনা বিমুগ্ধ হয়ে পায়রাগুলির দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকত—আ—আ! এসব দেখে ফাদার কয়েকটা দুধের মত সাদা পেখম-ওয়ালা পায়রা কিনে এনে দিলেন। এগুলি উড়তে খুব পটু নয় তবুও গোমেশ সেগুলির পাখায় সুতো বেঁধে লনার সামনে ছেড়ে দিয়ে শেখালে—বাকুম্! বাক্ বাকুম্। পায়রা।

ফাদার গ্যাথানিয়েল নতুন ক'রে সংসারী হলেন। কাজ নিলেন। গ্রামোফোন, অর্কেস্ট্রাতে বাজাবার কাজ। বাইরে যাওয়া ছাড়লেন। শুধু দুর্যোগের রাত্রি এলে সব বাঁধন যেন ছিঁড়ে যেত। বেহালাখানি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন—মনে পড়ত সেই নিষ্ঠুর রাত্রির কথা; তিনি গান বাজাতে যেতেন। সে এক ফকীর ওস্তাদের কাছে শেখা গান।

বিয়াল্লিশ সালের মহাদুর্যোগের মধ্যেও তিনি গিয়েছিলেন। তেতাল্লিশ সালে চাচী এল। আশ্চর্যভাবে মেয়েটি পরম যত্নে লনাকে বুকে তুলে নিলে; অবশ্য লনা তখন ভাষা শিখেছে। কথাও অনেক ফুটেছে। পায়রা নিয়ে—কুকুর ডলিকে নিয়ে—

খেলনা নিয়ে খেলা করে—হাসে, বলটা গড়িয়ে দূরে গেলে বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বসে বসে ছেঁচড়ে গিয়ে বলটাকে কুড়িয়ে আনে।

ফাদার বিশ্বাস আবার জীবনে কাজে নামলেন। তাঁর নিজের সন্তান জন এবং লনার মৃত্যুর পর তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি দান করেছিলেন চার্চে। থাকবার মধ্যে ছিল এই ছোট বাড়িখানি। হাতের অর্থ এই ক'বছরে বিবাগীর মত ঘুরে বেড়াবার সময় হিসেব না করেই দান করেছেন, ব্যয় করেছেন। যেখানে যেতেন খুচরো সিকি আধুলির একটি থলিয়া বহন করতেন। দীন অভাবী দেখলেই তার কাছে গিয়ে কিছু দিয়ে বলতেন—কিছু কিনে খেয়ো। আর বহন ক'রে বেড়াতেন একটি খেলনাভরা ঝোলা। খুঁজে খুঁজে ছেলেদের মেলায় গিয়ে বিলিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যেতেন। এইভাবে হাত তাঁর খালি হয়েই এসেছিল। কিন্তু সে দিকে তাঁর কোন চিন্তাই ছিল না। তাঁর একক জীবন, মাথা গুঁজবার আশ্রয় আছে—সুতরাং অর্থের প্রয়োজন শুধু অন্নের জন্য; এ দেশে সে অন্ন সাধুসন্ন্যাসীতে ভিক্ষা ক'রে সংগ্রহ করে। ধর্মে তিনি কৃশ্চান কিন্তু এ দেশের সংস্কার এবং সংস্কৃতির বীজ তাঁর রক্তের মধ্যে, নিশ্বাসের বাতাসের মধ্যে। মধ্যে মধ্যে ভাবতেন হাতের অর্থ নিঃশেষিত হ'লে বাড়িখানা বিক্রি ক'রে সেই অর্থ ব্যয় করবেন। সেটা শেষ হ'লে পথের ধারে বসে বাজনা বাজিয়ে ঈশ্বরের স্তব গান করবেন—তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমিই ধন্য—তুমি ধন্য হে! এতেই তাঁর দিন চলে যাবে। কিন্তু তাঁর গৃহে আবার ফিরে এল লনা। লনা যত বাড়তে লাগল বড় হ'ল—তাঁর চোখে আবার জাগল আশার রঙ—যেন শীতের নিঃশেষে পাতাঝরা গাছে গজাল কচি পাতা, মনে আবার জাগল ভাবী কালের কল্পনার গুঞ্জন, ঘর গড়ার গান। লনাকে মানুষ করতে হবে—তাকে পড়াতে হবে, একটা পা তার শৈশবে সম্ভবতঃ পলিও হয়ে দুর্বল হয়ে গেছে; সে ইতিহাস কেউ জানে না। কন্যাকুমারিকায় তার ভিক্ষুণী মা

তাকে কোলে নিয়ে ভিক্ষা করত; তার কোলেই তার অসুখ করেছিল, চিকিৎসা হয় নি, কোনরকমে বেঁচে গিয়েছে; সে কথা সেই মা'টিই তাকে বলেছিল। দিনের পর দিন তাকে ভিক্ষা দিতেন—সেই সূত্রে পরিচয় হয়েছিল—একটি সুমধুর স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তারপর একদিন মেয়েটি মারা গেল একটা অ্যাকসিডেণ্টে। মেয়েটিকে পথের ধারে যেখানে সে ভিক্ষা করত সেইখানে বসিয়ে রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাবার সময় গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মারা গেল ফাদার বিশ্বাসের চোখের সামনে। শিশু পঙ্গু মেয়েটি তার বড় বড় চোখ দুটি মেলে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল—তিনি তাকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন বাসায়। তারপর ফিরেছিলেন কলকাতায়। এখানে এনে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন কিন্তু ফল সামান্যের বেশী হয় নি। পঙ্গু হয়তো হবে না, কিন্তু সাধারণ মানুষের দুই পায়ের শক্তিসামর্থ্য কখনও সে পাবে না এটা নিশ্চিত। সুতরাং তার জীবনে সে যে সংসারী হয়ে সুখী হবে সে সম্ভাবনা যেমন কম অথবা নেই, তেমনি সে সুস্থ মানুষের মত সক্ষম কর্মজীবনে ক'রে খেতে পারবে সে সম্ভাবনাও নেই। হয়তো ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটবে, তাতে বড়জোর শিক্ষকতা করতে পারবে—কিংবা সে যদি শিল্পী হ'তে পারে, ছবি আঁকতে পারে কি গান গাইতে পারে—কি অন্য কোন শিল্পে পারঙ্গমা হ'তে পারে তবেই সে নিজের উপার্জনে বাঁচতে পারবে। সে আশা দূরের কথা—তবু মানুষ আশা করে। তিনিও করতেন, কিন্তু তার মত প্রস্তুত করতে অর্থের প্রয়োজন, আর যদি সে সব কিছু নাই পারে লনা তবে তার জন্য তাঁকে উপার্জন করতে হবে, সঞ্চয় করতে হবে। তাই তিনি নতুন ক'রে কাজে নামলেন। সংগীতজ্ঞ বলে তাঁর খ্যাতি আছে, সংগীতে তাঁর প্রবল আকর্ষণ আছে। প্রথম কাজ নিলেন তিনি চার্চের এবং দুটি ইস্কুলে। চার্চে উপাসনার সময় পিয়নো বাজাতেন তিনি—ধর্মসংগীতও গাইতেন। ইস্কুলে গান ও বাজনা শেখাতেন।

বিদ্যালয়ের পাসকরা লোক ছিলেন—ইস্কুলে অন্য বিষয়ে শিক্ষকতা করবার যোগ্যতাও তাঁর ছিল; এককালে ধর্মযাজক ছিলেন বলে এবং চার্চে বিষয় দান করার জন্য খ্যাতিও ছিল—যার জোরে সে শিক্ষকতাও পেতে পারতেন তিনি, কিন্তু তা তিনি নেন নি—ভাল লাগে নি। কিছুদিন পর তাঁর বাজনার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁকে ডেকেছিল। তিনি গিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর জীবনের দরজা আবার নতুন ক'রে খুলল। শুধু পশ্চিমের সংগীতই নয়, ভারতীয় সংগীতে তাঁর পারদর্শিতা ও পারঙ্গমতা এখানে কাজে লাগল। গ্রামোফোন কোম্পানির অর্কেস্ট্রা পার্টির পরিচালক হয়ে গেলেন তিনি।

এই সময়েই একদিন ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাস—সেদিন শীতের একটি অকাল বর্ষাবাদলা নেমেছিল। তার সঙ্গে ছিল বাতাস। সন্ধ্যার দিকে বর্ষণ স্তিমিত হয়ে ঘনিয়ে উঠেছিল বাষ্পের মত কুয়াসা। মধ্যে মধ্যে রিমিঝিমি ঘুনিঘুনি বর্ষণ। ফাদার স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। লনা দুরন্ত শীতে কম্বল এবং লেপের মধ্যে উষ্ণতার আরামে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। ফাদারের একখানি হাত ছিল তার মাথার উপর। মধ্যে মধ্যে বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাচ্ছিলেন লনার দিকে—কখনও তাকাচ্ছিলেন মৃত ছেলে জনের ছবির দিকে। বোধ করি বর্ষাবাদলার আবহাওয়ার মধ্যে মনে পড়ছিল সেই রাত্রির কথা—যে রাত্রে একসঙ্গে ছেলে মেয়ে দুজনেই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এমনিভাবে কতক্ষণ ছিলেন তাঁর খেয়াল ছিল না—হঠাৎ তারই মধ্যে একসময় তাঁর সেই বেহালাখানি বের ক'রে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এবং ঘণ্টাখানেক পরই একখানা ফিটনে ক'রে ফিরে এসেছিলেন এক ভিক্ষুকের ছেলে বা পথের বাচ্চাকে নিয়ে। বিহ্বল আতঙ্কিত দৃষ্টি তার চোখে, শীতের বর্ষণসিক্ত সারা শরীর

হিমের মত ঠাণ্ডা, পরনের দুর্গন্ধযুক্ত একটা ময়লা ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট এবং ছেঁড়া জামা ভিজে সপসপে হয়ে তার শরীরের সঙ্গে লেপ্টে লেগে আছে, ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল বাচ্চাটা—ঠোঁট দুটো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ; ফাদার নিজের চেস্টারফিল্ডটা খুলে তাকে জড়িয়ে নিয়ে ফিটন থেকে নেমে বুকে ক'রে উপরে এনে তুলেছিলেন। কাপড় জামা ছাড়িয়ে তাঁর নিজের বড় বড় জামা কাপড় পরিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে চাচীকে বলেছিলেন—আগুন ক'রে আন চাচী। ওর আগুনের উত্তাপ দরকার।

চাচী সেই দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ছেঁড়া প্যাণ্ট জামা হাতে তুলে দুর্গন্ধের জন্য ঘৃণা প্রকাশ না ক'রে পারে নি—বলেছিল—এ কাকে কোত্থেকে কুড়িয়ে আনলেন বাবাসাহেব ?

ফাদার উত্তর দেন নি—ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

ছেলেটার চোখে বিস্ময়বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টি। সে যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল।

চাচী বলেছিল—আনলেন বেশ করলেন—রাস্তায় পড়ে থাকলে মরে যেত। কিন্তু নিজের বিছানায় শোওয়ালেন কেন ?

ফাদার হেসে বলেছিলেন—দেব—কাল আলাদা বিছানা ক'রে দেব। ওই ছেলেটার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলেছিলেন।

শেষরাত্রি থেকে ছেলেটার জ্বর এসেছিল। বিছানা আর পালটানো হয় নি। ফাদার নিজেই আলাদা বিছানা ক'রে নিয়েছিলেন। এবং যখন অবসর পেয়েছেন তখনই কাছে এসে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছেন। জ্বরে অজ্ঞান অবস্থায় ছেলেটা বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকেছে। অশ্লীল কদর্য কথা। শুনে চাচী শিউরে উঠেছে। বিরক্ত হয়েছে। লনার জন্য চিন্তিত হয়েছে। বার বার ফাদারকে প্রশ্ন করেছে—পথের কুকুরের বাচ্চার মত এই লৌণ্ডার উপর এত মায়া কেন ? ওকে হাসপাতালে দিন !

ফাদার কথা বলতেন না। অধিকাংশ দিন জানলার মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একদিন চাচী দেখলে— ফাদার নির্জন ঘরে বার বার একটা ছবির দিকে তাকাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখছেন ছেলেটাকে। সে তখন অজ্ঞান। ফাদার বাইরে গেলে চাচী ভিতরে এসে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছিল। তাই তো! এতদিন তো তার এ কথা মনে হয় নি! ছবিখানা ফাদারের মৃত ছেলে জনের ছবি। একা জন নয়, জন আর লনা—তাঁর নিজের ছেলে আর মেয়ে। কি আশ্চর্য মিল ছবির জনের মুখের সঙ্গে ওই ছেলেটার মুখের!

এর পর চাচী আর কোন কথা বলে নি। এর পর চলে গেছে কম দিন নয়—অনেক দিন, তখন ছেলেটির নাম ছিল বাচ্চি—সেটা বলেছিল ও নিজেই; আরও বলেছিল—তার মা বাপকে তার মনে নেই, নানী বলত এক বুড়ী চুড়িওয়ালীকে, সেই-ই তাকে মানুষ করেছিল কুড়িয়ে এনে, তার মাথায় চুড়ির ঝুড়ি উঠিয়ে দিয়ে ফিরি ক'রে ফিরত, দু'মুঠো ভাত দিত আর প্রহার করত। সে-রাত্রে সেও নানীকে মেরেছিল মাথায় ঢুঁ মেরে। তারপর সেই দুর্যোগের মধ্যে পালিয়েছিল কৃশ্চানদের কবরখানায়।

সেখান থেকেই ফাদার তাকে নিয়ে এসেছিলেন সে দিন। তারপর আজ দশ বছর চলে গেছে। ১৯৪৫ সাল—আর এটা ১৯৫৫ সাল। বাচ্চিকে নিয়ে এই দশ বৎসর ফাদার অবোধ মায়ায় কত দুঃখ কত কষ্ট করেছেন। আজ বাচ্চি জন হয়েছে। তাকে কৃশ্চান ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। ওর স্মৃতির সূক্ষ্মতম প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বস্তি আর পথের যাযাবরের শিক্ষাদীক্ষার বীজাণু বাসা বেঁধে রয়েছে—হয়তো ওর রক্তেও ওই জীবনের নেশা; তার সঙ্গে লড়াই ক'রে ফাদার তাকে মানুষ করতে চেয়েছেন। ওর শুধু আশ্চর্য একটি গুণ—গানে পারঙ্গমতা—সেই গানই শিখিয়েছেন তাকে ফাদার ন্যাথানিয়েল। গান সে ভাল শিখেছে। সেটা সে পেরেছে।

আর ছিল তার রূপের মিষ্টতা। সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবা হয়ে উঠেছে জন।

সেই ছেলে আজ ফাদার ন্যাথানিয়েলকে অপমান করলে।

ফাদার তাকে পরাধীন অন্নদাস ক'রে রেখেছেন। তাকে অনুগ্রহজীবী ভিক্ষুক ক'রে রেখেছেন।

ফাদার শিউরে উঠেছেন শুনে। জনের দুটি হাত ধরে বলেছেন—জন—জন—তুমি কি আমার স্নেহে বিশ্বাস কর না? অনুভব করতে পার না? রাত্রে উঠে শীতের দিনে তোমার কম্বল কোথাও সরে গেছে কিনা দেখি, গ্রীষ্মের দিনে—

আর বলতে দেয় নি জন। সে বলেছে—সে আপনি গোয়েন্দাগিরি করেন। দেখেন আমি বিছানায় আছি কিনা। চলে গেছি কিনা দেখেন। আপনি ভুলতে পারেন না আমি একদিন ছিলাম বাচ্চি—পথের ভিক্ষুক ছেলে। আপনি সন্দেহ করেন—ঘৃণা করেন।

তারপর অকস্মাৎ উত্তেজনায় দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্যের মত বলেছে—আমিও আপনাদের—

লনা চীৎকার ক'রে উঠেছিল—জন—

জন লনার সে চীৎকার শুনে থমকে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল কতবড় অন্যায় কথা সে বলতে চলেছিল। বুঝেই সেটাকে সংবরণ ক'রে সে বলেছিল—আমি হাত জোড় ক'রে আপনার কাছে মুক্তি চাচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দিন, যেতে দিন। আমাকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিন। আমি উপার্জন ক'রে বাঁচতে চাই।

ফাদার পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিলেন। স্থির অচঞ্চল। কথাগুলো তাঁর সেই পাথরের মত মানসিকতায় বুকে তীরের মত বিদ্ধ করতে চেয়েও পারে নি। জনের কথা শেষ হ'লে তাঁর সেই

ঠোঁট ছুটি নড়ে উঠেছিল, তিনি বলেছিলেন—না। এখন সে সময় হয় নি জন।

বলেই তিনি চলে গিয়েছেন ঘরের মধ্যে।

চাচী চীৎকার ক'রে উঠেছিল, ক্ষোভে ক্রোধে সে আর আত্মসংবরণ করতে পারে নি। বলেছিল—তুই অকৃতজ্ঞ! তুই নিষ্ঠুর! ওরে, তোর নরকেও ঠাঁই হবে না। একবার ভেবে দেখ। ভুলে তো যাস নি, ভুলে যাবার তো কথা নয়! সে সব কথাগুলো ভেবে দেখ। সেই তোর নানীর বাড়িতে—

॥ দুই ॥

মনে পড়ে বইকি। সব মনে পড়ে জনের। সে কিছু ভুলে যায় নি। টাটকা ছবির মত মনের মধ্যে ভেসে ওঠে চোখ বন্ধ ক'রে পিছনের কথা মনে করতে গেলে। কত রাত্রিতে বিনিদ্র হয়ে সে সেই সব কথা ভেবেছে। কত রাত্রে স্বপ্নে দেখেছে। কোনদিন ভয়ে শিউরে উঠেছে, ঘেন্নায় না-না বলে উঠেছে অথবা ছি-ছি বলে উঠেছে, আবার কতদিন সেই জীবনেরই কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ তাকে টেনেছে। রোশনির ঝিকমিকে দাঁতের হাসি চিকচিক ক'রে উঠেছে অন্ধকারের মধ্যে।

বেনিয়াপোখোর। ট্রাম কোম্পানির বিরাট পাওয়ার হাউসটা উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে কবরখানা, মাঝ দিয়ে চলে গেছে বিজলী রোড। পূর্বমুখে চলে যাও। লিণ্টন স্ট্রীট, ক্যাণ্টোফার লেন হয়ে চলে যাও আরও ভিতরে। ক্যাণ্টোফার লেন থেকে শুরু মস্ত পাকা ড্রেনের—ভিতরে গিয়ে ড্রেন সরু হয়েছে, রাস্তাটা একেবারে গলিতে পরিণত হয়েছে। দু'পাশে ঘিঞ্জি বস্তি। খাপরার চাল ঘরগুলির। সামনের দিকটা দোকান। বাঁশের খুঁটি—খাপরার চাল—টুকরো টুকরো বারান্দার মেঝেগুলো পাকা। তার উপর

পান বিড়ির দোকান, বিড়ি বাঁধাইয়ের আড্ডা, দর্জির দোকান, মধ্যে মধ্যে তেলেভাজা খাবার এবং দু'একটা মুদীর কারবার। কোথাও একটা আধটা সস্তা মনিহারী জিনিস—চ্যাটাইয়ের উপর বিছিয়ে দোকান পাতা হ'ত—আজও হয়তো হয়। পাথরের খোয়াওঠা বন্ধুর পথ খানাখন্দে ভরা—তাতে ধুলো জমে থাকে। দু'পাশে সরু নর্দমা পচা পাঁকে থিকথিক করে। তার উপর দুর্গন্ধ কালচে জল—পুকুরের জলের মতই স্থির। তাতে মরা ব্যাঙ ভাসে; জ্যান্ত ব্যাঙ মাথা জাগিয়ে ড্যাবড্যাব ক'রে চায়। বাঁধানো ধারির উপরেই ভোরবেলা লোকে পাইখানা যায়, ছেলেপুলেরা দিনেও ছুটে এসে বসে। রাস্তার উপরটায় ছেঁড়া কাগজ, ময়লা মোড়া কাগজ, ন্যাকড়ার তাল, মরা ইঁদুর নিত্যই জমে, কখনও কখনও মরা বেড়ালও পড়ে থাকে। রাস্তাটা থেকে দু'পাশে বেরিয়ে গেছে সরু সরু গলি। দুজন লোক দু'দিক থেকে এলে একজনকে পাশ ফিরে বাড়িগুলোর ছিটে বেড়ার দেওয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে পথ দিতে হয় অন্যজনকে। এই বস্তি চলে গেছে প্রায় শহরের শেষ প্রান্তের রেললাইনের ধার পর্যন্ত। সেকালের ই. বি. আর.-এর লাইন। শেয়ালদহের সাইডিং। ইঞ্জিন-ঝাড়া কয়লা ছাইয়ের গাদা ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে ফোঁসায়, মালগাড়ির সারি খানিকটা এগোয়, খানিকটা পিছোয়, দু'একখানা কাটা গাড়ি ছুটে চলে গিয়ে সজোরে খাড়া গাড়িগুলোর সারির পিছনে সশব্দে ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়।

বস্তির মধ্যে খুপরি খুপরি ঘরে মানুষ থাকে, পায়রার কাবুতে যেমন পায়রা থাকে। ঝগড়া করে, মারামারি করে, আবার হাসেও, গানও করে এবং কাঁদে। ড্রেনের জলের মধ্যে ব্যাঙের বাচ্চারা লাফালাফি করে, সরু গলির মধ্যে ইঁদুর ছুটে বেড়ায়, ঘরের মধ্যে নেংটি ইঁদুর লাফায়, আরসোলা উড়ে বেড়ায়, তারই সঙ্গে তাল রেখে অর্ধউলঙ্গ ছেলের দল ঘুরে বেড়ায়, খেলা করে।

খেলা করে ড্রেনে নেমে মরা ব্যাঙ তুলে ছোড়াছুড়ি ক'রে; রাস্তার উপর গুলি খেলে, কড়ি খেলে; নাচে, গান করে। বিড়ি টানে, অশ্লীল গালাগালি ক'রে কৌতুক অনুভব করে; বাজারে গিয়ে চুরি করে; ঘোড়ার গাড়ির পিছনে চ'ড়ে চলে যায়; দল বেঁধে সিনেমার আশেপাশে ঘোরে; অন্য পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারাত্মক মারামারি করে পিকপকেটে তালিম নেয়। পাড়ার বয়স্কদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছে যাদের দেখা যায় কম; যখন দেখা যায় তখন পাড়ার লোক তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়; তারা কখন বের হয় কখন ফেরে কি করে সে খবর লোকে রেখে উঠতে পারে না; তবে কখনও কখনও দ্রুত পদক্ষেপে ফেরে—চোখে তখন তাদের বিচিত্র দৃষ্টি—সতর্ক দ্রুত পদক্ষেপে তারা যেন গলির মধ্যে উধাও হয়ে যায়। কখনও কখনও তাদের কাপড়েচোপড়ে রক্তের দাগ থাকে। মধ্যে মধ্যে এদের খোঁজে পুলিস আসে। কিন্তু তারা যে কোথায় উধাও হয়ে যায় তার আগে সে কেউ বলতে পারে না।

এরই মধ্যে নানীর ঘর। সে একেবারে বস্তির একপ্রান্তে; খানিকটা উঠোনের চারদিকে গোলপাতার ছাউনি—ছিটে-বেড়ার দেওয়াল খান ছয়েক ঘর; তার মধ্যে একখানা ঘর নানীর। একটা বড় কুঠরি—সামনে একটা লম্বা ফালি, সেটা দু' ভাগ করা, তার একখানা নানীর রান্নাঘর, অন্যখানায় রাজ্যের ভাঙা জিনিস; ভাঙা তক্তাপোশ, ভাঙা প্যাকিং বাক্স, ছেঁড়া কাঁথা, ফুটো স্টীলের বাসন, ঘুঁটে, টুকরো কাঠ, ভাঙা ঝুড়ি—অনেক জিনিস। তারই মধ্যে একটু ফাঁক ক'রে নিয়ে সেখানে থাকত বাচ্চি বলে পাতলা ফরসা-রঙ মিষ্টিমুখ একটা বাচ্চা। পাতলা হলেও দেহটা তার শক্ত পাক দেওয়া এবং শক্তিও ছিল তার। বছর দশ এগারো বয়স—সেই বয়সেই সে নানীর চুড়িবোঝাই একটা ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বের হ'ত দশটার সময়। কোন দিন বেনিয়াপুকুর থেকে

শ্যামবাজার, কোন দিন খিদিরপুর, কোন দিন কালীঘাট ; এবং আবার সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসত। কলকাতায় কত মেলা আছে সে কলকাতার একালের লোকেরা জানে না ; হয়তো কোন কালের লোকই সব খবর রাখে না। রাখে শুধু যারা দোকানদার তারাই। তাও সব দোকান সব মেলায় যায় না। কিন্তু চুড়ির দোকান সব মেলায় যায়। কার ফিতেওলারা যায়, আর যায় চানাচুর। নানীর সঙ্গে সে ছিল ক'বছর তার ঠিক নেই। নানীর উঠোনের চারপাশের ঘরের বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল বুড়ো যাদ্দু—তার ব্যবসা ছিল রঙ আলতা তেলের, বুড়ো গাঁজা খেত, খকখক ক'রে কাশত সারারাত। মধ্যে হাঁপানি উঠত। আর ছিল ঝিক্কর বোক্‌রা ; ছাগলের মত দাড়ি ছিল বলে নামের শেষে 'বোক্‌রা' বলত। ঝিক্কর বোক্‌রার ঘর বন্ধই থাকত। সে আসত না—থাকতও না। কখনও কখনও আসত। তু'একদিন থেকেই আবার পালাত। পুলিস আসত তার পরেই। সে নাকি কোকেনের ব্যবসা করত। তু'তিনটে আড্ডা ছিল তার। একটা ছিল কলাবাগানে। আর ছিল তুটি মেয়ে। একজন অ্যালুমিনিয়মের বাসন বেচত ; নগদ পয়সায় নয়—কাপড়ের ছেঁড়া জরিপাড় ছেঁড়া বেনারসীর জরির বদলে বেচত। সুরতিয়া চাচী আর একজন প্রৌঢ়া নেশাখোর মেয়ে—বীভৎস ব্যভিচারিণী। তার নাম ছিল 'রঙ্গিলা বিবি'।

সেদিন—বাচ্চি ছিল সে যখন, তখন তাদের এমন মনে হ'ত না, বীভৎস ব্যভিচারিণী কথাটাও তার অজ্ঞাত ছিল ; তাদের প্রতি ছিল একটা ভয় আর একটা কৌতূহল। তার মনে পড়ে কতদিন রাত্রে উঠে ও মেয়েটার ঘরের দরজায় আড়ি পাতত। কে শিখিয়েছিল আড়ি পাততে—কে তাকে বুঝিয়েছিল এই বীভৎসতার রহস্য তা মনে নেই। হয়তো পল্টন রামেশ্বরোয়ারা, নয়তো নানী—কিংবা জরিওয়ালা চাচীর রহস্যকৌতুকের মধ্যে তার সন্ধান পেয়েছিল—নয়তো বস্তির বাতাস জল থেকে

এ কৌতূহল তার মনে আপনি জেগেছিল ; হয়তো রঙ্গিলা বিবি নিজেই বলেছিল কুৎসিত কদর্য বীভৎস হাসির মধ্য দিয়ে, অশ্লীল বাক্যে সে তো নিজেই জানাতো। মনে পড়ছে।

নানী—মোটাসোটা আঁটসাঁট দেহ—মাথার চুলগুলো সব প্রায় সাদা। কত বয়স ঠাওর তখন করতে পারত না ; লোকে বলত—নানী বুড়ী। নাকে একটা বেসর, কানে মাকড়ি, হাত খালি, মুখখানায় সরু সরু দাগের যেন একখানা মাকড়সার জাল বোনা ছিল। সে রেখাগুলো আজও মনে আছে। কপালের উপরে ছিল তিন চারটে মোটা দাগ—তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে সরু সরু দাগ—এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত। কাটা কাটা লম্বা।

ভোরবেলা কেরোসিনের ডিবে হাতে নিয়ে তাকে ডাকত ঠেলা দিয়ে—এ বাচ্চি—এ লৌণ্ডে—উঠ্‌রে বে—উঠ্‌।

সে চোখ মেলত—দেখত ডিবের আলোয় সেই মাকড়সার জালের মত দাগের জালছাপমারা সেই মুখ। একটু উঠতে দেরি হলেই রেগে খোঁচা মেরে ডাকত—উঠ্‌রে হারামজাদ ; বদমাশ—কুত্তার বাচ্চা—! পথে পড়ে না-খেয়ে মরতিস, কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছি খিলাকে-পিলাকে আর এখুন বদমাশি শুরু কর দিহিস।

নানা তাকে কুড়িয়ে এনেছিল। চুড়ি বেচতে যেত শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট খিদিরপুর—মা বাপ মরা—তুনিয়ার কেউ কোথাও না-থাকা তাকে কুড়িয়ে এনেছিল পাঁচ ছ'বছর বয়সে। তার নিজেরও মনে নেই। তুটো একটা ছবি তার আজও মনে ভেসে ওঠে কখনও কখনও। একখানা মুখ। সে মুখের তুটো বা তু'রকম ছবি। রাঙাপেড়ে শাড়ি পরা কপালে সিঁতুরের ফোঁটা আঁকা সুন্দর একটি মেয়ের মুখ। আবার ধুতিপাড় শাড়ি পরা সিঁতুরের টিপশূন্য কপাল—সেই মুখ। আশ্চর্য সুন্দর মুখ। টকটকে রঙ, বড় বড় চোখ। আরও মনে পড়ছে—নিটোল তুখানা

হাত—তুগাছি শাঁখা ছিল সে হাতে। বসে ভাতের থালায় ভাত ডাল মাখাত। তাকেই খাওয়াবার জন্য।

এ মুখ তার হঠাৎ এক একসময় মনে পড়ে। তার মধ্যে তুঃখ পাওয়ার সময়ই বেশী। মা-বাপ নিয়ে প্রশ্ন তার জাগেই না। কারণ ঘটে না। মা-বাপ না-থাকা এই অবস্থাটাই তার সহজ স্বাভাবিক অবস্থা। এইটেই অভ্যাস হয়ে গেছে। তবুও তুঃখের মধ্যে কখনও কখনও মা বলে দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ে—এবং ওই মুখখানাই মনে পড়ে। নানী তু'একবার বলেছিল—সেই এক হারামজাদী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—সে পেয়ার ক'রে বলত—মা। তার লেড়কা তাই লৌণ্ডেকে কুড়িয়ে এনে এত বড় করেও বেচিনি। নইলে বেচে দিতাম। আগে যেমুন বেচেছি তেমনি বেচে দিতাম। নিয়ে যেত ভিখমাঙা লোক, দিত একটা পা খোঁড়া ক'রে—কি দিত তুটো চোখ অন্ধা ক'রে আর ভিখ মাঙাতো তো ঠিক হ'ত। নেহি তো নিয়ে যেত তুসরা কারবারী লোক তো আচ্ছা হ'ত।

মধ্যে মধ্যে বিচিত্র চেহারার লোক আসত। সেটা সেই প্রথম প্রথম। আবছা আবছা মনে পড়ে। তখন নানীর বাড়িতে আর একটা ছেলে ছিল। ছেলেটা বাঁ হাতে ঢেলা ছুঁড়ত। সেই জন্যে বেশী ক'রে মনে আছে। নানী আগন্তুক লোকগুলোর সঙ্গে দরদস্তুর করত।

—চাই শও রূপেয়া। উস্‌সে এক দামড়ী কমতি নেহি। খিলায়া পিলায়া, এতনা বড়া কিয়া। বহুৎ কামকে ছোকরা।

তারপর ছেলেটা একদিন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। সে তখন ছোট। নানীর সঙ্গে তখন পোষা কুকুরের বাচ্চার মত তার চুড়ি ফিরি করার সময় পিছনে পিছনে ধুকধুক ক'রে ছুটত। ন্যাকড়ায় বাঁধা খাবারের কৌটো ঝুলিয়ে দিত তার কাঁধে আর ফুটপাথে কি মেলায় দোকান

পেতে বসবার চটখানা ভাঁজ ক'রে চাপিয়ে দিত তার মাথায়; সেই সময় একদিন এক চমৎকার কাপড় জামা পরা একজন বিশ্রী দেখতে লোকের সামনে তাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলেছিল—দেখ, কেইসা সুরত লেড়কার। দোনো আঁখ দেখ্। এহি লেড়কাকে অন্ধা দেখলে মানুষের কত দরদ হবে, বোল্, তু হি বোল্! ই পানশো রূপেয়াকে কমতিমে নেহি হোগা।

আভাসে সে দিন সে দারুণ আতঙ্ক অনুভব করেছিল। কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। সারাদিন কেঁদেছিল। সারারাত। নানী লোকটাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। তারপর ঘা কতক দিয়েছিল।—আরে কুত্তির বাচ্চা কুত্তা—কানছিস কাহে রে? আঁ? উ তো চলা গিয়া। তারপর অশ্লীল গালাগাল। সে গালাগালগুলো কিন্তু আশ্চর্য। ওগুলো বোধ হয় কিছুতেই মানুষ ভুলে যায় না। আজও অন্ধকার ঘরে একলা শুয়ে থাকবার সময় নর্দমার পাঁক থেকে ওঠা বুদ্বুদের মত একটি একটি ক'রে বুটবুটি কেটে ওঠে।

রাত্রে সে দিন নানী তাকে আদরও করেছিল।

এর পরও কয়েকবারই কয়েকজন নানীর কাছে এসেছে। নানী বলেছে—নহি। ভাগ্—ভাগ্। ন বেচব হম। ন। ভাগ্ তু।

সে ঘরের ভেতর গিয়ে ভাঙা তক্তাপোশের নীচে নির্বোধের মত লুকিয়েছিল। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছিল। চীৎকার ক'রে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল—গলিতে গলিতে কিংবা ওই দিকে গিয়ে ওই রেললাইনে খাড়া মালগাড়িগুলোর কোন একটার মধ্যে চেপে চলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল নিরুদ্দেশের পথে। কিন্তু সে কাঁদতেও পারে নি, পালাতেও পারে নি। হাত পা সব যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ নানীর 'না' কথাটা শুনে চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছিল।—'ন। ন বেচব হম।'

তারপর নানী বলেছিল—আরে বাবা দুনিয়াতে সব কইকে তো একঠো আপনা আদমী চাই! যিসকা উ নেহি হ্যায় উসকা নোকর

বান্দা দরকার হোতা হ্যায়। উ হমর বান্দা হ্যায়। দুনিয়াকে মার্লিক মিলা দিয়া—উসকো নেহি বেচেগা। না। তু যা, বাবা। উ হমর মোট্‌রী বইবে, কাম করবে, বেমারীমে পানি দিবে—পয়ের দাবাবে। রহে দে। উসকে রহে দে। তু যা।

আর দু-একটা কথার পর বলেছিল—ইসকে বাদ হম ঝাড়ু বাহার করেংগে। সমঝা? ঝাড়ুসে ভাগায়েগা।

তারপর অশ্লীল গালাগাল শুরু করেছিল। খিলখিল ক'রে হেসেছিল রঙ্গিলা বিবি। কেউ কোন অশ্লীল গালাগাল দিলেই সে হাসতে শুরু করত পরমানন্দে। জরি বিক্রি করত সুরতিয়া বিবি—সেও হাসত। বুড়ো ঝিঙ্কর বোক্‌রা হাসতে হাসতে কাশতে আরম্ভ করত। ওগুলি ছিল সেখানে উল্লাসের আনন্দের আশ্চর্য উপাদান।

সেও উল্লসিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল তক্তাপোশের তলা থেকে। এবং সেদিন সন্ধ্যায় সে উপযাচক হয়ে নানীর পা টিপে দিয়েছিল।

নানী তাকে সেদিন আদর ক'রে শালা বলে গাল দিয়েছিল। বলেছিল—তু শালাকে হামি সব দিয়ে যাব রে। বেইমানি করিস না। কছু রূপেয়া ভি আছে—সব তুকে দিব।—বুঝলি? আর বেইমানি বদমাশি করবি তো শালাকে বেচে দিব।

সেদিন শুধু সে নানীরই পা টিপে ক্ষান্ত হয় নি, নানী যখন সন্ধ্যেবেলা আপিং খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করেছিল তখন বেরিয়ে এসে গাঁজাখোর রঙওয়ালা যাদ্দুর গানের আসরে গিয়ে হাজির হয়ে বলেছিল—যাদ্দু চাচা বাজা বাজাই তোহার গীতকে সাথ?

সন্ধ্যেবেলা গাঁজা খেয়ে মৌজ করে যাদ্দু গান ধরত। বাঙলা গান। তার একটা কলি জনের আজও মনে আছে।—

'ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এলো না—'
কি করিব কুথায় যাবো—কুথায় গেলে পাখী পাবো—।

ভাঙা ভাঙা গলা হোক, যাদ্দুর গানে তালের ভুল হ'ত না।

বাচ্চি ঠিক বুঝতে পারত। সে নানীর ঘর থেকে একটা লিলি বিস্কুটের গোল টিন—আকারে একটা বড় মগের মত—সেটা যোগাড় ক'রে রেখেছিল। মাটিতে তার কাটা মুখটা রেখে সে বাঁয়া তবলা দুইয়ের কাজ চালিয়ে চমৎকার বাজনা বাজাত। বোল তার হাতের আঙুলে যেন জন্ম থেকে জমা হয়ে ছিল। আরও ছিল তার বাদ্যযন্ত্র। মাটির খোলে বাঁশের টুকরো লাগিয়ে যে বিচিত্র বেহালা বা সারেঙ্গী ফিরি করে ফিরিওয়ালা তাও সে সংগ্রহ করেছিল। নিপুণভাবে বাজাতে পারত। আর ছিল বাঁশের বাঁশি। গান সুর তার গলাতেও ছিল। শুনবামাত্র শিখে নিত। কিন্তু নানী তাকে গাইতে দিত না। সেদিন নানীর ঘুমের সুযোগে তার বিস্কুটের টিনটা এনে এমন সঙ্গত শুরু করেছিল যে যাদ্দু বাহবা বাহবা ক'রে নতুন গান ধরেছিল। এবং রঙ্গিলা প্রমত্ত অবস্থায় বেরিয়ে এসে হাত ঘুরিয়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে নাচতেও শুরু করেছিল।

গানের শেষে যাদ্দু তাকে বলেছিল—তু বাচ্চি গানা গেয়ে ভিখমাঙোয়া হয়ে যা। তোর বহুত রোজগার হবে।

রঙ্গিলা বলেছিল—আরে শালা তু হামার সাথে চল, তোকে লিয়ে হমি ভাগি—নানী পাত্তা পাবে না, তু শালা গান করবি, হমি নাচবে।

বাচ্চি পালিয়ে এসেছিল—না।

বেইমানি সে নানীর সঙ্গে করবে না। কোনদিন না। প্রাণপণে এ কথা সে রাখতে চেষ্টা করেছে, প্রাণপণে। নানী যা বলত তাই সে করত, অন্ততঃ করতে চেষ্টা করত।

ভোরবেলা কেরোসিনের ডিবে হাতে নানী তাকে ডাকত—এ বাচ্চি—এরে লৌণ্ডে—এ বে, উঠ্ রে বে—উঠ্। যা জলদি যা। নেহি তো সব লিয়ে লিবে—উ লোক।

অধিকাংশ দিনই বাচ্চি তড়াক ক'রে উঠে পড়ত। শুধু নানীর কথাতেই নয় একটা নেশায় যেন টানত। পোড়া কয়লার নেশা।

আধো অন্ধকার, ঝাপসাপানা আকাশ, বস্তির পথঘাট সব নির্জন। শুধু কাক কা কা শব্দ ক'রে উড়ে উড়ে চালে বসছে, পথে নামছে ; বস্তিটার বড় রাস্তাটায় গ্যাসের আলো টিমটিম ক'রে জ্বলছে। উঠোনে উঠোনে বা ঘরে ঘরে মোরগগুলো চেঁচাচ্ছে। এরই মধ্যে বাচ্চার দল উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে। কিছু যায় ডাস্টবিন খুঁজতে, কতক যায় রেলওয়ে সাইডিংয়ে। শেয়ালদহের বজবজ ডায়মণ্ড হারবার লাইনের দিকে সাইডিংয়ে শান্টিং করা ইঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা থেকে বেছেবুছে পোড়া কয়লা কুড়োতে। ছুটে এসে এক একজন এক একটা জায়গার ছ'দিকে দাগ মেরে বসে যেত কুড়োতে। এ অধিকারে অন্য কেউ হাত বাড়ালেই দাঙ্গা বাধত। কিল চড় ঘুঁষি, আঁচড়ানো কামড়ানো—সব চলত। মেয়েতে মেয়েতে, মেয়েতে ছেলেতে, ছেলেতে ছেলেতে।

মেয়েগুলো গান গাইত, তার সঙ্গে সেও ; তার গলা সকলকে ছাপিয়ে বাঁশের বাঁশির মত বাজত। প্রত্যহ এক গান। কতকাল থেকে ওখানে সকালে এই গান গাওয়া হয়ে আসছে তা কেউ জানে না। জন বেশ জানে আজও সেখানে ও গান গাওয়া হয়।

> "সোনেকা দাঁড় পর সোনেকা চিড়িয়া—
> লোহেকা লাইন পর লোহেকি গাড়িয়া—
> সাহবনে বানায়া কেয়া আজব কারখান্না—
> টিকস কাট্ লে পিয়ারী হো যা সোয়াবিয়া—"
> হা-হা-হা—হা-হা-হা—হা-হা—রে—।

কখনও গান বন্ধ ক'রে বাচ্চি শিস দিয়ে গানটা নিখুঁত সুরে গেয়ে যেত মেয়েদের সঙ্গে।

হঠাৎ গান থেমে যেত। গান থামিয়ে হা-রা-রা-রা চীৎকার ক'রে উঠত সকলে। ঝগড়া লেগে গেছে দুজনে। সরবতিয়া

আর জুবেদার মধ্যে। এ ওর চুল ধরেছে—ও ওর ছুই গালে খামচে ধরেছে। আর আকাশ ভরে চীৎকার করছে—ই—ঈ—ই—ঈ—ই—ঈ।

দাঁড়ানো ইঞ্জিনটার উপর দাঁড়িয়ে নীল পোশাক পরা মাথায় রুমাল বাঁধা ড্রাইভার ফায়ারম্যান হাসছে।

আবার থামত ঝগড়া। দূরে দূরে বসে ছুজনে ছুজনকে কুৎসিত অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করত। অভিসম্পাত দিত।—ইঞ্জিনে কেটে যাবি তুই—মরবি। দেখবি বিরেক খুলে গড়গড় ক'রে এসে তোকে কেটে দেবে।

—তোকে ওই লাইনের ফাঁক থেকে সাঁপ বেরিয়ে কাটবে। দেখবি।

এরই মধ্যে কেউ কেউ ড্রাইভারকে সাধাসাধি করত। ও পাশের গাদা থেকে কয়লা কুড়োতে দেবার জন্য। ড্রাইভার ঘাড় নাড়ত—না।

—থোরা—যাস্তি নিবে না ড্রাইবর সাব।

—আরে নেহি!

—গোড় লাগি।

ড্রাইভার এবার ডাণ্ডা বের করত লোহার—মারেগা!

ও দিকের গাদা যুবতী মেয়েদের জন্য। ড্রাইভার ফায়ারম্যান পাহারা দিয়ে রাখে। ওর তলায় চ্যাঙড় চ্যাঙড় গোটা কয়লা আছে। সে সব মেয়েরা আসে ছুপুরবেলা। নয়তো সন্ধ্যের পর। জরিওয়ালী চাচী আসে তখন। চাচীর রান্না হয় কাঁচা কয়লায়। শুধু রান্নাই হয় না। চাচী কিছু কিছু কয়লা বিক্রিও করে।

এরই মধ্যে এক একদিন ছুটে চলে যায়। একটু দূর দিয়ে একদল ছেলে আর ছু'চারজন জোয়ান। ওরা বয়সে বড়। পনের ষোল বছর বয়স। যখন ওরা পালায় তখন ওদের হাতে বগলে

বা মাথায় জিনিস নিয়ে পালায়। কোনদিন হেঁকে বলে যায়—ভাগ ভাগ। পুলুস।—

ওরা ওয়াগন থেকে জিনিস চুরি করে। পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় এদেরও সাবধান ক'রে দিয়ে যায়।

এরাও পালায়।—ভাগ বে ভাগ। ভাগ।

দৌড়োয় এরা কিন্তু ঝুড়ি কেউ ফেলে না।

আজও—আজও বোধ হয় ঠিক তেমনি ক'রে কয়লা কুড়োনো চলছে, গান চলছে,—সেই গান; আজও ওয়াগন থেকে চুরি চলছে। তেমনি করেই কয়লা কুড়োয় যারা তারা পালাচ্ছে। ঝুড়ি বুকে ক'রে। সে হয়তো এখানে—জন যে আরামে রয়েছে সে আরামের মধ্যে বসে মনে হবে কত কষ্ট কত কদর্য কত কুৎসিত —কিন্তু বাচ্চির তা মনে হ'ত না। আজও জনের বুকটা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তোলপাড় ক'রে ওঠে।

বাড়ি ফিরে আসত কয়লার ঝুড়ি মাথায় ক'রে। যে দিন পালাতে হ'ত না সে দিন রোদ্দুর উঠে যেত। নানী তখন বসে বাসী রুটি গুড় আর চা খেত। আর আপন মনে বকত। গাল দিত। দুনিয়াকে গাল দিত, ঈশ্বরকে দিত, সূর্যকেও দিত। গরমের দিন রোদ্দুরের জন্যে দিত। শীতের দিন বাড়ির পাশের অশথ গাছটাকে দিত ছায়ার জন্যে বাতাসের জন্যে।

ওপাশে যাদ্দু বুড়ো গাঁজা টিপতো। জরিওয়ালী চাচী বাসন সাজাতো। ব্যবসায় বের হবে। তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো রজিলা বিবি।

কয়লা কম হলে নানী শাসাতো তাকে—দাঁড়া দাঁড়া—বেচব তোকে বেইমান। জরুর বেচব।

কয়লা বেশী হ'লে বলত—তু হারামজাদ হামার বহুৎ আচ্ছা

রে—শালা বেটা শালা রে! লে—চা পি লে। রোটী লে। জলদি খা লে। জলদি জলদি।

তারপর তার কোমরের গেঁজে থেকে বের ক'রে দিত ছটা পয়সা। বলত—লে। যো—বাজার যো। ভালা দেখ্‌কে লিবি। গোস্‌ লিয়ে আসবি। টেংরি লিবি—বড় কোয়া লিবি। পিয়াজ, মিরচাই। একঠো ছোটাসে কোবি। আর আলু। মোটো মোটো। হাঁ। নেহি তো খানে মিলবে না। ছ পয়সা দিয়া। ছও অনেকা বাজার আনবি।

ছ পয়সায় কপি লঙ্কা মোটা আলু পাঁঠার টেংরি—সব মিলিয়ে ছ আনার বাজার চাই নানীর। তাতেও মজার নেশা ছিল বাচ্চির। তার সহায়ও ছিল। পাড়ার।

এতক্ষণে শিউরে ওঠে জন। স্মরণ করার মধ্যে যে বিচিত্র এক ভাল লাগার স্বাদ এতক্ষণ সে অনুভব করছিল তা যেন মুহূর্তে তীব্র তিক্ত হয়ে উঠল।

পল্টন—দবির—গণপৎ—রামেশ্বরোয়া। কসাইয়ের ছেলে পল্টন। কটা কটা চোখ, লালচে লম্বা চুল, হিলহিলে লম্বা, শক্ত শক্ত গড়ন, মুখে দুটো বড় বড় কুকুর-দাঁত। চৌদ্দ পনের বছর বয়স, সেই ছিল এই চারজনের দলের দলপতি। পল্টনের বাপের ছিল কসাইয়ের দোকান আর ছিল দুখানা ঘোড়ার গাড়ি—একখানা ফিটন একখানা থার্ডক্লাস ঢাকা গাড়ি। ভাড়া খাটত। পল্টনের বড় ভাই ছিল গাড়ির মালিক। সন্ধ্যেবেলা পল্টনকে বের হ'তে হ'ত দাদার সঙ্গে গাড়িতে। বাপ ঠিক ক'রে দিয়েছিল এ ডিউটি। গাড়ি থাকত এসপ্ল্যানেডে, চৌরিঙ্গীর পশ্চিম গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকত সারি সারি। এখন যেখানে ট্যাক্সি থাকে। পল্টন হঠাৎ দল ছেড়ে বলত—চললাম বে। ডিউটি দিতে। দবির গণপৎ রামেশ্বরোয়াদের কেউ কেউ সঙ্গে যেত। এসপ্ল্যানেডে ঘুরত। অপেক্ষা করত পল্টনের জন্য। বারোটা একটা দেড়টায় বাড়ি

ফিরত। বিচিত্র রোমাঞ্চকর লালসার গল্প করত। বয়সে তারা বাচ্চির চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় তবু বাচ্চিকে ওরা দলে নিয়েছিল। ওরাই নিয়েছিল। বাচ্চির গানের জন্যে, তার বাজনার জন্যে। আর তার মিষ্টি চেহারার জন্যে। ওদের গোপন আসর ছিল একটা; বস্তির মধ্যে একখানা ভাঙা মাঠকোঠা,—সেটা কি একটা মামলার জন্যে পতিত হয়ে পড়ে ছিল। সেই কোঠাবাড়ির ভাঙা ঘরে আড্ডা ছিল। আর উঠোনে হ'ত তাদের উৎসব। গান বাজনা।

পল্টন তাকে আদর ক'রে বলত—আ বে শালা বাচ্চি—তু শালা যদি ছোকরী হতিস তো তুকে হমি সাদী করতম। নেহি তো তুকে ফুসলায়কে লিয়ে ভাগতম বম্বই।

বাচ্চি তাতে গৌরব অনুভব করত, খুশী হ'ত।

এই পল্টনের দল তাকে বাজারে ছ পয়সায় ছ আনার বাজারের কসরত শিখিয়েছিল। তারা এই সময়টায় বাজারে থাকত। পকেট মারত। সপ্তাহে তিন চারটে বাজার ঘুরত। একই বাজারে পরপর দু'দিন কখনও যেত না। একদিন লিণ্টন স্ট্রীটের বাজার —একদিন এণ্টালীর বাজার—একদিন পার্ক সার্কাসের বাজার, এমনি ক'রে ঘুরত। কয়েকটা বিচিত্র কৌশল ছিল। সহজ কৌশলও ছিল। বাজারে ছড়িয়ে-পড়া আলু পটল কুড়িয়ে নিত। লঙ্কার দাম করতে গিয়ে একটা দুটো লঙ্কা হাতসাফাই করত। ভিড় যেখানে সেখানে ছোট্ট ছেলে ছোট্ট হাতখানা মানুষের পায়ের ফাঁক দিয়ে চালিয়ে সুযোগমত কিছু একটা টেনে নিত। বিচিত্র কৌশল ছিল—তাকে ঠেলে দিত আলুর গাদায়; পল্টন বা দবির বা গণপৎ ঠেলে দিয়ে গাল দিয়ে পালাত। বাচ্চি পড়ত, আলু ছড়িয়ে পড়ত; বাচ্চি উঠে ওদের গাল দিত, মুঠি উঁচিয়ে বলত —শালা হারামী বদমাশ—আমাকে ঠেলে দিলি—আমি শোধ লিব —ঢেলা ছুঁড়ে তোর কপাল ফাটাবো রে শালা। এর ফাঁকে কখন

কয়েকটা আলু তুলে নিয়ে ঝোলায় বা হাফপ্যান্টের পকেটে পুরে ফেলত। কিনতে হ'ত 'কোবি'—বড় জিনিস—ওটা হাতানো চলত না। আর কিনত এক পয়সায় বা দু'পয়সায় একটা বা দুটো বোক্‌রীর টেংরি। ছিটিয়ে পড়া মাংস কুড়িয়ে নিত। পল্টনের বাপের দোকানে পল্টনের খাতিরে একটা টেংরি বরাদ্দ ছিল। সেটা পেত।

পল্টন রামেশ্বর এরা বাচ্চিকে একজায়গায় যেতে বারণ ক'রে দিয়েছিল। বলেছিল—মছুয়ার কাছে কখুনও কুছু বেল্লিকি করবি না। উ লোকের ওই হাতিয়ার না—বঁটি—উ ভারী জবর হাতিয়ার। বাপরে বাপ! একবার শালা—বাপজী বলে—ঝগড়া হ'ল মছুয়াদের সঙ্গে। শালা মদ খেয়েছিল মছুয়াটা—তার বঁটি দিয়ে শালা দিলে কোপ ঘাড়ে তো লোকটার মুণ্ডু গব্বুতে যেমুন মারবেল গোলি গিয়ে পড়ে তেমনি গিয়ে পড়ল ড্রেনে। শালা। বড়া খারাপ জাত। ছুঁয়া মৎ যাও।

সে কথা বাচ্চি মনে রাখত। ওদের কাছে মাছের কাঁটা মাছের ছাল খানিকটা গন্ধ হওয়া টুকরো চেয়ে নিত।

দিত তারা। বাচ্চির চেহারার জন্য দিত। তাদের মায়া হ'ত। এসব জায়গায় ইনিয়ে বিনিয়ে মা মরা বাপ মরা পঙ্গু নানীর পোষ্য হয়ে থাকার কাহিনী বলতে সে চমৎকার শিখে নিয়েছিল কিছু দিনের মধ্যে। বড় বড় সুন্দর চোখ দুটি তার ছলছল ক'রে তুলবার কৌশলও তার আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল।

ছ পয়সায় ছ আনার বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখত নানী বাসী রুটি বাসী ভাত তরকারি সাজিয়ে থালা নিয়ে পা ছড়িয়ে খেতে বসেছে। খেতে খেতেই বলত—নিয়ে আয় দেখি কি আনলি।

দেখে খুশী হ'ত বুড়ী। তবে খুঁতখুঁত করতে ছাড়ত না।—আর থোড়া মোটো আলু আনতে পারলি না? এঃ—মছলি তো বদবয় দিচ্ছে।

কাঁচা লঙ্কা একটা ভেঙে খেতে আরম্ভ ক'রে কোন দিন বলত—হাঁ। বহুত তেজী আছে।

কোন দিন ফেলে দিয়ে বলত—থু-থু-থু। এ কি মিরচাই আছে। না কাঁকড়ি আছে। ভাগ্।

তারপর তাকে দিত খেতে, তার এঁটো কিছু এবং ঘর থেকে কিছু। সে খেয়ে নিতো—নানী চুড়ির ঝুড়ি গোছাতো। সে খেতো আর রঙ্গিলা বিবির বেড়ালটা এসে বসত। আর আসত গলায় লোহার বালা পরা কাকটা। কাকটার বাসা নানীর ঘরের পুব-দক্ষিণ কোণের অশথ গাছটায়। কে কবে ওকে ধ'রে ওর গলায় ওই সরু লোহার বালাটা খুব টাইট ক'রে পরিয়ে দিয়েছিল কে জানে—সেটা কিন্তু ও খসাতে পারে না। কতদিন হয়ে গেল—অভ্যাস হয়ে গেছে—সয়ে গেছে, তবুও মধ্যে মধ্যে গলা মাথা ডাল বা যে কোন কিছুর গায়ে লাগিয়ে ঘষতে শুরু করে। কাকটা নামত এঁটো টুকরোর জন্য।

খাওয়া শেষ ক'রে ঝুড়ি মাথায় বের হ'ত নানীর সঙ্গে। দু'বছরের মধ্যেই ওর বয়স সাত আট হতেই নানী ওর মাথায় ঝুড়ি তুলতে শুরু করেছিল। প্রথম প্রথম ছোট ঝুড়ি, তারপর কিছু বড়, তারপর ও বইতো বড় ঝুড়িটাই।

—চুড়ি। চু—ড়ি। চুড়ি চাই চুড়ি।

মেলায় বা ফুটপাথের দোকানে হাঁকতে হ'ত না। বেশী বইতেও হ'ত না। পাড়ায় ফিরি করবার দিনেই হাঁক ছাড়ত নানী—তার সঙ্গে সে। আর বইতেও হ'ত বেশী।

—রে—শ—মী চুড়ি। বেলোয়ারী চুড়ি। চু—ড়ি চাই—। চু—ড়ি।

দুপুরবেলা বাড়িতে বাড়িতে মেয়েদের স্বাধীন রাজত্ব। বেটাছেলেরা আপিসে যেত। থাকত মেয়েরা। তারা ডাকত—এই চুড়ি।

নানী তাকে নিয়ে ঘরের দরজার মুখেই ঝুড়ি নামিয়ে বসত।

কত সুন্দর মেয়ে—কত সুন্দর মুখ। কত সুন্দর কাপড়—কত সোনার গহনা। কত বড় বাড়ি। নানী চুড়ি পরাতে বসত—সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। ফ্রকপরা ঘাড় ঘেঁষে চুল ছাঁটা ছোট মেয়েগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ত তার পল্টনের অশ্লীল কথাগুলি!

ক্বচিৎ কখনও লালপেড়ে শাড়ি পরা কপালে সিঁদুরের টিপ আঁকা কোন সুন্দর বউয়ের বা তরুণীর মুখ দেখলে ছ্যাঁৎ ক'রে মনে পড়ে যেত আর একখানা মুখ।

মেয়েরা নানীকে প্রায় জিজ্ঞাসা করত—'এ বুঢ়ীয়া!' বা 'এই নানী'—এ ছেলে কে রে? এ্যাঁ—একে কোথায় পেলি? সেই যে আগে যে ছোকরা তোর ঝুড়ি বইত সে কোথায়? এ তো ভারী সুন্দর রে। এই ছেলে—কি নাম রে তোর? এ্যাঁ? এ বুড়ীয়া কে হয়?

বাচ্চি বুঝতে পারত না তাদের সন্দেহের কথা।

আজ এতকাল পর দশ বছর এই পরিবেশের মধ্যে থেকে বড় হয়ে বুঝতে পারছে তাদের সন্দেহের কথা।

জন বসে ছিল একখানা চেয়ারে; সামনে দরজার ওদিকে খোলা ছাদের মাথায় নীল আকাশ; আকাশে তারা ফুটে রয়েছে অসংখ্য। ঝিকমিক করছে। শহরের আলোর ছটা অনেকটা উপর পর্যন্ত উঠে একটা আভা বা দীপ্তিচ্ছটার স্তরের সৃষ্টি করছে। কিন্তু তার দৃষ্টি কোন দিকে কোন কিছুতে আবদ্ধ ছিল না।

চাচী নিষ্ঠুর কথায় তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে—তুই অকৃতজ্ঞ, তুই নিষ্ঠুর। ভাব তো তুই কি নরকে ছিলি? ভুলে তো যাস নি।—

ওই কথায়, শুধু ওই কথাতেই নয়, ফাদারের অবিশ্বাসে; শুধু

তাও নয়—আরও আছে ; সে বড় হয়েছে—সে স্বাধীন হ'তে চায় ; সে জানে সংগীতবিদ্যায় তার দখলের জোরে সে প্রতিষ্ঠা পাবে—সে উপার্জন করবে। অনেক উপার্জন। সে উপার্জনে সে তার জীবনের তৃষ্ণা মেটাবে।

ফাদার বলে গেছেন ইঙ্গিতে তার এই তৃষ্ণার উৎস ওই বস্তি-জীবনের পিপাসা পর্যন্ত প্রসারিত। তাই কি ?

হয়তো তাই। হয়তো নয়, তাই খুব সম্ভবতঃ।

কথাগুলি আশ্চর্যভাবে মনে আছে। পরের পর মনে পড়ে যাচ্ছে। আর ভালও লাগছে।

এদিকে দেওয়ালের গায়ে একখানা বড় আয়না। সেই আয়নায় তার ছবি ফুটেছে। সুন্দর, অতি সুন্দর তার চেহারা! তার বড় বড় সুন্দর চোখ দুটোর তুলনা হয় না। আয়নার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তার নিজেরই যেন নেশা লাগে। বিশেষ ক'রে ওই চোখ দুটির দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে। নিজের ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। হেসে সে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে তার প্রতিবিম্বের দিকে—সে কটাক্ষ ফিরে আসে তার কাছে। তার ইচ্ছা হয় একবার গিয়ে দাঁড়ায় সেই বেনিয়াপোখরের বস্তির মধ্যে। পল্টন—

শিউরে ওঠে জন। না—পল্টন নয়। পল্টন নয়। হে ঈশ্বর, পল্টনের হাত থেকে তাকে রক্ষা কর। কসাইয়ের ছেলে পল্টন—সাক্ষাৎ শয়তান। কিন্তু রোশনি!

রোশনি! রোশনি! রোশনি!—নামটা গুঞ্জন ক'রে ওঠে তার মনের মধ্যে। ছোট্ট দশ এগার বছরের মাথায় খাটো ক্ষয়াটে দেহ একটি মেয়ে—চোখ দুটো আশ্চর্য লম্বা—কিন্তু ডাগর নয়। তাতে সে কি চাউনি! নাকটা পাতলা আর টিকলো। ঠোঁট দুটো পাতলা ধারালো। দাঁতগুলি ঝকঝকে ছোট ছোট। মাথায় প্রচুর চুল। তখন কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া হয়ে পড়ে থাকত। রঙটা শ্যামলা। ভিখিরীর মেয়ে। দুশমনের মত চেহারা—প্যাঁকাটির

পাঁজরা বের-করা চেহারা—নেশাখোর—ভিক্ষুক। আজ জন বলতে পারে—লোকটা ছিল রাজস্থানী। মধ্যে মধ্যে বলত আজমীরের কথা। বলত—চল্‌ বাচ্চি চল্‌ আজমেড়। দশবছরের রোশনী—পোশাক ছিল ছিটের একটা সায়ার মত ঘাগরা আর গায়ে পরত একটা ছেঁড়া ময়লা ব্লাউজ। দুটো মিলিয়েই হয়তো একমাত্র পরিধান বস্ত্র ছিল; ময়লায় ময়লায় তার কোন রঙ ছিল না। কাদামাখা ন্যাকড়া মনে হ'ত। মাথার চুলগুলো ছিল রুক্ষ—তেল কখনও মাখত না। প্রচুর, খাটো চুলগুলো রুক্ষতার জন্য ফুলে ফেঁপে রাশীকৃত হয়ে ছোট কপালখানাকে ছাড়িয়ে চোখ ঢেকে গাল ঢেকে এসে এসে পড়ত—মেয়েটা আশ্চর্য লাস্যের সঙ্গে শীর্ণ অথচ সুন্দর হাতখানা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে মুচকে হাসত। আর ছিল সুন্দর কণ্ঠস্বর। ওই বুড়োর হাত ধরে মৌলালীর মোড়ে—কর্পোরেশনের ডিপোরও পুবদিকে—খালের পুলের তলা থেকে চৌরিঙ্গী এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গান গেয়ে ভিক্ষে করত, দক্ষিণে আসত পার্ক স্ট্রীট সারকুলার রোড পর্যন্ত। বুড়ো গাইত মোটা গলায়, রোশনি গাইত মিহি গলায়। ওদের আবিষ্কার করেছিল পল্টনের দাদা। রোশনির বড় বোন ছিল—তাকে দেখে নি বাচ্চি। পল্টনের দাদা ফিটনের কোচম্যান তাকে গায়েব ক'রে রেখেছিল। সে নাকি আশ্চর্য মোহময়ী মেয়ে। তাকে টোপ ক'রে রাত্রে পল্টনের দাদা রোজগার করত। সময় সময় বাবুভাইদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত। পল্টন পাকড়েছিল দশবছরের রোশনিকে। মধ্যে মধ্যে তাকে এনে নেচে গেয়ে হুল্লোড় করত। নেশাখোর বুড়ো গাল দিত। খুন করবার ভয় দেখাত। কিন্তু নেশা পেলেই ভুলে যেত। আপিং—ডেলাবন্দী আপিং আর চা খেয়ে বুঁদ হয়ে ঝিমিয়ে থাকত। রোশনি। দশবছরের সেই রোশনি বারো-বছরের বাচ্চির মনে একটা নিদারুণ লালসাময় তৃষ্ণা জাগিয়েছিল। পল্টনের ভয়ে রোশনির দিকে কারুর হেসে তাকাবার বা তাকে

ছোঁবার অধিকার ছিল না কিন্তু রোশনি তার ঝাঁকড়া চুল মুখে চোখে ইচ্ছে ক'রে এনে ফেলে তার আড়াল দিয়ে বাচ্চিকে টানত। বাচ্চির সেই বয়সের রূপেই রোশনি আকৃষ্ট হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে সুযোগ পেলেই ফিসফিস ক'রে বলত—তু বহুত খুবসুরত রে বাচ্চি। মোহনিয়া রে। আঃ—হা। তেরা আখোঁকে লিয়ে মেরি দিল উদাস হো যাতা রে!

আরও বলত—তু তো কোয়েল হ্যায়। কেয়া মিঠি আবাজ!

সেই-ই গাইত রোশনি নাচত। দশ বছরের রোশনি। এখন সে যুবতী। কিন্তু কেমন হয়েছে সে জানে না। তবু কল্পনা ক'রে নেয় তার মনের মতন। এবং আজ তার এই রূপ এই মার্জনা এই মার্জিত পরিচ্ছদ পরে রোশনির সামনে দাঁড়াতে চায়। ডাকতে চায়—রোশনি! পহঁছানো তো মেরি জানি—বাতাও ময় কৌন হুঁ!

কল্পনা করে যৌবনপরিপুষ্ট মদের মত আকর্ষণভরা চাউনি চেয়ে রোশনি গেয়ে ওঠে—

ঠিক এই সময়েই ক্রাচের ঠকঠক শব্দ উঠল ও ঘরে।

বাল্যের বস্তির ছেলে বাচ্চি কৈশোর থেকে ফাদার ন্যাথানিয়েলের পালিত শিক্ষিত মার্জিতরুচি সুন্দর জন চমকে উঠল।

লনা আসছে। লনা।

বিরক্তিতে তার মন ভরে গেল। লনা! একটা পা পঙ্গু—ননীর মতন নরম, সকরুণ বিষণ্ণ আয়ত দুটি চোখ—তাতে কি বিষণ্ণ শান্ত দৃষ্টি—লনা। জনের সব চঞ্চলতা—স্নায়ুমণ্ডলীর সব উত্তেজনা এখনি শান্ত হয়ে যাবে, কেমন হয়ে যাবে মন—কেমন হয়ে যাবে পৃথিবী; যেন ঘুমন্ত স্বপ্নাচ্ছন্ন পৃথিবী।

কেন আসে লনা? কেন?

॥ তিন ॥

দরজার সামনে এসে লনা দাঁড়াল। ঘরের দরজার মুখেই বসে ছিল জন। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। আলো নিভিয়েই জন বসেছিল। চাচী তাকে নিষ্ঠুর সত্য মনে করিয়ে দিয়েছে কঠোর, অতি কঠোর ভাষায়। তার থেকেও নিষ্ঠুর আঘাত সে পেয়েছে ফাদারের মিষ্ট ভাষায়,—তিনি যেন তীক্ষ্ণ সুচকে স্নেহ এবং ভদ্রতার শানযন্ত্রে শাণিত করে এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল ক'রে তুলে তার বুকের ভিতর ওষুধ প্রয়োগের অজুহাতে আমূল বিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন—তুমি জীবনে এক অপবিত্র অশুচি রোগের রোগী, আজ দশ বৎসরের সেবা-যত্নে, ওষুধের কল্যাণে সে-রোগের সকল বাহ্য লক্ষণ ও উপসর্গগুলি চলে গেলেও ভিতরে ভিতরে সে আজও আছে। যক্ষ্মারোগের বীজাণু যেমন শ্বাসস্থলীর কোন একটি স্থানে বাসা বেঁধে থাকে তেমনিভাবে অশুচিতা অপবিত্রতার বীজ তার যে অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে ফাদার তাঁর ওই অতি সূক্ষ্ম উজ্জ্বল সুচটা সেইখানে বিদ্ধ ক'রে দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিলেন। মুহূর্তে বীজাণুগুলি নড়ে উঠেছে আহত হয়ে, সঙ্গে সঙ্গে মনও তার আহত হয়েছে। বুঝতে পেরেছে—সে অশুচি।

শুচি লনা এসে সামনে দাঁড়াল।

ফাদার লনাকে বলেন—মূর্তিমতী শুচিতা। মধ্যে মধ্যে ফাদার বলেন—লনা—পবিত্র লনা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা। দেবদূত। অন্যের সামনে বলেন না তবে ঘরে বলেন—লনা ইজ ডিভাইন।

চাচীও তোতাপাখীর মত কথাগুলি আওড়ায়। নিজের ভাষাতে বলে—লনা গঙ্গাজল। গায়ে যদি হাত বুলোয় তো পাপ দূর হয়।

চাচী কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের লোক, হয়তো সেখানে গঙ্গার

জল সোনা, কলকাতাও সে দেখেছে, কলকাতার পঙ্কিল কলুষ ড্রেন বেয়ে গঙ্গায় পড়া হয়তো দেখে নি—কিন্তু—না শোনা নয়। তবু গঙ্গাজলই তার উপমা।

হিমশীতল মন, মনে হয় দেহের পঙ্গুতা তার মনকেও পঙ্গু করেছে। একটা অস্বাভাবিক পাণ্ডুর দেহবর্ণ লনার। মুখখানা সুন্দর—হ্যাঁ সুন্দর বলতেই হবে, বড় বড় শান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি; ঘন কালো রেশমের মত চুলে ঢাকা মসৃণ কপাল; গাল দুটি নিটোল, পাতলা ঠোঁট—সবই আছে কিন্তু কেমন যেন অস্বাভাবিক একটি ধীরতা বা অচঞ্চলতায় বড় স্থির, মধ্যে মধ্যে মনে হয় নিষ্প্রাণ। সে হাসে—কিন্তু সে হাসিতে চঞ্চলতার আবেগ নেই, সে তার দিকে তাকায়, অনুরাগ তাতে আছে; না—অনুরাগ নয়, স্নেহ বটে মমতা বটে, অকপট তাও সে স্বীকার করে কিন্তু তাকে সে কামনা করে—এ সত্যের, সেই চঞ্চল ঝিকিমিকি ছটা নেই। নেই।

লনা এসে ডাকলে—জন।

উত্তর দিলে না জন। লনার উপস্থিতিতে সে অস্বস্তি বোধ করছে।

—অন্ধকারে কেন জন? লনা এগিয়ে গেল সুইচটা অন ক'রে দিতে। জন মুহূর্তে যেন সংযম হারিয়ে ফেললে, সে দাঁড়িয়ে উঠে তার হাতখানা বাড়িয়ে লনার হাত চেপে ধরলে—না—আলো জ্বেলো না।

ওঃ, লনার হাতে সেই ঠাণ্ডা স্পর্শ। অবশ্য লনার এতে নিজের কোন দোষ নেই। ফাদার ডাক্তার দেখিয়েছেন। ডাক্তার বলেছে এটা ওর ব্যাধি নয়, কনস্টিটুশনাল ডিফেক্ট-ও ঠিক বলব না, বলব কনস্টিটুশনই ওর এই রকম। সাইকোলজিক্যাল কারণে ফ্রিজিডিটিও নয়, সেও তো দেখা হয়েছে। তবে কনস্টিটুশনও মানুষের বদলায়। সে বদলাতে পারে, অসম্ভব নয়।

লনার হাত শুধু ঠাণ্ডাই নয়, হাত তার ঘামেও। ছেড়ে দিল সে

হাতখানা। মুখে একটু নরমভাবেই বললে—আলো ভালো লাগছে না আমার লনা।

—আমি যে বুঝতে পারছি জন তুমি মনে মনে অত্যন্ত পীড়িত হয়েছে—উত্তেজিত হয়েছ। কিন্তু ফাদার তোমার ভালোর জন্যেই—

—প্লিজ, প্লিজ লনা! আমি অপবিত্র—আমাকে স্পর্শ করো না তুমি।

—জন! তুমি ভুল বুঝছ। ভুল করছ। ফাদার—

লনার কথা কেড়ে নিয়ে জন বললে—আমি ভুলিনি লনা চাচী যে কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলে গেল—তুই মনে ক'রে দেখ—তুই কি ছিলি—কোথাকার পথের কুকুরের—

—না না জন, চাচী তা বলে নি—

—হ্যাঁ ওই কথাগুলো ঠিক এই কথায় বলে নি—কিন্তু তার মানে তাই—

—না জন—না। তুমি রাগ করেছ—

—না—রাগ আমি করি নি। কারণ চাচীর কথাগুলো ঠিক মিথ্যে নয়। ওই বস্তিতে থাকলে আমি যা হতাম স্ট্রীট ডগের তুলনাই তার তুলনা। তবে একটা কথা—মানুষ কুকুর নয়, মানুষ মানুষ। লনা—বারো বছর থেকে এসেছি—আশ্রয় পেয়েছি—ভালবাসা পেয়েছি—শিক্ষা পেয়েছি—সব সত্য ; কিন্তু আমি কি যুদ্ধ করি নি? তুমি জান লনা—তুমি জান। কি যুদ্ধ আমি করেছি সে জীবনকে ভুলতে—। তুমি বল—মিথ্যে বলছি আমি?

—না, মিথ্যে বল নি। লনা শান্ত কণ্ঠে বললে—আমি তার সাক্ষী জন। কত রাত্রে তুমি কেঁদেছ। ফাদার চাচী গোমেশ সব ঘুমিয়েছে—আমার ঘুম পাতলা—তোমার কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে। ক্রাচ না নিয়ে আস্তে আস্তে এসে তোমার আমার ঘরের জানালায় কান পেতেছি। কতদিন শুনেছি তুমি বলছ—ঈশ্বর, আমাকে ভালো ক'রে দাও!

জন এতক্ষণে শান্ত হয়ে লনার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—আমি কি বলেছিলাম, কি চেয়েছিলাম? কি অন্যায় ছিল তার মধ্যে? আমি গান শিখেছি বাজনা শিখেছি—আমি নিজে উপার্জন করব। ফাদারকে হেল্প করব। কতকাল এমন পোষ্য হয়ে থাকব তাঁর। তিনি ইঙ্গিতে আমার বস্তিজীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন—সে পাপ এখনও আমার মধ্যে রয়েছে—আমি এখন স্বাধীনতা পেলে নরকের পথে ছুটব।

—জন! তুমি জান ফাদার তোমাকে কত ভালবাসেন!

—জানি। মানি সে কথা। তিনি আমাকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরে না থাকলে আমি ঝড়ের মুখে বাঁধনকাটা ঘুড়ির মত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় হারিয়ে যেতাম। তিনি না থাকলে ফাঁসীকাঠে ঝুলতাম নয় জেলখানায় পচতাম। তিনি সে দিন—। মনে আছে ভুলি নি! কিন্তু এ যে জেলখানার চেয়েও বেশী। পদে পদে অবিশ্বাস সন্দেহ—জেলখানার থেকে সুখে নিশ্চয় আছি কিন্তু অপমান হয়তো বেশী। আমাকে ক্ষমা ক'রো তুমি, ফাদারকে বলো তিনিও যেন ক্ষমা করেন আমাকে; আমি মুক্তি চাই। আমি চলে যাব। আমি নিজেকে প্রমাণ করব। না পারি—অন্ধকার অন্ধকূপ—সেই আমার নিয়তি।

জনের কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপছিল কিন্তু তার মধ্যে একটা সংকল্পের স্পষ্ট আভাস ছিল। লনা, শান্ত লনা। আবেগে বা ক্ষোভে সে উত্তেজিত কি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না; লনা কাঁদে। জনের কথায় চোখ ফেটে তার জল এল। জন চলে যাবে! জন দুঃখ পেয়েছে! জন চলে গেলে সে কেমন ক'রে কি নিয়ে থাকবে?—সেই তার যখন সাত আট বছর বয়স তখন জন এসেছে এ বাড়িতে। আজ তার আঠারো বছর বয়স, এ পর্যন্ত প্রতিটি দিন তার জনের সঙ্গে জড়ানো। ছেলেবেলা চাচী তাকে বাচ্চির কাছ থেকে আগলে রাখত। বাচ্চি দূর থেকে তাকে দেখত—তার চোখের

দৃষ্টি দেখে লনার ভয় লাগত। তবু বাচ্চি যখন হঠাৎ কোন সময় আনন্দবশে গান গেয়ে উঠত—তার সে গান ভারী ভাল লাগত। ফাদার বাচ্চিকে একটা হারমোনিয়ম বাঁশি কিনে দিয়েছিলেন। কি সুন্দর সুর সে বাজাতো তাতে! লনা তাকে না-ডেকে পারত না। ডাকত—বা-চ্চি—

বাচ্চির কানে সে ডাক গেলে সে খুশী হয়ে তার দিকে ফিরে তাকাতো; ভুরু নাচিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি ক'রে বলত—বোলাতি মুঝে? সঙ্গে সঙ্গে কৃতার্থতার হাসিতে তার মুখ ভরে উঠত। বাচ্চি তার খেলনা চুরি করত, মধ্যে মধ্যে কুৎসিত কথা বলত, তবু তার বাচ্চিকে ভাল লাগত। আবার পাশের বাড়ির ছাদের উপরের টবের বাগান থেকে বিচিত্র কৌশলে আঁকশি দিয়ে ফুল ছিঁড়ে তাকে দিত।

সেই জন চলে যাবে! অন্ধকারের মধ্যে তার চোখের জল ঝরে পড়ল।

জন চমকে উঠল। লনার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে উঠে আলোর সুইচটা টেনে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি কাঁদছ লনা! তুমি কাঁদছ? তার হাতখানা আবার সে টেনে নিলে।

লনা চোখের জল মুছতে চেষ্টা করলে না। মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে চোখের জলের লজ্জা গোপন করতে চাইলে। কোন উত্তর দিলে না। জন মৃদুস্বরে ডাকলে—লনা। জনের কান দুটো গরম হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। হাতের উত্তাপও বেড়ে গেল। সমস্ত দেহে চকিতে বিদ্যুতের মত কি একটা খেলে গেল। চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। প্রবল আবেগে লনাকে সবলে আকর্ষণ ক'রে নিজের বুকের উপর টেনে নেবার দুর্নিবার বাসনা একটা বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়ল বুকের ভিতর। হৃদপিণ্ড তার লাফাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সে জন আর এক জন হয়ে গেল।

লনাও চমকে উঠল, সাপের স্পর্শে বা আগুনের স্পর্শে যেমন চমকে উঠে মানুষ দু'হাত সরে যায় তেমনিভাবে চমকে উঠে হাতটা

টেনে নিলে। সরে গেল একটু। বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টিতে সে তাকালে জনের দিকে। বিচিত্র সে দৃষ্টি! তিরস্কারে ভরা কিন্তু তবু বিষণ্ণ। উগ্র নয় তবু অসহনীয়। জন চোখ নামালে। চোখ নামিয়েই বললে—আমি তোমায় ভালবাসি লনা!

লনা মৃদুস্বরে বললে—আমি রুগ্ন—আমার একটা পা অক্ষম, অন্তরে অন্তরে আমি দুর্বল—আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নই জন। আমাকে তুমি করুণা ক'রো।

—লনা—

—না, জন—তোমার হাত আগুনের মত গরম—সে হাত হঠাৎ আরও যেন গরম হয়ে ওঠে—আমি বুঝতে পারি তোমার অন্তরের কথা। আমার হাত যেন পুড়ে যায়। তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পাই। না—না জন, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। করুণার পাত্রী আমি। জন্মরুগ্ন। ছাড়, পথ ছাড়।

জন সরে দাঁড়াল। লনা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। খোলা ছাদের উপর বেরিয়ে এসে সে ঘুরে দাঁড়াল—প্রসন্ন সহানুভূতিভরা কণ্ঠস্বরে বললে—জন!

জন উত্তর দিলে না। লনা বললে—রাগ করো না আমার উপর, আমি দয়ার পাত্রী, করুণার পাত্রী। ফাদারের ইচ্ছা তুমিও জান, আমিও জানি। আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ তিনি চান। কিন্তু আমি রুগ্ন। আমি ভীরু। সে হয় না।

—তুমি আমাকে ক্ষমা কর লনা।

—না—না, ক্ষমার কথা নয়। ক্ষমার পাত্রী আমি। পুরুষ আর নারী—সৃষ্টির নিয়মে— চুপ ক'রে গেল লনা। হয়তো মুখে বলতে লজ্জিত হ'ল সে, অথবা কথা খুঁজে পেলে না। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে—কি জানি কেন যে তোমাকে আমার এত ভাল লাগে! সেই তোমাকে আমার ভয় হয় যখন তুমি এই দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাও।

—You hate me Lanna—আমাকে তুমি ঘৃণা কর—আমি জানি

—জন! লনার কণ্ঠস্বরে কান্নার আবেগ সঞ্চারিত হ'ল একমুহূর্তে।

জন গ্রাহ্য করলে না। বললে—আমি জানি, তুমি ভুলতে পার না আমি বস্তির পরিচয়হীন ভিক্ষুকের ছেলে। ভুলতে পার না আমার সেকালের কথা। চাচী মুখে বলে কটু স্পষ্ট সাদা কথায়। ফাদার সারমন্ ঝাড়েন। ভাল ভাল কথায় উপদেশের নামে যখন বলেন—জন, পৃথিবীতে মানুষের দুর্ভাগ্যে আর তারই ভ্রান্তিতে শয়তান মনের গভীর অন্ধকারের মধ্যে স্থান ক'রে নিয়েছে। ঈশ্বরের যা কিছু প্রিয় তাকে ধ্বংস করাই তার কাজ। দিন রাত্রি পৃথিবীময় অশান্ত প্রেতাত্মার মত সে ঘুরে বেড়ায়। মানুষের আত্মাকে সে লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে যায় তার অন্ধকার রাজ্যে—তারপর পাপের মন্ত্রে তাকে ঘুম পাড়ায়। আর সেই সুযোগে কবরের অন্ধকারে ভরা এক গহ্বরে তাকে বন্দী করে—পাথর চাপা দিয়ে বন্দী করে। মানুষের সমাজে বস্তিতে—দারিদ্র্য অভাব অশিক্ষার রাজ্যে তার এই আত্মার কবরখানা—এই তার রাজ্য—আর এক রাজ্য সম্পদের যেখানে ছড়াছড়ি—বিলাস ভোগ যেখানে প্রাচুর্য ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায় সেইখানে। মানুষের আত্মা আলোর তৃষ্ণায় কাঁদে। শয়তান বিষাক্ত খাদ্যে পানীয়ে আবার ঘুম পাড়ায়। এক ঈশ্বরের করুণায় এ পাথর ফাটে। এ করুণা যখন মানুষের কাতর প্রার্থনায় নামে তখন একদিকে পাথর ফাটে, অন্যদিকে মানুষের আত্মা ভিতর থেকে প্রাণপণে বুক দিয়ে ঠেলে তাকে ফাটায়। সামান্য ফাটল দিয়ে আসা আলোর রেখা দেখে যে আলো পেয়েছি, মুক্তি হয়েছে ভেবে বুক দিয়ে যেই ঠেলা বন্ধ করে সে আবার চাপা পড়ে। শয়তান অস্থির, শয়তান উগ্র, শয়তান ক্রুদ্ধ, শয়তান প্রমত্ত—তার ছলনার শেষ নেই। বারো বছর

শয়তান তোমায় বস্তিজীবনে বিষ খাইয়েছে—অন্ততঃ বারো বছর সে বিষ মন থেকে নিঃশেষ করবার চিকিৎসার মত তপস্যা কর। তোমার সে বিষ শেষ হয় নি জন!

একনিশ্বাসে এতগুলি কথা চাপা ক্ষোভ এবং আবেগের সঙ্গে বলে বয়সে যুবক জনও হাঁপিয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি তার অন্তরের ক্ষোভে ঝকঝক করছে, মুখের পেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠে মায়ামমতা শ্রদ্ধা প্রীতি-শূন্যতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্নিগ্ধ বিষণ্ণ লনা শঙ্কিত এবং আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

—আমি বস্তির ছেলে। বস্তির বিষ আমার সর্বাঙ্গে। বলে উঠল জন। আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে বললে—নিজে তুমি বলেছ লনা আমার যুদ্ধের কথা তুমি স্বীকার কর। বল নি?

—বলেছি জন।

—তবে? কেন—কেন আমার ওপর সন্দেহ? কেন আমাকে বন্দী ক'রে রাখবেন উনি?

লনা মৃদুস্বরে বললে—তোমার যুদ্ধ সত্য জন। সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। সে যেমন সত্য ফাদারের দৃষ্টি হয়তো তেমনি সত্য জন।

—লনা!

লনা বললে—রোগী রোগের অবশেষ অনেক সময় বুঝতে পারে না—চিকিৎসক পারেন জন।

জন নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বলে উঠল—হ্যাঁ, তুমিও পার—আমার স্পর্শে তুমি চমকে ওঠ। আমার হাতের উত্তাপের মধ্যে নরকের জ্বালায় পীড়িত হও।

—আমি তোমার কৃপার পাত্রী জন। আমার উপর তুমি অবিচার করো না। জন, একটা কথা বলব?

—বল।

—রাগ করবে না?

—না। রাগ করব না বল।

—I love you John. তুমি বিশ্বাস করবে না আমি জানি।

—না। বিশ্বাস করব না। It is not love লনা—ওটা নিছক মমতা। তোমার পায়রাগুলিকে যেমন ভালবাস—ওই পা-কাটা খোঁড়া কুকুরটাকে মমতা কর—তাই। Pity—it is pity—it is not love.

হাসল লনা। বিষণ্ণতা স্নেহ মাধুর্য-মাখানো সে হাসি আশ্চর্য হাসি। হেসে বললে—জানি না। কিন্তু জন, রাত্রেও আমি তোমার কথা ভাবি। যে দিন তোমাকে অস্থির দেখি, অধীর দেখি, সে দিন ঘুম হয় না আমার। জেগে কান পেতে থাকি। তোমার সামান্য সাড়া পেলে এই খোঁড়া পায়ে আস্তে আস্তে জানালার ধারে দাঁড়াই। তোমাকে বলেছি—তুমি কেঁদেছ, ঈশ্বরকে ডেকেছ সে আমি শুনেছি।

—হ্যাঁ, অনেক রাত্রে আমি ডাকি। কাঁদি, প্রার্থনা করি—

—হ্যাঁ। কিন্তু আরও শুনেছি জন, জানালার কাঠের ফাঁক দিয়ে দেখেছি জন, কত রাত্রে তুমি ক্যালেণ্ডারের বিলাসিনী সুন্দরী মেয়েদের ছবির উপর টর্চের আলো জ্বেলে কি আগ্রহের সঙ্গে দেখছ আর ফিসফিস ক'রে ছবিকে ডাকছ—রোশনি। রোশনি। পিয়ারী। My love—my darling—

জন বিবর্ণ হয়ে গেল—সুন্দর জন যেন শিখা নিভে-যাওয়া তৈলাক্ত সলতের কালিপড়া-মুখ প্রদীপের মত হয়ে গেল। মুখে তার উত্তর যোগাল না। লনা আর দাঁড়াল না, ক্রাচের উপর ভর দিয়ে বারান্দা ধরে ওদিকে চলে গেল নিজের ঘরে। ঘরে গিয়ে বিছানায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মনের মধ্যে তার যত বেদনা তত উদ্বেগ। হয়তো বলাটা ভাল হয় নি। অন্ততঃ আজ এই সময়ে বলা ভাল হয় নি। জন। জনকে সে ভালবাসে। তার রূপ

ভালবাসে, তার গান ভালবাসে। তার দেহকে ভালবাসে, তার আত্মাকে ভালবাসে। সে যদি চলে যায়!

তার চোখ থেকে আবার জল ঝরে পড়ল তার কোলের উপর।

* * * *

কয়েকটা মুহূর্ত মিলিয়ে হয়তো আধমিনিট; আধমিনিটের জন্য জন অসাড় পঙ্গু বোবা হয়ে গিয়েছিল। তার বুকের ভিতরটায় যেন নিষ্ঠুর প্রহারে হৃদপিণ্ড হাতুড়ি পিটে গেল। হাত পায়ের উষ্ণতা যেন দ্রুত নীচে নেমে এল—আঙুলের ডগাগুলিতে যেন শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ বুলিয়ে দিল এই আধ মিনিটে। আধ মিনিট পরেই সে সংবিৎ ফিরে পেল, বিবর্ণ মুখের চেহারা পালটাতে লাগল, হাতের আঙুলের ডগায় আবার উত্তাপ ফিরে এল। ক্রোধ ক্ষোভ আক্রোশ কোন একটার বা সব কয়টার চকিত সঞ্চারে সে ক্ষিপ্রবেগে উঠে দাঁড়াল। এবং সর্বাগ্রে আলোটাকে নিভিয়ে দিলে। আলো যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার পক্ষে। এই আধ মিনিট যদি আলো না থাকত তবে সম্ভবতঃ তার অভিভূত ভাবটা এত তীব্র হ'ত না। অন্ধকারে সে যেন সাহস পেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠল—রোশনি! রোশনি!

ইচ্ছে হ'ল রোশনি রোশনি বলে চীৎকার ক'রে ওঠে। বিশ্ব-জগৎকে শুনিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে।

হ্যাঁ, সে রোশনিকে ডাকে। যে কোন যুবতী লাস্যকটাক্ষময়ী মেয়েকে দেখলে তার রোশনিকে মনে পড়ে, রোশনি বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। ছবিকেও সে ডাকে রোশনি বলে। লনা,—মূর্তিমতী বিষণ্ণতার মত লনা—বাতিকগ্রস্ত ধার্মিক ফাদারের ধর্ম এবং প্রীতির বন্ধনে বাঁধা বিহ্বলা ক্রীতদাসীর মত লনা—তুমি রোশনিকে জান না। তার বুকে আগুন, চোখে আগুন, সর্বদেহে তার আগুনের উত্তাপ—তেমনি দীপ্তিময় আকর্ষণ। তাকে কি ক'রে ভুলবে বাচ্চি! জন হয়েও বাচ্চি রোশনিকে ভুলতে পারে না। হ্যাঁ—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—পারে নি। পারে নি। পারে নি। সে মনে আছে, সে স্বপ্নে দেখা দেয়—সে সারা কল্পনাটা জুড়েই আছে বোধ হয়। সেই তার ভাল। রোশনি। তাকেও ভোলা যায়! শ্যামবর্ণ রঙ—কি প্রচুর চুল, ছোট কপাল—ধারালো নাক—চোখ দুটি আশ্চর্য টানা লম্বা, ক্ষয়া চেহারা—রোশনির সর্বাঙ্গে ধার। প্রতিটি গঠনভঙ্গি শাণিত ধারালো।

অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মনে চেয়ারে বসে জন রোশনিকে দেখতে চাইল দশ বছর আগের অতীতকালের সেই পটভূমিতে। নানীর সঙ্গে চুড়ি বিক্রির পালা শেষ ক'রে বস্তিতে ফিরত চুড়ির ঝুড়ি মাথায়। বস্তির মুখে ফিরতি পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে রোশনি ভেসে উঠত। কাদামাখা কাপড়ের মত ময়লা একটা ছিটের ঘাগরা আর একটা ছেঁড়া ব্লাউস, কপাল ঝেঁপে পড়ে আছে রুখু তেল-না-দেওয়া ঝাঁকড়া চুল—তার নীচেই দুটি দীর্ঘ চোখ, তাতে কি চঞ্চল চাউনি! ফিরে গিয়েই রোশনিকে নিয়ে পল্টনোয়ার জলসা শুরু হো যায়েগা! মধ্যে মধ্যে রোশনির ভাবনায় এমন মন হারিয়ে ফেলত যে, পথের পাথর-ইঁট-কাঠ চোখে পড়েও পড়ত না, সে হুঁচোট খেত। কলকাতার রাস্তা, নানী বার বার হুঁশিয়ার করত—গাল দিত—এরে কুত্তার বাচ্চা কুত্তা—এরে হারামজাদা, দো-দোনো চোখ তোকে কি জন্যে দিয়েছে রে ভগবান খোদাতয়লা? মিলিটারী লরি আওত হ্যায়—আঁখে দেখছিস্ না, কানে শুনছিস্ না উসকা আবাজ! গর্জন দেতা হ্যায় রে! তু মরেগা মর্ যা, হামার ঝুড়ি-চুড়ি সব যায়েগা রে শূয়ার কি বাচ্চা! খাড়া হো যা!

তখন যুদ্ধের কাল। সন্ধ্যে হ'তে হ'তে সে এক আতঙ্কের রাজত্ব। আলোতে সব ঠুঙি পরানো। সে এক বিশ্রী আবছায়ার রাজ্য। তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য নানী বেলা থাকতেই ফিরত।

বাচ্চি কখনও নানীর কথা শুনে দাঁড়াত। লরীটা গোঁ গোঁ গর্জনে কানে তালা ধরিয়ে চাকার দাপে পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে পেরিয়ে যাওয়া মাত্র ঝুড়ি নিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হয়ে এপারে আসত। কখনও বা নানী বারণ করতে করতে ছুটে এপারে এসে দাঁড়াত। নানী তার থলথলে দেহ নিয়ে এপারে আসত বুড়ী হাতীর মত বা কোলাব্যাঙের মত থপ থপ ক'রে কোন রকমে।

বস্তির মুখ থেকে বুকের ভিতরটা লাফাতে শুরু করত। কিন্তু এখানে ছিল নানীর অনেক বাধা—ছোট ছেলের দল ড্রেন থেকে মরা ব্যাঙ দড়িতে বেঁধে সামনে দোলাতো। ব্যাঙকে নানীর যত ঘৃণা তত ভয়। নানী লাফাত—কুৎসিত ভাষায় গাল দিত। একটু এগিয়ে এলেই এপাশে বিড়ি তৈরীর আড়ং থেকে ছোকরারা আরম্ভ করত—এ নানী ক্যা ভৈইলো গো ?

নানী ভেঙিয়ে বলত—তেরা নানাকে মাথা ভৈইলো গো। ক্যা ভৈইলো গো।

ছোকরারা হেসে বলত—মেরা নানাকে মাথা—উ তো তু খা লেইলি গো।

নানী ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যেত—ক্যা ? তেরা নানাকে মাথা হম খাইলি রে হারামী ? হম তেরা নানাকে বহু ? উসকো হম ঝাড়ু মারকে ভাগা দিয়া। উয়ো নচ্ছার এক ছোকরীকে লেকে ভাগা। উ তেরা নানাকে মাথা খা লিহিস রে হারামী।

সকলে মিলে এবার গান শুরু ক'রে দিত—

জানি গো জানি জানি
নানাকে বহু তু নানী—

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে সমস্বরে ডাক শুরু হ'ত—নানী। নানী। নানী। নানী।

নানী চীৎকার ক'রে গালাগালি দিত—মর যা—মর মা—মর যা তু লোক, মর যা রে মর যা।

ওদিকে খানিকটা দূরে নির্দিষ্ট একটা গলির মুখে দেখা যেত পল্টনোয়ার দলকে। রঙীন লুঙ্গি রঙীন গেঞ্জি কিংবা যুদ্ধের নয়া আমদানী বুশশার্ট পরা তাদের দল বেরিয়ে এসে হি-হি ক'রে হাসত আর তাকে ইশারা করত—জলদি আ যা বাচ্চি!

দবীর মারত সিটি। তার সিটির জোর ছিল খুব। বাচ্চি নানীকে ফেলে রেখে ঝুড়িটা মাথায় ক'রে ছুটত গলি গলি; নানীর বাড়ির দরজায় এসে ঝুড়িটা নামিয়ে অধীরভাবে নানীর জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। কখন আসবে বুড়ী ভঁইসী!

গুণ্ডা ঝবরু বোক্‌রা নানীকে আড়ালে বলত বুড়ী ভঁইসী। যাদ্দু বুড়ো তখন রঙ বেচা শেষ ক'রে এসে দরজার চৌকাঠে বসে গাঁজা টিপত। কোন দিন গাঁজা টানা শেষ ক'রে গান গাইত—ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়িয়ে গেলো আর এলো না। কোন দিন কেশে সারা হ'ত, হাঁপাত। জরিবেচনেওয়ালী সুরতিয়া স্নান সেরে লম্বা চুল পিঠে মেলে দিয়ে রান্না করত। আর বীভৎস মাতাল মেয়েটা তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো। বাচ্চী নানীকে গাল দিত তার দেরির জন্য। নানী এলেই সে বলত—খেতে দে নানী, বড় ভুখ লেগেছে।

নানী কোন দিন দিত, কোন দিন দিত না। দিত না মানে সঙ্গে সঙ্গে দিত ন। কিন্তু তর সইত না বাচ্চির; কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই খেয়ে বা না-খেয়ে সে ছুটে পালাত। সুরতিয়া জরিওয়ালী চাচী বলত—এ মৌসি, বন্দুকের গোলির মত বনবন কর্‌কে ছুটা তেরি বাচ্চি। নানী গাল দিত—বলত—আরে কুত্তিকে বাচ্চে—শূয়ারকি বেটা—হারামী কাহাকা—ওকে এইবার বেচব—জরুর বেচব।

কতদিন বাচ্চি দৌড়ে বের হয়েও ওই অশথগাছটার আড়ালে

দাঁড়িয়ে এ সব গালাগাল শুনেছে। ছুটে বেরিয়ে সে এসে পৌঁছুত পণ্টনের সেই আস্তানায়। খানিকটা খোলা উঠোন একটা ভাঙা মাঠকোঠা। চারিপাশ বস্তির বাড়ির পিছন দিয়ে ঘেরা। হাইকোর্টে মামলা চলছিল বাড়িটা নিয়ে। আদালত থেকে চারিদিকে তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা ছিল। পণ্টন তার আস্তানা পেতেছিল সেইখানে। সারাদিনের পর সন্ধ্যার মুখে জমত তাদের আড্ডা ঘণ্টাখানেকের জন্য। তারপর পণ্টন আবার বের হ'ত তার দাদার ফিটনে। তারা নেশা করত, গান করত, নাচত, অশ্লীল গল্প করত। বাচ্চি তাদের থেকে চার পাঁচ বছরের ছোট, তবু তাকে ডাকত তারা তার গানের জন্য। একটা ছেঁড়া ঘাগরা ছিল, ব্লাউস ছিল—সেই পরে বাচ্চি নাচত এবং গাইত।

তারপর জুটল একদিন রোশনি।

খোঁজ মিলেছিল একদিন ফিরিঙ্গী আর কৃশ্চান পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে। মধ্যে মধ্যে এ মারপিট হ'ত। ফিরিঙ্গী কৃশ্চানরা তাদের ঘৃণা করত।

জন অন্ধকারের মধ্যে স্থির হয়ে বসে ছিল—অন্ধকারের মধ্যে নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে সে অতীত দিনের সেই সব ঘটনাগুলো যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছিল। অকস্মাৎ এই মুহূর্তে সে অস্থির না-হোক চঞ্চল হয়ে নড়েচড়ে বসল।

সে যেন বাচ্চি হয়ে গেছে।

কৃশ্চান পাড়ার সেই ছেলেগুলি—সেগুলি বাচ্চি পণ্টনের চেয়ে ভালো ছিল না, তারা ফাদারদের মতও ছিল না; তবু তারা বাচ্চিদের বলত ব্ল্যাকি নেটিভ! অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের তো কথাই নেই। আজকে বাচ্চি জন হয়েও বুঝতে পারে সে ঘৃণা কি নিষ্ঠুর, কি গভীর। আজও—আজও তারা সেই অপরাধে বিশ্বাস করে না।

সে দিন বাজারে পকেট মেরেছিল গণপৎ। একটা মনিব্যাগ

তুলে নিয়েছিল কার পকেট থেকে। পেয়েছিল সাড়ে চার টাকা। সেই পয়সায় সিনেমা দেখতে গিয়ে ঝগড়া বেধেছিল কৃশ্চানদের ছেলেদের সঙ্গে। ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট পরা, গায়ে ময়লা হাফশার্ট নয়তো ফুটবল জার্সির মত গেঞ্জি, পায়ে ছেঁড়া সু—এই তাদের পোশাক, কারও কারও মাথায় একটা নাইটক্যাপ।

বাচ্চিকে নিয়ে যেত পল্টনেরা সিনেমার গান শেখাতে। বাচ্চি শুনবামাত্র শিখে নিতে পারত। সেই গান গেয়ে নাচত আসরে। চার আনার সিটে বসে ওরাও সিটি মারছিল—নায়িকাকে দেখে অশ্লীল কথা বলছিল—এরাও বলছিল। ওদের কথায় ইংরিজী মিশেল—এদের কথায় বাংলা হিন্দীর খিচুড়ি। কিন্তু দবীরের শিসের জোরের কাছে ওরা হেরে যাচ্ছিল।

একসময় ওদের একজন বলেছিল—ইউ ব্ল্যাকি শাট আপ! চুপ রহো!

পল্টন সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—আরে হারামী মু সামালকে বাত করো।

এই শুরু। তারপর সিনেমা থেকে বেরিয়ে পথে গালাগালি—তারপর হাতাহাতি।

সন্ধ্যার মুখে সারাটা ধর্মতলা স্ট্রীট জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়ে এ লড়াই এসে পৌঁছেছিল মৌলালির মোড় পর্যন্ত। মৌলালির মোড়ে পল্টন এ ফুট থেকে ও ফুটে ছুটে গিয়ে ওদের মধ্যে তাগড়াটার ঠোঁটে মেরেছিল ঘুঁষি। সে ঘুঁষিতে তার দাঁতই ভাঙে নি, ছেলেটা উলটে পড়ে গিয়েছিল। তারপর সে হয়ে গিয়েছিল উধাও। সিটির সংকেতে তাদেরও পালাবার ইঙ্গিত দিতে কিন্তু সে ভোলে নি। তারা সারকুলার রোড পার হয়ে গলি গলি এসে উঠেছিল পাড়ায়। পল্টন তখনও ফেরে নি।

সে বাড়ি ফিরে মার খেয়েছিল নানীর হাতে। এটা তার প্রায়

নিত্য বরাদ্দ ছিল। আড্ডা থেকে ফিরলেই নানী ধরত তার চুলের মুঠোয়।

—হারামজাদে বেইমান—কুত্তিকে বাচ্চা···

আর পিঠে লাগাত চড় কিল। যাদ্দু ধরা গলায় বলত—এ নানী, মৎ মারো এ—সঙ্গে সঙ্গে উঠত খকখক কাশি।

সুরতিয়া চাচী প্রায় এ সময়টা থাকত না বাড়িতে, সে সেজেগুজে এই সন্ধ্যায় যেত কয়লা আনতে। মোটকী ব্যভিচারিণী মেয়েটার ঘরে কেউ না-থাকলে সে এসে দাঁড়াত বাইরে আর বলত—মার মার শালাকে। বহুৎ আচ্ছাসে মার দে নানীয়া।

ওই কথা সে বললেই নানী তাকে ছেড়ে দিত। বলত—কভি না। কসবী কাঁহাকি। মার—মার। তেরি হুকুম-সে মারেগা হম। কভি না।

তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে একথালা ভাত আর দিনের তরকারি গোস্ত বেড়ে দিয়ে বলত—খা। পেট ভরে খারে কুত্তিকে বাচ্চা। ঝুড়ি বইতে হবে। রাস্তাকে পর বৈঠ যাবি তো ছোড়বে না হমি। হাঁ। খা।

সে দিন সিনেমা দেখে ঝগড়া মারপিট ক'রে ফিরতে রাত্রি হয়েছিল। নানী তখন খেয়ে পেটের ভারে আর আপিংয়ের নেশায় ঘুমুচ্ছে। সেদিন সুরতিয়া চাচী কয়লা নিয়ে তখন ফিরে এসেছে। সুরতিয়া চাচীই সেদিন তাকে দুখানা রুটি দিয়েছিল আর বাইগনের তরকারি। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নানীর দরজার পাশে। গরমের দিন—আরামেই ঘুমিয়েছিল বাইরে।

পরের দিন পল্টন দিয়েছিল রোশনির খবর। মৌলালির পুবে খালের উপর যে পোলটা সেই পোলের তলায় ভিখিরীদের মধ্যে বাস করে ঝাঁকড়াচুলো কংকালসার আফিং গাঁজা মদখোর এই বুড়ো ভিখিরী আর তার সঙ্গে থাকে রোশনি। ক্ষয়া চেহারা কিন্তু

সে চেহারার কি ধার! আর কি গান গায় এই বুড়ো—আর এই মেয়ে।

বাহা—বাহা—বাহা! শালা দিল তো তর্ হো যাতা হ্যায় ভাই!

বাচ্চির মনে ক্ষোভ হয়েছিল। তার থেকেও ভাল গান গায়?

পল্টন বলেছিল, আজ শালা সামকো তু লোগকো লিয়ে যাব। দাদাকো বোলেগা শির দুখাতা। আওর আপিং আওর গাঁজা ভি লিয়ে যাব। বুঢ্‌ঢা শালাকে দিব। গীত শুনায়েঙ্গে তু লোগকে। হাঁ। বাচ্চি জরুর আনা!

খালের ওপারে বেলেঘাটার দিকে পোলের থামটার গোড়ায় তাদের বাসা। ওপারে খালের ধারে সেদিন বসেছিল আসর। পল্টন দবীর বাচ্চিকে ঘাগরা ব্লাউস পরিয়ে মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তামাশা ক'রে। গলায় পুঁতির মালা কিনে পরিয়ে দিয়েছিল। আর বাহারের ওড়না দিয়ে দিয়েছিল তার ছোটচুল মাথাটিকে ঢেকে। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকআউটের রাত্রির যেটুকু আলো তার উপর পড়েছিল তারই প্রতিবিম্ব দেখে বাচ্চির মন খুশিতে ভরে গিয়েছিল।

রোশনিকে দেখে সে খুশী হয়েছিল—রোশনি হয় নি। সে বলেছিল—ই কৌন হ্যায়?

পল্টন বলেছিল—হামারি বিবি হ্যায়—মেরা জানি!

রোশনি হঠাৎ এসে তার বাহারের ওড়নাখানা টেনে খুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল—দামী ওড়না চড়াকে মুঝে ক্যা দেখলানে লায়া তু লোক?

তারপরই তার মাথার ছোট চুল দেখে হেসে উঠেছিল খিলখিল ক'রে—বুড়ো তখন গাঁজা টেপায় ব্যস্ত। রোশনি গান ধরে দিয়েছিল বাচ্চির দিকে আঙুল দেখিয়ে—

কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী—

এ চিড়িয়া বোল্ বোল্ কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী ?

বুড়ো গাঁজা টিপতে টিপতেই আ—বলে সুর ছেড়ে দিয়ে ধরে দিল সঙ্গে সঙ্গে—

গাগরিয়া ভরকে নজরিয়া মারকে—

এ নজরিয়া—আ—আ—আ—, এ···নজরিয়া মারকে—

রোশনিও তার সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটা গেয়ে চলেছিল—এ—নজরিয়া মারকে—। নজরিয়া সে তখনই সেই বয়সেই মারতে শিখেছিল। বুড়ো থেমে গিয়েছিল এইখানেই, বোধ হয় গাঁজা তৈরির জন্যই কিছু করতে হয়েছিল, রোশনি থামে নি—সে গেয়ে চলেছিল—শুধু গান নয়, এবার নাচতেও শুরু করেছিল—

ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুম—ঘুঙরিয়া বাজাকে—

সঙ্গে সঙ্গে সব জমে উঠেছিল। বাচ্চিও ধরে দিয়েছিল—কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী—এ চিড়িয়া বোল বোল—। আরে চিড়িয়া—। চিড়িয়া রে—এ-এ-এ।

বুড়ো ঘুরে বসে বলেছিল—বাহা—বাহা—বাহা। বহুৎ আচ্ছা রে বেটী—!

বিস্ফারিত চোখে সে তার দিকে তাকিয়েছিল।

গান বন্ধ ক'রে রোশনি আবার হাসতে শুরু করেছিল। তারপর তার মুখের কাছে গিয়ে বলেছিল—অন্ধা হ্যায় তু। বেটীয়া কৌন ? আঁ ?

রোশনি। এই রোশনি। ক্ষয়া ধারালো চেহারা, তার চোখের চাউনিতে ধার, তার প্রতিটি অঙ্গের গঠনভঙ্গিতে ছুরির মত ধার ছুরির মত পালিশ।

রোশনি সেই দিনই তাকে বলেছিল—তু বহুৎ আচ্ছা রে বাচ্চি, তু বহুৎ আচ্ছা।

পল্টন রেগে উঠেছিল। সামান্য ছুতো ধরে তাকে মারতে,

উঠেছিল। বাচ্চি বুড়োর সারেঙ্গীর মত বাদ্যযন্ত্রটা তুলে নিয়ে সুর তুলেছিল। শব্দ পাবামাত্র বুড়ো হাঁ হাঁ ক'রে উঠেছিল—কৌন রে কমবক্ত বদমাশ!

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে যন্ত্রটা কেড়ে নিয়ে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে পল্টন বলেছিল—শালা খানকীর বাচ্চা—ই কেয়া কাম!

রোশনি বিচিত্র। দশ এগার বছরের রোশনি কিন্তু জীবনের সব জেনেছিল—অন্ততঃ অন্ধকার রাজ্যে জীবনের সব কথা সব উলঙ্গ সত্য তার এরই মধ্যে জানা হয়ে গিয়েছিল। সে এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পল্টনের হাত ধরে বলেছিল—মান যাও মেরি রাজা। ময় তুমারি হুঁ। উ আচ্ছা হ্যায়, তুম বহুৎ বহুৎ বহুৎ আচ্ছা হ্যায়।

তারপর কটাক্ষ হেনে বলেছিল—তু মেরি রাজা হ্যায়—উ বাঁশুরিয়া হ্যায়।

পল্টন সেই দিনই বুড়োকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল—চলিয়ে উস্তাদ হামারা হুঁয়া। আচ্ছা ঘর দেঙ্গে—হুঁয়া মজেমে রহিয়েগা। ঘরমে রহিয়েগা—বারাণ্ডামে খানা পাকায়েগা। হামারা ঘর। কেরায়া নেহি—কুছ নেহি। কেঁও? আঁ?

বুড়ো তার দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে বসেছিল।

পল্টন আবার প্রশ্ন করেছিল—উস্তাদ!

বুড়ো অকস্মাৎ যেন হিংস্র হয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল—ভাগো শালা মতলববাজ!

—ক্যা? ই ক্যা বাত—

—মারেগা ডাণ্ডা—শালা—! নিকালো—ভাগো!

পালিয়ে এসেছিল সে দিন তারা।

রাত্রে সেদিন নানী ঘুমোয় নি। আপিং খেয়ে ঢুলছিল। প্রচুর প্রহার করেছিল বাচ্চিকে। বাচ্চির ইচ্ছা হয়েছিল সে পালিয়ে

যায় সেই পোলের তলায়। বুড়ো ওস্তাদকে বলে—তুমারা পাশ রহেঙ্গে হম। কিন্তু তা পারে নি। ঘুমিয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের মধ্যে। রোশনিকে স্বপ্ন দেখেছিল।

রোশনি। সেই বস্তি।

দারুণ ক্ষোভের মধ্যে জনের মনে হয় সেই বস্তিতেই হয়তো সে এর থেকে অনেক সুখে ছিল। পরক্ষণেই সে শিউরে ওঠে। না—না—না। রোশনির পাশে দাঁড়িয়ে পল্টন তার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার গা থেকে তাড়ির গন্ধ বের হচ্ছে।

আলোটা জ্বেলে দেয় উঠে। না—না—না। আয়নার মধ্যে সুন্দর স্যুট পরা সুন্দর জনের ছবিটা তার দিকে তাকিয়ে বললে—না—না—না।

॥ চার ॥

আলোর শুভ্র দীপ্তিতে ভরে উঠেছে ঘরখানা। কল্পনায় রোশনিকে দেখতে গিয়েছিল, রোশনির পিছনে আপনা-আপনি সে দিনের বাস্তব স্মৃতি থেকে পল্টনও রোশনির পিছনে হিংস্র মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠেছিল অন্ধকার পটভূমিতে। কল্পনার মধ্যেই সে পল্টনের গায়ের তাড়ির গন্ধ পেয়েছিল। ভয়ে তার অন্তরাত্মা বলে উঠল—না—না—না। বস্তি নয়। বস্তিতে সে আর যেতে পারবে না। সেখানে রোশনির উন্মত্ত উল্লাস—তার উষ্ণ দেহের উত্তাপই শুধু নেই রোশনির পিছনে অন্ধকারের মধ্যে পল্টন—হিংস্র নিষ্ঠুর পল্টন ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ওই তাড়ির গন্ধ ওই আবর্জনাময় পারিপার্শ্বিক—পঙ্কিল নর্দমা, মরা ব্যাঙ, পচা ইঁদুর—ছেঁড়া ময়লা লুঙ্গি সহ্য করা জনের পক্ষে অসম্ভব। তাড়াতাড়ি সে আলোটা জ্বেলে দিয়েছিল। আলোয় ঘরটা ভরে উঠতেই সামনের আয়নার মধ্যে নিজের সুন্দর সুবেশ

প্রতিবিম্ব—সেও শঙ্কাতুর এবং চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে—না—না—না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আর ফিরে যাওয়া যায় না।

ফাদার আজ দশ বছর ধরে তাকে পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছন্দ জীবনে অভ্যস্ত ক'রে ওখান থেকে অনেক—অনেক দূরে এনে ফেলেছেন।

লনা! সে বুঝতে পারছে লনা পাশের ঘরে জেগে রয়েছে, সে উঠল—আলো জ্বাললে—দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—সব সে লক্ষ্য করছে। একটা আশ্চর্য আকর্ষণ তারো আছে। কঠিন বন্ধন—ছুর্নিবার আকর্ষণ। কিন্তু কাছে গেলে কেন সে এমন নিরুত্তাপ—কেন এমন আবেগহীন মৃতু—কেন এত শান্ত—কেন এমন ভীরু, কামনাশূন্য। তার কাছে গেলে সব যেন জুড়িয়ে যায়!

হে ঈশ্বর!

আঃ! বিরক্তিভরে জন বলে উঠল—আঃ! এই এক আশ্চর্য শব্দ; হ্যাঁ, শুধু শব্দ; মনগড়া অস্তিত্ব—ঈশ্বর তার নাম। আজ দশ বৎসর ধরে জপিয়ে জপিয়ে আশ্চর্যভাবে তার মনে ওটাকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। ক্রাইস্টের ক্রুসিফিকেশনে ঈশ্বরকে মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে। ভয়ে দুঃখে উল্লাসে ছুঃসাহসে সে মনের ভিতর থেকে ওই শব্দের তুলিতে আঁকা একটা চেহারা ধরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়।

আঃ! আঃ! দূর! আত্মবিস্মৃতের মত সে বলে উঠল। দূর ক'রে দিতে চাচ্ছে সে ঈশ্বর শব্দটাকে—মিথ্যা কল্পনাটাকে! ক্ষোভ আবার বাষ্পের মত উঠছে অন্তরের একটা ফাটল থেকে—তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। ঘরের আলোকিত স্পষ্টতাও যেন কুয়াশাচ্ছন্ন কি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। মুখ থেকে ওই ক্ষোভে বেরিয়ে গেল আর একটা শব্দ—ঝুট! শালা—সব ঝুট!

ওই যে পল্টনের আড্ডা মামলার বাড়ি—ওই বাড়ির এলাকার মধ্যে ছিল একটা অশথগাছ। বস্তির লোকে বলত ওই গাছটায়

ভূত আছে। দানো আছে। বাড়িটায় পর পর তিনটে লোক ভয় দেখে মরেছিল। শুধু মামলার জন্যে নয় ওই কারণেও ওই ভয়েও লোকে কেউ গিয়ে গোপন দখল করে নি।

পল্টন বলত—ভূত তো হামার পুত হ্যায়। শালা মারো ডাণ্ডা ভূতকো। শালা ঝুট—বিলকুল ঝুট হ্যায়। বলত হি-হি ক'রে হাসত। দবীর গণপৎ সবাই হাসত। রামেশ্বরোয়াও হাসত কিন্তু গোপনে প্রণাম করত। বাচ্চিরও প্রথম প্রথম ভয় হ'ত। সন্ধ্যার আগে সে যখন যেত তখন রাজ্যের কাক আর শালিক পাখী দিনের চরাট শেষ ক'রে দলে দলে ডালে ডালে বসত। কাকগুলোকে দেখা যেত, তারা উপরের শক্ত ডালগুলিতে বসত, আর শালিক পাখী-গুলোকে দেখা যেত না—তাদের কলহ কলরব শোনা যেত। সে কি মারাত্মক কলহ কিচকিচি! অপরাহ্নের যেটুকু আলো তখনও থাকত সেই আলোতে ভূতের কোন ছায়া কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটু-খানিও দেখা যায় কিনা সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখত বাচ্চি। পল্টন একদিন তাকে বলেছিল—কি বে শালা কি দেখছুস? আঁ? ভূত। দূরো উল্লু কাঁহাকা—ভূত রহতা তো পাখীলোক ডরকে মারে ভাগতা নেহি? তুদের থেকে পংখীলোকের মগজ আছে, সাহস ভি আছে!

ওই কথাটায় বাচ্চির ভয় চলে গিয়েছিল। তাই তো! ভূত থাকল তো পাখীরা দেখে না কেন? ভূত পাখীদের তাড়ায় না কেন? ওদের ধরে ধরে কচকচ ক'রে চিবিয়ে খায় না কেন?

পল্টন আরও বলেছিল—মানুষ সব জানোয়ার পংখী সে উল্লু আছে শালা!

রোজ সে গাছটার গায়ে থু-থু ক'রে থুতু ফেলত।

রাবিশ! ননসেন্স! বলতে বলতে জন বেরিয়ে এল সামনের ছাদে। রাত্রি হয়তো এগারোটা পার হয়ে গেছে। তাদের পাড়াটা

স্তব্ধ হয়ে এসেছে। এলিয়ট রোডে ট্রামের শব্দ উঠছে না। মোটরের শব্দও কদাচিৎ। কচিৎ কোন মাতালের স্খলিত চীৎকার শোনা যাচ্ছে। ওই দিকটায় নীচু অবস্থার দেশী কৃশ্চানদের বাস। যাদের ছেলেদের সঙ্গে পল্টনদের ছেলেবেলার তফাত সামান্ত। বড় হ'লে তফাত খানিকটা হয়। ওরা কাজ শেখে নানান ধরনের। নাম ওদের ইংরিজী—অশুদ্ধ ইংরিজীতে কথা বলে—তার সঙ্গে হিন্দী। ওরা মদ খায়, মারামারি করে, ওদের জীবনে দুর্দান্তপনার আশ্চর্য উল্লাস। ওদের আনন্দের স্রোতে বড় বড় ঢেউ ওঠে—প্রবল স্রোতের টান আছে ; গা ভাসাতে জানলে চিন্তা নেই—টেনে নিয়ে যাবে যতদিন তুমি না শেষ হয়ে যাও ; তারপর হয়তো কিনারায় লাগিয়ে দেবে। তা দিক।

পুরুষটাই একা নয়—একটা মেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রমত্ত জিহ্বায় পালটা গালাগাল দিচ্ছে। একটা কুকুর চীৎকার করছে।

মোটরের হর্ন বেজে উঠল! আবার! আবার!

বাজাতে বাজাতে চলেছে মোটরটা—গতি কিন্তু মন্থর। হয়তো কোন মাতাল পড়েছে সামনে। গাড়িটার হর্নে বিরক্ত হয়ে মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে এবং হাত নেড়ে আইন দেখিয়ে বলছে—যেতে পার মোটরে চেপে কিন্তু মানুষকে চাপা দিয়ে যাবার আইন নেই। রাস্তা সকলের। আমি দাঁড়ালাম। দেখি যাও চাপা দিয়ে।

না। তা হয়তো নয়। হয়তো হোটেল-ফেরত গাড়ির মালিক কেউ অন্য স্থানে ব্যর্থমনোরথ হয়ে এ পাড়ায় কালো মেমসাহেবের ঝোঁকে এসে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে আর থেমে থেমে হর্ন দিচ্ছে। কথা আছে হর্নের শব্দের মধ্যে। হর্নটা বলছে না—সরে যাও, সরে যাও, হট যাও। বলছে—হনি—জাগো। ডার্লিং—মাই লাভ, মাই সুইটি—এস গো এস। বাঁশি বাঁশির সংকেতের মত সংকেত দিচ্ছে।

হয়তো এ পাড়ার ওই ওদের ঘরের যে সব মেয়েরা হোটেলে যেতে সাহস করে না—পাড়ার অলিতেগলিতে ঘোরে—ফুটপাথে অন্তমনস্কের মত দাঁড়িয়ে থাকে তারা অলিগলির ভিতর সংকেতে চকিত হয়ে দ্রুতপায়ে সদর রাস্তার দিকে এগুচ্ছে। কেউ ঘরে থাকলে চমকে দাঁড়িয়ে উঠে কান পেতে শুনে নিয়ে সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরুচ্ছে বা বেরুবার আগে দেখে নিচ্ছে পাড়ার গুণ্ডা ছেলেরা কেউ দেখছে কিনা। অথবা কোন কনস্টেবল কোথাও আছে কিনা।

ফাদার তাকে এই দশ বৎসর প্রায় ঘরে বন্দী ক'রে রেখেছেন। তার সঙ্গী সাথী নেই। হ'তে দেন নি। গান নিজে শিখিয়েছেন—লেখাপড়া ভাল সে জানে না, বই পড়তে তার ভাল লাগে না—তবু ওই সব লোকেদের তুলনায় সে শিক্ষিত, সে লেখাপড়াও ফাদার শিখিয়েছেন। আজ বছর তিনেক তাকে গানের আসরে যেতে দিয়েছেন—এখন দেশে সংস্কৃতি সম্মেলন হয়; বাঙালী কৃশ্চানদের ভৌমিক রবীন্দ্র সংগীতে নাম করেছেন; আরও ক'জন আছেন; তাঁরা তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন—ফাদার যেতে দিয়েছেন। এরই মধ্যে সে ভৌমিকদের অগোচরে হু'চারজন মনের মত বন্ধু পেয়েছে বই কি। তাদের কাছে সে তুনিয়ার অন্তরের গুপ্তকথা জেনেছে শুনেছে। আর ঘরে বন্দী ক'রে রাখলেই কি তুনিয়ার খবর অজানা থাকে? ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আলসেতে ভর দিয়ে পাড়ার কত খবর সে পেয়েছে। তার ঘরে জানালা দিয়ে দেখেছে। নিন্দা ক'রে চাচী গোমেশ কত খবর এনেছে যার মধ্যে পৃথিবীর বাস্তব সত্যকে সে জেনেছে। অন্ধকারের বিচিত্র কথা—তার মধ্যে আশ্চর্য আকর্ষণ। দেহের রক্তধারা চঞ্চল হয়ে বাতাস-বওয়া তুপুরে পুকুরের জলের মত সূর্যের ছটা তুলে নাচে, আবার কখনও কখনও জোয়ারের গঙ্গার স্রোতের মত ঢেউ উঠিয়ে উলটোমুখে ছোটে। ঘর-দোর, স্বাচ্ছন্দ্য, লনা, ফাদার সব ডুবিয়ে মুছে দিতে চায়।

মোটরের গর্জন উঠল। সম্ভবতঃ থেমেছিল। আবার হর্ন

বাজল জোরে একটানা।—হ—ট্ যা—ও। গর্জনটা মৃদু হয়ে দ্রুত চলে গেল। গাড়িটা থেমেছিল। ঈষৎ নীলাভ গাউন বা ফ্রক পরা ববছাঁটা একটি তরুণী বেরিয়ে এসেছিল গলির মুখে। গাড়িটা থেমে দরজা খুলে দিয়েছিল। তারপরই সে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস বাড়িয়ে গর্জন তুলে গীয়ার পালটে হট্ যাও হর্ন দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। ভিতরের আরোহী মিষ্ট হেসে তার হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছে। উঃ, কি উষ্ণ মাদকতা!

ক্ষুব্ধ এক চঞ্চলতায় অধীর হয়ে উঠল সে, অস্থিরতায় উদ্বেগে আক্ষেপে বার বার ঘাড় নেড়ে খানিকটা এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। নীচে নেমে যাবে—ফুটপাথ ধরে চলবে। কলকাতার গভীর রাত্রির নির্জন পথ। সে এক আশ্চর্য পুরী। হারিয়ে যাবে তার মধ্যে। সে গান শিখেছে। ভাল গান শিখেছে। মানুষকে মুগ্ধ ক'রে রাখতে পারে, মানুষের রক্ত উজানে বওয়াতে পারে। সে সব যন্ত্র বাজাতে পারে। তার অর্থের অভাব হবে না। সে পড়েছে। সে শুনেছে। সে জানে গানের আজ অনেক আদর। যারা সত্যকার সংগীতজ্ঞ তাদের হাজারে হাজারে টাকা। কিন্তু থমকে দাঁড়াল সে। কিসের শব্দ উঠছে?

মধ্যরাত্রির কলকাতার স্তব্ধতার মধ্যে পাথরের ইট বসানো রাস্তার উপর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। আশ্চর্য লাগে। দু'পাশের বাড়ির গায়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা উপরের দিকে উঠছে। খপ্—খপ্—খপ্—খপ্—। চাকায় রবার টায়ার। শুধু একটা টানা শব্দ, মধ্যে মধ্যে লোহায় কাঠে ঠোকার শব্দ—গচ্কায় পড়ছে—স্প্রিংয়ে বডিতে লাগছে।

—ক্যা—ক্যা—ক্যা—ক্যা। কোচোয়ান পাশের দাঁতে জিভের পাশ লাগিয়ে বাতাস টেনে ঘোড়াকে সস্নেহ তাড়না দিচ্ছে। —হ্যাঁ—চাবুকটা ঘুরছে বাতাস কেটে মাথার উপর।

বুকটা তার ধড়ফড় করে উঠল। পল্টন! পল্টনকে মনে পড়ল।

ফিরল সে। কিন্তু উত্তেজনা তিক্ততা যেন বেড়ে গেছে বাধা পেয়ে। কি করবে সে—কি করবে! তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে চেস্টড্রয়ারের একটা ড্রয়ার খুলে অনেক কিছুর তলা থেকে বের করলে সিগারেটের প্যাকেট। তার স্নায়ুশিরা একটা উত্তেজক কিছু চাচ্ছে।

ওঃ, কঠিন তপস্যা করেছে সে। সিগারেট পর্যন্ত ছেড়েছে লনার জন্য, ফাদারের জন্য। লনার জন্য বেশী। কতদিন আগে কেনা প্যাকেটটা ড্রয়ারের মধ্যে থেকেই গেছে। কতদিন বের করেছে। নেড়েছে। আবার রেখে দিয়েছে। খায় নি। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। লনা জানতে পারবে, পারবেই, ও যেন অন্তর্যামিনীর মত জানতে পারে। যখন ও তার হাত ধরে, মনের মধ্যে বাসনা জাগে—বুকে টেনে নেবে—লনা ধীরে ধীরে হাতখানি টেনে নেয়, ওর সেই এক কথা, করুণ ছলছল কণ্ঠে সজল চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে—আমি করুণার পাত্রী জন। আমি রুগ্ন দুর্বল খোঁড়া।

সিগারেট খেলে দীর্ঘক্ষণ পর তার কাছে গেলে সে বিষণ্নমুখ আরও বিষণ্ন ক'রে ম্লান হাসে—সে হাসি কান্নার চেয়ে করুণ—হেসে বলে—তুমি আমার কাছে কথা দিয়েছিলে জন!

জন প্রতিবার ক্ষমা চেয়েছে; নতুন ক'রে শপথ করেছে।—এবার ক্ষমা কর লনা। আর খাব না দেখো!

লনা একবার বলেছিল—জান—তুমি প্রথম এসেছ, ফাদার রাত্রে সেই ঝড়জলের মধ্যে তোমায় নিয়ে এলেন—আমি অবাক হলাম তোমাকে দেখে; তখন আট ন বছর বয়স—পঙ্গু জীবনে একা থেকেছি—তোমাকে দেখে হিংসেও হয়েছে, ভালও লেগেছে। হাঁটতে তখন কষ্ট হয় তবু তোমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে

থাকতাম। ডাকতাম—এই—এই। চাচী তাড়িয়ে দিত—যাও যাও—ছোঁয়াচ লাগবে, টাইফয়েড। যাও। ভ্যাকসিন ইনজেকশন ফাদার দিইয়েছিলেন সকলকে তবু চাচীর ভয় যায় নি। আমার ছেলেবয়সে তো ভয় ছিল না। তবু ওই জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতাম—কখন তুমি চোখ মেলবে। তুমি চোখ মেললে, জ্ঞান হ'ল—ফাদার জিজ্ঞেস করলেন।

জনের মনে পড়েছে, লজ্জিত হয়ে বাধা দিয়ে বলেছে—মনে আছে লনা আমি বিড়ি খেতে চেয়েছিলাম।

—সে যে আমার কি বিশ্রী কি খারাপ লেগেছিল কি বলব তোমাকে। এ মা—এ বিড়ি খায়!—তোমাকে খুব খারাপ মনে হয়েছিল।

সেইটেই ঘৃণা; সে ঘৃণা আজও ওদের মনের মধ্যে রয়েছে। সে যায় নি। যাবে না। এ ওদের যাবার নয়। সিগারেট খাবার তৃষ্ণা জনকে সব থেকে বেশী পীড়িত করে। তবু সে খায় নি। আজ খাবে। কিন্তু ঘরে নয়, ঘরের বাইরে। ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে ছাদের উপর এসে আলসের বুকে ভর দিয়ে সিগারেট ধরাল। বুক ভরে সিগারেটের ধোঁয়া টেনে সে যেন অপার তৃপ্তি-সুখ অনুভব করলে। আঃ! ধোঁয়াটা সে সজোর ফুঁয়ে বাড়ির বাইরে শূন্যলোকে ছুঁড়ে দিতে চেষ্টা করলে।

এখনও ঘোড়ার ক্ষুরের ক্ষীণ শব্দ উঠছে। ওই ফিটনটায় কি পল্টন ছিল? হয়তো ছিল না। এই মুহূর্তে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে—পল্টন নিশ্চয় ছিল না। কিন্তু হতেও তো পারত। যায় নি সে ভালই করেছে। পল্টনের সে হিংস্র দৃষ্টি মনে আছে। মনে পড়ছে তার সেই শপথের কথা—তুর জান হামি লিব, ই হামার কসম রইল রে শালা। হাঁ। হামি পল্টন।

আলিপুর কোর্টের বাইরে—অনেক লোকের সামনে। কসাইয়ের

ছেলে পল্টন সকালে বাপের দোকানে দড়ি বেঁধে টাঙানো ছাল-ছাড়ানো জানোয়ারের ধড়ে বড় ছুরি বসিয়ে সজোরে টেনে দেয় ডান হাতে, বাঁ হাতে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে মোটা কাঠের উপর রেখে চপার দিয়ে কুপিয়ে টুকরো করে, হাতে রক্ত লাগে—গায়ে মুখে স্নায়ু মেদ মজ্জার কণা ছিটে গিয়ে লাগে। হাত দুখানা রক্তাক্ত হয়। চোখে তার আশ্চর্য উল্লাস ফুটে ওঠে। সে পারে—নিশ্চয় পারে।

প্রথম রাগ তার রোশনিকে নিয়ে। ওই যে রোশনির তাকে ভালো লেগেছিল সেই তার বীজ!

* * * *

সেদিন বুড়ো তাকে রেগে ভাগিয়ে দিলেও পল্টন তাদের ছাড়ে নি। সে গিয়ে গিয়ে বুড়োকে গাঁজা আপিং যুগিয়ে খুশী করেছিল; শুধু তাই নয় বুড়োকে সেই সাহস যুগিয়ে এসপ্ল্যানেডে ভিক্ষে করতে বের করেছিল। বুড়ো এসপ্ল্যানেড চিনত নিশ্চয়, আগে ভিক্ষে সে সেখানেই করত কিন্তু ভিখিরীতে ভিখিরীতেও শত্রুতা আছে—আক্রোশ আছে। ওখান থেকে ঝগড়ার ভয়েই সে মৌলালিতে চলে এসেছিল।

পল্টন সাহস দিয়েছিল—কুছ ডর নেহি উস্তাদ। হম লোক রহেগা। ফিটনওয়ালা লোক! আরে খলিফা, জরুর তুম জানতা হ্যায় ফিটনওয়ালা লোগের হিম্মৎ তাগদ! আঁ!

তা বুড়ো জানত। ওখানে অনেক ভিক্ষে মেলে। তার উপর লোভও ছিল। বুড়ো ঝানু লোক। সে বোঝে সব। রোশনির জন্যে পল্টনের টান সে বুঝত। তবু লোভ। এবং নেশার লোভ। ভাঙা ঘরখানাও তার ভাল লাগল। লাগবারই কথা। পোলের তলার বাসায় একদিকে দেওয়াল—তিন দিক খোলাই শুধু নয়, তিন দিকে খালের জল। তা ছাড়া ওখানে অনেক শরিক। রাত্রে ভিখিরী চোর ভিখিরীর পাতা সংসারে চুরি করে। ভিখিরী

মেয়েকে টানে। রোশনিকে নিয়ে এখনও কেউ টানে না—টানবার সময় হয় নি—কিন্তু টানবে। এখানে পল্টনকেও ভয় করত সে। তবুও এসেছিল। নেশার লোভে; পল্টন তাকে বলেছিল—তুম চলো হুঁয়া উস্তাদ—হম সিকি ভরকে আফিন আওর গাঁজা রোজ দেগা। খোদা কসম!

বুড়ো এল একদিন—রাত্রিবেলা—তার পোড়া হাঁড়ি, ছেঁড়া কাঁথা কাপড়, একটা প্যাকিং বাক্স, কাগজের বাক্সে ভরা সংসার নিয়ে। ঢুকলো ওই ভাঙা বাড়িতে। বুড়োর বা রোশনির অশথ-গাছের ভূতকে ভয় ছিল না—ভগবানের নাম নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করলেও তাকেও গ্রাহ্য করত না। ভয় করত পুলিসকে; কিন্তু পল্টন ছিল এখানে সহায়। পল্টনের বাপ কসাইগিরিই শুধু করে না একখানা ফিটন, একখানা থার্ডক্লাস ছ্যাকরা গাড়ির মালিক—দুর্দান্তপনার প্রতাপ পয়সার প্রভাব দুইই ছিল—তার সঙ্গে আরও ছিল এ বস্তির মাতব্বর ফৈজু মিয়ার সঙ্গে দহরম মহরম। ফৈজু মিয়া বস্তির অনেকটা অংশের লিজের মালিক; তার সঙ্গে ছিল পেট্রোল পাম্প আর মল্লিকবাজারে পুরোনো মোটর পার্টসের দোকান।

বাড়ির মামলায় এক পক্ষে ছিল ফৈজু মিয়া, অন্য পক্ষে ছিল আসল জমিদার, কলকাতার কোন্ ঘোষ না বোস বাবুরা। ফৈজু পল্টনের আড্ডাগাড়াটাকে ভাল চোখেই দেখেছিল—কোনদিন তার দখলে সাহায্য হবে; তাই ওখানে পাড়ার লোকের কথা খাটত না।

বুড়ো ভিক্ষে সেরে ফিরত দুটো তিনটের সময়। তারপর গাঁজা আপিং দুই খেয়ে শুয়ে পড়ত। কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোত। রোশনি খেয়ে-দেয়ে একলা বসে থাকত—খেলা করত—সাজত—সামনে আয়না রেখে তার ঝাঁকড়া চুল আঁচড়াত। পল্টন দবীর গণপৎ রামেশ্বর—এদের তখন কাজ। পল্টনকে বসতে হত তার বাপের মাংসের দোকানে। বাপ তখন ঘুমোত। বেলা তিনটে থেকে

খরিদ্দার আসত। আড়াইটেতেও আসত। দুটো থেকে পল্টন যেত। গণপতেরা কাজ করত ফৈজু সাহেবের মল্লিকবাজারের দোকানে। দোকানে তারা মাল আনত। পার্টস। ঘুরে বেড়াত কোথায় কোথায়। ফিরে আসত সাইড লাইট রেডিয়েটার ক্যাপ হাবকাপ নিয়ে। দোকানে জমা দিত।

কতদিন রোশনি তাকে বলেছে—বাচ্চি—মেরি বাঁশুরিয়া—তু দুপহরমে কেঁও নেহি আতা? আঁ? কোই থাকে না রে। বুঢ্ঢা নিদ যায় মুর্দার মাফিক। তুকে পিয়ার করেঙ্গে।

কথার সঙ্গে কটাক্ষ হানতে ভোলে নি। তাতে তার বুকের ভিতরটা লাফালাফি শুরু ক'রে দিয়েছিল। কান দুটোর পেটী গরম হয়ে উঠেছিল একমুহূর্তে। হাতের তাপ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার সে সুযোগ সহজে মেলে নি। মিলবার উপায় ছিল না। সারাটা দুপুর নানীর সঙ্গে শ্যামবাজার নয় খিদিরপুর নয় চোরবাগান নয় চিৎপুর ঘুরে কাটাতে হত—চুড়ি চাই—চুড়ি। রে—শমী চুড়ি! বেলোয়ারী বাহারের চুড়ি!

বিকেলে বাড়ি ফিরে কিছু দুটো মুখে দিয়ে যখন ছুটে যেত তখন পল্টন দবীর গণপৎ রামেশ্বর এসে গেছে। বুড়োয়াকে ডেকে তুলে গাঁজার সরঞ্জাম পাতিয়েছে। রোশনি পা ছড়িয়ে বসে ভাঙা দেওয়ালের গায়ে একটা আয়না টাঙিয়ে ঝাঁকড়া চুলের বোঝা আঁচড়ে নানান রকম ছাঁদে সেজে দেখত। সে গেলেই তাকে পল্টন বলত—লে রে বে, সেজে লে।

তার মানে তাকে ঘাগরা পরতে হ'ত, ব্লাউস পরতে হ'ত। রোশনি আসবার আগে বাচ্চির এতে আমোদ ছিল—আপত্তি দূরের কথা। কিন্তু রোশনির সামনে তার লজ্জা হ'ত। তবু পল্টনের ভয়ে সাজতে হ'ত। মেয়ে সেজে যখন সে নাচত গাইত রোশনির সঙ্গে, পল্টন তাকে রোশনির মতই পেয়ার করত। কিন্তু পোশাক ছাড়লেই তার গাঁজা-খাওয়া লাল চোখের চাউনি পালটাত।

মিনিটখানেক হাঁ ক'রে চেয়ে থেকে বলত—ভাগ রে শালা আব ভাগ। নেহি তো নানী তোকে পিটবে—হাড্ডি তোড়বে। বাচ্চি যেতে না চাইলে রেগে উঠত—কি শালা—বিল্লির মতুন ঘুরঘুর করছিস কোন্ মতলবে? আঁ? শালা চোট্টা বেইমান—! মাথায় চাঁটি মারত। তারপর রোশনিকে হাতে ধরে টেনে বলত—চলতে হোবে না ধরমতলা? খাড়ি হোকে কেয়া হোতা? এ উস্তাদ! মিয়া উঠো। চলো। আব তো চলেঙ্গে হম ফিটনমে। চলো!

তারা চলে যেত ধর্মতলা এসপ্ল্যানেড—সে ফিরত নানীর বাড়ি।

প্রায় ছ'মাস পর একদিন তার সুযোগ মিলেছিল। নানীর বোখার জ্বর হয়েছিল। তার ছুটি—ছুটি—ছুটি! রোশনি! রোশনি! রোশনি!

ওঃ, সে দিনের সে কি স্বাদ! তখন সে এগারো বছরের, নয়-তো বারো। জীবনে রোশনির স্বাদ গ্রহণের সময় তার হয় নি তবুও তুজনে মুখোমুখি বসে সে কি চোখো-চোখি, হাসি কথা—মুখের উপর মুখ রেখে সে কি আনন্দ। বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ড আজও লাফাচ্ছে—দেহের রক্ত যেন বন্যার বেগে ছুটছে সে কথা মনে পড়ে।

জন দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, অস্থির হয়ে টুকরো ছাদটুকুর মধ্যে ঘুরতে লাগল।

হঠাৎ দাঁড়াল এক সময়। কি সুখ এই মার্জিত জীবনের, এই আরামের? এই পাকা দোতলার? কিছু না—কিছু না।

সে ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কি আরাম—কতটুকু আরাম এই নরম বিছানার সে দিনের সেই ভাঙা কোঠার উপরের সেই বাখারির ওপর উঠে যাওয়া মাটির মেঝের উপর চ্যাটাইয়ের শয্যার তুলনায়!

দুপুর বেলা—সেটা গরমের সময়ের দুপুরবেলা—ঝাঁ ঝাঁ করা রোদ্দুর, গোটা বস্তিটা যেন কড়া নেশায় ভাম নিঝুম; বুড়ো তারই মধ্যে গাঁজা টেনে নাক ডাকাচ্ছিল ঘরে। পল্টন দুপুরে একবার ক'রে আসত। একটায় এসে দুটোয় চলে যেত। বুড়োকে গাঁজা খাইয়ে খেয়ে যেত। সে সন্তর্পণে হাজির হয়েছিল। কি জানি পল্টন যদি না-গিয়ে থাকে। কিন্তু রোশনি নিজেই দাঁড়িয়েছিল কাত হয়ে পড়া উপরতলাটার কপাটহীন দরজায়। গলি থেকে মুখ বাড়াতেই সে তাকে দেখতে পেয়েছিল, যেন গলিটার মুখের দিকে চোখ পেতেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। চোখোচোখি হতেই আশ্চর্য ছন্দে হাত নেড়ে ইশারা ক'রে ডেকেছিল—আ-যাও। আ-যাও।

বাচ্চি ফিক ক'রে হেসে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিল—যাব? পল্টন?

প্রতিটি ইঙ্গিতের প্রশ্ন বুঝবার ক্ষমতা তখনই রোশনির জানা হয়ে গিয়েছিল। সে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে হাত নেড়ে সেই অপরূপ ছন্দে ডেকেছিল—হাঁ—হাঁ—আ-যাও।

যেমন ছন্দে হাত নেড়ে নেড়ে আকাশের চাঁদকে ডাকে মানুষে, সেই ছন্দ ছিল তার হাত নাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—নেই—কেউ নেই—পল্টন নেই।

—না—না—না—না। এদিক থেকে ওদিক ঘাড়টি নেড়েছিল সে আস্তে আস্তে—তারও ছন্দ লীলায়িত।

সামনের দিকটায় কোঠাটা ঠিকই ছিল—বারান্দাটা শুধু ছিল না। পিছন দিকে কিন্তু মাঝখান ভেঙে কাত হয়ে হেলে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে ওই ভূতুড়ে অশথ-গাছটায় ঠেকে কোনরকমে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকের দেওয়ালটা আধখানা খসে ছেড়ে পড়ে গিয়েছে; মেঝেটার এক মাথা থেকে আর এক মাথা পার্কে ছেলেদের স্লিপকাটা কাঠের যন্ত্রটার মত ঢাল।

কাছে যেতেই রোশনি ঝুপ ক'রে সেই অশ্বথগাছ বেয়ে বিড়ালীর মত নেমে এসে তার হাত ধরে বলেছিল—আও—আও মেরি বাঁশুরিয়া—চলে আও!

রোজ সন্ধ্যাবেলা এখানে এসে মেয়ে সেজে নাচত গাইত সে রোশনির সঙ্গে—পল্টনদের সামনে। কিন্তু একদিনও এই উপরের আস্তানাটার কথা শোনে নি। রোশনি বলেছিল—ওটা তার নিজের গোপন আস্তানা। পল্টনও জানে না—বহুৎ মজা হিঁয়া—দেখো!

বলে সে উঁচু দিকটায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল আর গড়াতে-গড়াতে এসে ঠেকেছিল নীচু দিকের ভাঙা দেওয়ালটার গায়ে। এই খেলাই তারা খেলেছিল খানিকটা। তারপর এককোণে মুখোমুখি বসে শুধু পরস্পরের মুখপানে চেয়ে ফিকফিক ক'রে হাসা। হাতে হাত ধরা ছিল—সে দিন উত্তাপ ছিল রোশনির হাতে—মধ্যে মধ্যে বাচ্চির হাত ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল—কোন একটা কিছুর শব্দেই সে চমকে উঠছিল ভয়ে। মনে হচ্ছিল পল্টন কি গণপৎদের কেউ এল, নয়তো বুড়ো জেগে উঠেছে।

রোশনি হেসে তাকে উপহাস করেছিল—দূরো ডর ফোক্না!

—উ কিস্‌কে আবাজ? গণপত্—

—ধুর্—

—বুড়োয়া?

—ভাগ। উ তো কউয়া লোক। দু'পহরকে বাদ আব সফরমে নিকালতা!

—নেহি। কউয়া নেহি। ধপসে আবাজ দিয়া।

—তব তো বিল্লী হ্যায়। উপরসে নীচে কুদ পড়া হোগা! আরামসে বৈঠ। আ যা মেরি বাঁশুরিয়া, মেরি কলিজামে আ যা!

রোশনির সে দিন নারীত্বের কোন পুষ্টিই দেহে ছিল না,

সে দেহে ছিল একান্তভাবে শুধু মানুষের ছলে নামে বালিকা কিন্তু তার মনে সে অনেক বড়—সেদিক দিয়ে তার সব জানা হয়ে গেছে। সে বাচ্চিরও। কিন্তু বাচ্চির সাহস ছিল না এতখানি। ভীরু বাচ্চি সে দিন রোশনির সাহসে প্রবল উত্তেজনার স্বাদ পেয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরই সে চঞ্চল হয়ে বলেছিল—আব হম যাই রোশনি। বুঢ়োয়া—

—আরে বুঢ়োয়াকো ডরনেকা কুছ নেহি হ্যায় তেরা। উ তুকে বহুৎ পসন করে রে বাচ্চি। হামাকে রাতমে কেয়া কহে তু নেহি জানতা। উ বোলে—বাচ্চিকে লেকে চল্ বে রোশনি—চলা যাই জয়পুর কি আজমেঢ়—হাম লোগোকি মুল্লুকমে। উসকো আচ্ছা মিঠি আবাজ ঔর গানামে আচ্ছা হুঁস এলেম হ্যায়। হামারা আবাজ বুঢ্ঢা হোকে খারাব হো গেয়া। আব তু আওর বাচ্চি দোনো একসাথমে গীত গায় তো সবকোই একদম বুঁদ হো যায়েগা। রোজগার বহুত হোগা। তু বোল উসকো! হম বোলতা—নেহি, কলকাত্তা আচ্ছা শহর হ্যায়। নেহি যায়েগা।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বাচ্চি রোশনির দিকে। সত্যি এ কথা?—জিজ্ঞাসাও করেছিল—সচ বোলতি হ্যায় রোশনি? খোদা কসম?

—হুঁ—হাঁ, খোদা কসম—ভগবান কসম—

—হম যায়েগা। বোল্ না বুঢ়োয়াকো।

—নহি—মৎ যানা। কভি নেহি যানা। খবরদার।

—কেঁও?

নীচে খকখক শব্দ উঠেছিল কাশির। রোশনি বলেছিল—ভাগো। উ বুঢোয়াকো মগজকে ঠিক নেহি হ্যায়। দেখে গা তো কোই বক্ত উ লোগকো বোল দেগা। ভাগো। মারো কুদি মেরি বাঁশুরিয়া।

সত্যিই লাফ দিয়ে পড়ে সে ছুটে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু

সে দিন পরম উল্লাসের দিন—সারা জীবনেও বোধ হয় এমন দিন আসে নি।

বাড়িতে বুড়ী তখনও বেহুঁশ। বাড়ির উঠোন তখনও খাঁ খাঁ করছে। একটু পরেই জোড়া গির্জের ঘড়িতে চারটে বেজেছিল। মনমেজাজ বাচ্চির ভাল ছিল তাই বুড়ী নানীর অবস্থা দেখে তার মায়া হয়েছিল। সে তাকে ডেকেছিল—নানী—নানী। এ—নানী।

নানী একবার চোখ মেলে তাকে দেখে আবার চোখ বন্ধ করেছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—পানি পিব—অ? পা—নি!

বুড়ী অল্প ঘাড় নেড়ে হাঁ করেছিল। সে জল দিয়েছিল মুখে। বুড়ী আবার হাঁ করেছিল। আবার সে জল দিয়েছিল। নানী আঃ বলে আরামের শব্দ ক'রে পাশ ফিরে শুয়েছিল। আরও কিছুক্ষণ পর সে ঘামতে শুরু করেছিল আর বার বার চেয়েছিল—পা—নি। পা—নি।

নানী জল খেয়ে খেয়েই যেন জ্বরটাকে কমিয়ে দিলে আরও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। তারপর তাকে ডেকে বলেছিল—বাচ্চি!

—নানী!

—আজ বাহার না যানা বাচ্চি। খোদা কসম। না-যানা।

সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যায় যাবে না? রোশনির সঙ্গে নাচবে না?

—শুন বাচ্চি! বাহার মৎ যাও। শুনো—বাত শুনো। নগিজ আও। শুনো।

—ক্যা? কণ্ঠস্বর তার বিরস ছিল—ভালো লাগে নি নানীর আকুতি। সে যেতে পাবে না সন্ধ্যার সময় এর থেকে খারাপ আর কিছু হতে পারত না সে দিন।

নানী তার হাতখানা চেপে ধরে বলেছিল—বৈঠ ববুয়া। হিঁয়া বৈঠ। শুন্—বাচ্চি—তু চলা যাবি বাহার তো হম মর যায়েগী। উ আয়েগা। হাঁ। তার চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল।

—কৌন ? কে ?

—উ ! হামারি খসম। নানা—

নানী বলেছিল—ওরে বাচ্চি তুই চলে যাবি—আমি একলা হব, হলেই তোর নানার ভূত আসবে। আমাকে ভয় দেখাবে। আমার বুকে চেপে বসবে। সে যখন মরে তখন তাকে আমি একটুও যত্ন করি নি। সে কমবক্ত—বদমাস—কখনও ভোলে নি। তুই যাস নি সারাদিন—আমার পাশে ছিলি তাই সে আসতে পারে নি।

বাচ্চির হাসি পেয়েছিল ; বুড়ী বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, একদম জানতে পারে নি তার যাওয়ার কথা। আরও হাসি পেয়েছিল বুড়ীর ভূতের ভয় দেখে। ওই অশথগাছটার ভূত মিথ্যে হওয়া থেকে সব ভূতই তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে।

নানী তাকে আরও কাছে টেনে করুণ কণ্ঠে বলেছিল—তু আজ হিঁয়া শো যা। হিঁয়া। এইখানে হমর পাশে, হমর গদ্দিমে বাচ্চাকে মাফিক—। হাঁ ! তুকে একঠো আঠ আন্নি দেগা হমি। এক আঠ আন্নি।

নানীর এত ভয় দেখে তার আর হাসি পায় নি—তার চোখের চাউনি দেখে এবং গলার আওয়াজের মিনতি শুনে তার ভারী মায়া হয়েছিল। নানীর কাছে তার শুতে ইচ্ছে হয়েছিল—কিন্তু এই দুরন্ত গরম—এই গরমে এই বন্ধ ঘরে সেদ্ধ হয়ে যাবে আর নানীর মুখে বড় বদবয়—ভারী দুর্গন্ধ একদম বমি আসে। বুড়ীর দাঁতগুলো একদম কালো কালো, তার মধ্যে আবার সোনার ফুটকি বসানো, কয়েকটা ভেঙে গেছে ; মুখের মধ্যে ঠোঁট দিয়ে চেপে রাখে তামাকের গুঁড়ো আর গালে রাখে পান দোক্তা। সব মিলিয়ে পচা গন্ধ।

সে বলেছিল—হমি নীচে শুত রহেগা, তুম হিঁয়া রহো।

—ন। বাচ্চি ! মেরি লাল ! হিয়া হামারা গদ্দিকে পাশ—। বেটা ! একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল—শুন—দেখ—

বলেও থেমে গিয়েছিল—অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল—দেখ্ কত লোক তোকে কিনতে চেয়েছে—তোকে বেচি নি। বেচলে তারা তোর জানোয়ারের হাল ক'রে ছেড়ে দিত। জানে মরে যেতিস তুই। তোকে বাচ্চার মত পেলেছি। আমার বাত শুনবি—বেমারিতে যতন করবি তো তোকে আমি আমার বিলকুল সবকুছ দিয়ে দিব। আমার টাকা আছে রে বাচ্চি—সব দিয়ে দিব তোকে। তু আমার কোলের কাছে শো। কাল পরশু আমি ভাল হয়ে যাব রে। পরশু খুব ধূপ লাগল—ওই থেকে তাত্ লেগেই জ্বর আমার। দেখছিস না কত ঘাম হ'ল। কাল ভাল হয়ে যাব। একলা বেমারিতে শুয়ে থাকতে ডর লাগে। আমার বেমারি হলেই বুঢ়োয়া এসে কোণে দাঁড়িয়ে ডর দেখায়। চোরকে ডর করি না রে, আমার পাশ ছোড়া আছে। উ মারবে—আমি ভি মারব। লেকিন ভূত—উকে তো মারা যায় না বাচ্চি। তুকে আমি বহুত পেয়ার করব। খুব যতন করব। কভি আর পিটব না। আমার কাছে শো যা। মানুষ কেউ থাকলে ভূতলোক আসে না। আসতে পারে না। দেখ্—ঘরমে পাঁউরুটি আছে, বাসী; তা হোক; গুড় আছে; দেখ্ উ রোজ মিঠাই এনেছিলাম——সে ভি আছে; আচার আছে; আচ্ছাসে খা। ভরপেট খা। শো যা—আমার গদ্দিকে একদম পাশ শো যা।

শুধু এখানেই নানী থামে নি। যতক্ষণ জেগেছিল ততক্ষণ থামে নি। বকেই চলেছিল। তার ঘুম হ'লে তাকে ডেকে খুঁচে জাগিয়ে বকেছিল।

জন আজ বোঝে—সে তার সেই ভূতের ভয়ে।

নানী মনোরম কাহিনী বলেছিল—তার বিয়ে দেবে। সুন্দর বউ। তাকে একটা চুড়ির দোকান ক'রে দেবে। তার টাকাকড়ি সব তাকে দিয়ে যাবে। মরবার আগেই নিজের হাতে উঠিয়ে নানী তাকে দেবে। নয়তো ফৈজু মিয়া বস্তির ইজারাদার জিমিদার

জবরদস্ত ডাকাবুকো আদমী—ও এসে তোকে ভাগিয়ে দিয়ে বলবে ই সব বিলকুল আমার। হাঁ—তার আগেই তোকে সব দিয়ে দোব। তুই তোর বহুকে লিয়ে একঠো ভাল ঘর লিবি—হুঁয়া লিয়ে যাবি।

বাচ্চির ভালো লেগে গিয়েছিল এসব কথা। খুব ভালো লেগেছিল। সে বলেছিল—তু ভি যাবি নানী ওই ভালো ঘরে। ই ঘর বহুৎ খারাব!

—না। হমি এহি ঘরমে মরব রে বাচ্চি। হাঁ। কেত্তো জাগামে হমর কেত্তো চিজ আছে হিঁয়া। আওর দেখ্—তু নয়া সাদী করবি—ছোকরী বহু উকে লিয়ে উ ঘরমে থাকবি—কেত্তো দিল্লগী করবি। হমি গেলে ভাল লাগবে না।

তারপর সে দিল্লগীর বর্ণনা করতে শুরু করেছিল। বাচ্চির ঘুম চোখ থেকে কোথায় পালিয়েছিল সে খোঁজ পায় নি; না, সে খোঁজই সে করে নি। সে যেন সেই দিল্লগীগুলোর স্বাদ পাচ্ছিল মনে মনে। তার বউ হয়েছিল রোশনি। সে দিন এক আশ্চর্য বিকেলবেলার স্বাদ পেয়েছিল বাচ্চি—আবার এক আশ্চর্য রাত্রির স্বাদও পেয়েছিল। নেশার স্বাদ সে তখনই জানত। পল্টনদের সঙ্গে বুড়োর কাছে গাঁজা সে খেত। তবে বেশী তাকে দিত না। সকলের পরে দু'তিন দম হ'ত তার। সে জনের মনে আছে। সব কিছুকে যেন নিঃঝুম আর সুন্দর মনে হয়—খানিকটা যেন ঝাপসা হয়ে যায়। কিন্তু সে ভারী সুন্দর। আপিংও সে খেয়ে দেখেছে। ওতেও সব ঝিমঝিম ক'রে ঘুম পায় কিন্তু পেট টানে। এ দিনের এই দু'বেলার সবকিছু সেও যেন নেশা। আশ্চর্য নেশা। সে নেশায় ঘুম তার কোথা—য় যেন চলে গিয়েছিল। আর সেও যেন হারিয়ে গিয়েছিল। গরম লাগে নি। নানীর মুখের গন্ধ বা গায়ের গন্ধ লাগে নি। কিছু না। নানী বকতে বকতে ঘুমিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার আর ঘুম আসে নি। ওই হারিয়ে গিয়ে

জেগে থেকেছিল। নানী যে-সব কথা বলেছিল—ওই দিল্লগীর কথা—তা তার মনে আজও আছে। সে কথায় শরীর মন চনমন ক'রে ওঠে। পা গরম হয়—হাত গরম হয়—কানের পেটী দুটো আর কানমূলে আগুনের আঁচ লাগে। তেতে ওঠে। বলেছিল—জোয়ান আর জোয়ানী দুজনে বসে গীত গাইবি গুনগুনিয়ে—বহু তোকে নয়না মেরে কথা বলবে—তারপর ছুটে পালাবে—তুই শেরকা মাফিক লাফ দিয়ে গিয়ে পাকড়াবি; উ বলবে—ছোড়ো, ছোড়ো মিয়া, ক্যা দিল্লগী করতে হো, শরম নেহি আতা? তুই বলবি—নেহি—শরম ক্যা হ্যায়—মার ডালো শরমকো—তোড় দো—ফাড় দো—ফেক দো—বলে ওর মাথার কাপড়া খুলে দিবি। হাঁ। দেখবি ছোকরী মুখে খুব রাগ দেখাবে কিন্তু ওর গাল দুটো লাল হয়ে উঠবে—চোখ জ্বলজ্বলাবে। তু উসকে আপনা ছাতিয়া পর টানবি আর ছোকরী আগকে পাশমে মাখখনকে মাফিক গলে এলিয়ে পড়বে। কখনও তুই কাম করবি—উ পিছে থেকে এসে তোর কান্ধা পর ঝটসে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে—বলবে—মুঝে পাকড়ো মিয়া, ময় গির পড়তি হুঁ—পাকড়ো পাকড়ো। আরও অনেক—অনেক কথা। আশ্চর্য কথাগুলো, এই দশ বছরে সেগুলোকে মনে হয়েছে অশ্লীল—মনে হয়েছে শুনলে পাপ হয়—মনে করলে পাপ হয়—লজ্জা হয়, ঘেন্নাও হয় কিন্তু সারাদেহ কেমন আনচান ক'রে ওঠে। হাত পা গরম আজও হয়—কানের পেটী কানমূলে উত্তাপ হয়—ঝাঁঝাঁ করে। আর তাতে আশ্চর্য নেশা। মনে হয় ওইখানে, কেবলমাত্র ওইখানেই আছে সুখ আনন্দ—আর কোথাও নেই।

সে এক আশ্চর্য দিন তার জীবনে।

পরের দিন সকালে উঠেই কিন্তু নানী তাকে গালাগাল ক'রে ঝাঁকি দিয়ে টেনে তুলে দিয়েছিল। আবে নড়াপূতা—কুত্তিকি বাচ্চা—হারামজাদে—আভিতক নিদ যাতা তুম? ওরে হারামী

ওঠ ; এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে—যেন নবাবজাদা জমিদারের বেটা, শেঠকে পোতা! ওরে—কয়লা তো সব নিয়ে গেছে, আবার বাজারও পাবি নে যে। ওরে কুত্তা—কাল থেকে আমি জ্বরে পড়ে আছি—চা কি আমি করব ?

ভোরের দিকে বাচ্চি ঘুমিয়ে পড়েছিল। নানী বোধ হয় দশটা পর্যন্ত তাকে ওই সব চনমন-করা কথা বলে ঘুমিয়ে পড়েছিল; পড়েছিল থলথলে মাংসের ডাঁইয়ের মত। তার জ্বর তার আগেই ছেড়ে এসেছিল; সপসপ করেছে ঘামে। বাচ্চি ওই নেশায় জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছে।

* * *

ঢং শব্দে সার্কুলার রোডের ওপাশে এণ্টালী এপাশে এলিয়ট রোডের এলাকার রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে একটা গম্ভীর সুরময় শব্দঝঙ্কার ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে হ'তে যেন অনেক দূরে চলে গিয়ে মিলিয়ে গেল। জোড়া গির্জের ঘড়িতে একটা বাজল। চেয়ারে বসে জন বর্তমানে সচেতন হয়ে একটু ঘাড় ফিরিয়ে যেন কান পেতে রইল। একটা ? না তারপর আরও বাজবে ? না। আর না। একটা।

সে দিন নানীর পাশে শুয়ে সে তিনটে বাজা শুনেছিল। তারপর আর শোনে নি।

ঢং ঢং শব্দে দুটো বাজল গির্জের ঘড়িতে।

শব্দের সঙ্গে সুর কাঁপছে; বাতাসের স্তরে স্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সংগীতের রেশ বাজছে। মন উদাস-করা সংগীতের রেশ! ঘুমন্ত মহানগরীর স্তব্ধতার জন্যই এমনটা বেশী অনুভব করা যাচ্ছে। চেয়ারে বসে যে জন এতক্ষণ প্রবল উদ্দাম চঞ্চলতা অনুভব করেছিল সে কেমন যেন হয়ে গেল।

কোথা থেকে কোন্ জীবন থেকে কোথায় কোন্ জীবনে সে এসে পড়ল! সুর ছিন্ন হ'ল, তাল ভঙ্গ হ'ল—ছন্দ কেটে গেল;

কিছুতেই আর সে মেলাতে পারছে না। সেই জীবন—আর এই জীবন! কিন্তু ওই একটি দিন, যে দিনটির স্বাদ মনে মনে অক্ষয় হয়ে আছে—সেই দিনটিতেই ছন্নছাড়া ছন্দহারা একালের সব কিছুর আয়োজন হয়েছিল। সে দিনটি যদি না-আসত!

পাঁচ

এতটুকু সন্দেহ নেই। ওই দিনটি যদি তার জীবনে না-আসত তবে আজকের এই নিষ্ঠুর মর্মযন্ত্রণার দিনটি আসত না। এ কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সত্যই একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করছিল জন। মন থেকে সেটা যেন দেহেও সঞ্চারিত হয়েছে। বুকের ভিতরটা একটা অসহনীয় উদ্বেগে ক্ষোভে অস্থির হয়ে উঠেছে। সে অস্থিরতা স্নায়ু শিরায় অনুভব করছে, হৃদ্‌পিণ্ডের গতিতে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে।

চেয়ার থেকে উঠে এসে জন জানালার ধারে দাঁড়াল। জানালার ওধারে একটা গলিপথ। গলির ওধারেও একটা দোতলা বাড়ি। অন্ধকার হয়ে আছে। ও বাড়িরও সব আলো নিভে গেছে। নইলে দু'চার টুকরো আলোর ছটা বেরিয়ে আসত। ওদিকের ঘুমন্ত বাড়িটার পুরনো শেওলাপড়া দেওয়ালটা যেন প্রকাণ্ড একটা কবরের মত মনে হচ্ছে। মনে পড়ছে পার্ক স্ট্রীটের পুরনো কবরখানাটার কথা! অন্ধকারে কবরখানাটার বড় কবরগুলোকে এমনি দেখায়। ওই কবরখানা থেকে ফাদার তাকে তুলে এনেছিলেন। ওঃ, কেন এনেছিলেন ফাদার?

এই দিনটি—। মূলে এই দিনটি! দিনটা যদি তার জীবনে না-আসত!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে দুই হাতের মুঠো দিয়ে মাথার দু'পাশের ঘন লম্বা চুলগুলি চেপে ধরে জানালার চৌকাঠে মাথা

রাখলে। ওঃ মনের যন্ত্রণা! আজ আর সেই বস্তির জীবনে ফিরে গিয়ে সেই দৈহিক দুঃখে কষ্টে থাকতে সে পারবে না,—এখানে অনেক আরাম, অনেক স্বাচ্ছন্দ্য। বস্তির সেই গন্ধ, সেই নোংরা সংকীর্ণতা, সেই দম বন্ধ করা ঘুপ্‌চি ঘর, সেই কুৎসিত কথা কলহ—সবই তার অসহ্য। তবু তার মন তারই লালসায় অধীর। রোশনি! রোশনি! শুধু রোশনিই নয়—সব অসহ্য কদর্যপনার মধ্যে সেখানকার উল্লাসে একটা নেশা আছে। কবে কতদিন আগে নানী তাকে কুড়িয়ে বস্তিতে এনেছিল—তার আগে সে কোথায় কেমন অবস্থায় ছিল তার মনে নেই; বস্তিতে এসে নানীর নির্যাতনের মধ্যেও দুঃখ ক্ষোভ অনুভব করেছিল—তবু পল্টন-গণপৎ রামেশ্বরদের সঙ্গে সেই উল্লাসের একটা স্বাদ পেয়েছিল। সেও হয়তো সে ভুলতে পারত; কিন্তু ওই দিন—ওই দুপুরবেলা সেই মুখ থুবড়ে পড়া ভূতুড়ে অশথগাছটায় হেলান দেওয়া কোঠাবাড়িটার কোঠার ওপর গ্রীষ্মদুপুরে রোশনির সাহচর্যে যে স্বাদ পেয়েছিল তা সে ভুলতে পারছে না। ওই দিনটিতেই শুরু; এর পর আশ্চর্য ভাবে সুগম ক'রে নিয়েছিল তাদের দেখাশুনার পথ রোশনি নিজের বুদ্ধিতে।

সেদিনকার নানীর কথাগুলি তার মনের মধ্যে—ঘরে বন্ধ ঝ'ড়ো হাওয়ার মত বেরুবার জন্য ছটফট করছিল; সেই যে রাত্রে জ্বরে বিহ্বল নানী ঘরের কোণে তার মরা স্বামী দাঁড়িয়ে আছে মনে করে তাকে কোলের কাছে শোবার জন্য আকূতি জানিয়ে বলেছিল—আমার বাত শুনবি, বেমারিতে হামার যতন করবি তো তোকে আমি আমার বিলকুল সবকুছ দিয়ে দেব। আমার টাকা আছে রে বাচ্চি—সব দিয়ে দিব তুকে।

শুধু তাই নয়—বলেছিল—যখনই সে বুঝবে যে এ বেমারি থেকে আর উঠবে না তখনই সে তাকে জায়গা দেখিয়ে দেবে। বাচ্চি উঠিয়ে নেবে। বলেছিল—তু একঠো আচ্ছাসে পাকা মেঝিয়ে ঘর

লিবি, সাদী করবি—খুবসুরতি ছোকরী—তাকে লিয়ে উ-ঘরে থাকবি। চুড়িকে তুকান বানাবি। মজেমে থাকবি।

সে কল্পনা করেছিল—সে খুবসুরতি ছোকরী হবে রোশনি।

নানী ঘুমিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার আর ঘুম হয় নি সারারাত্রি।

পরের দিন ভোরে নানীর জ্বর তখন ছেড়েছে—অকাতরে ঘুমুচ্ছে সে; মনটা তার উসখুস করেছিল—রোশনিকে কখন গিয়ে বলে আসবে নানীর কথাগুলি। বলে আসবে—রোশনি, নানীর টাকা আমাকে দিবে, সেই টাকা লিয়ে একঠো আচ্ছা ঘরে গিয়ে থাকব, তুকান করব; তুকে জরুর সাদী করব। খবরদার রোশনি—উ পল্টনোয়ার সাথ সাদী করবি না। নানী বলেছে রোশনি—বাচ্চি, তখুন তু জোয়ান হোয় যাবি—আচ্ছা খুবসুরত জোয়ান হবি—বহুত খুবসুরতি এক নওজোয়ানী ছোকরীকে সাদী করবি; আর পাক্কা মেঝিয়াবালা আচ্ছা ঘরকে আচ্ছা কামরামে থাকবি—গীত শোনাবি—দিল্লগী করবি ছোকরী বহুকে লিয়ে।

মনে মনে রোশনির মুখের ছবি এঁকেছিল—টাকার কথা, ঘরের কথা, নানী যে সব দিল্লগীর কথা বলেছে সে সব শুনে রোশনির সরু লম্বা চোখ ছুটো কেমন ঝিকমিক ক'রে উঠবে—তার পাতলা ঠোঁট ছুটির ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট দাঁতের সারি কেমন বেরিয়ে পড়বে; মধ্যে মধ্যে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে মাথার খাটো ঝাঁকড়া চুলগুলি তুলিয়ে মুচকে হাসবে।

সেই সকালবেলা কয়লা কুড়ুতে যাবার পথে সে ভুতুড়ে অশথ-গাছটায় হেলান দিয়ে বাঁকা বুড়োবুড়ীর মত ভেঙে পড়া বাড়ি রোশনিদের আড্ডাতেও গিয়েছিল। কিন্তু সেই ভোরবেলাতেও সেখানে ছিল—তুশমন শয়তানের শাগরেদ—পল্টন। প্রথমটা সে বুঝতে পারে নি পল্টনের থাকার কথা।

নীচের ঘরে বুড়ো অবোরে ঘুমুচ্ছিল। রোশনি ছিল না। হয়তো রোশনি উঠে আশেপাশে কোথাও আছে ভেবে অভ্যস্ত

খুশীভরা কণ্ঠে ডেকেছিল—রোশনি, রোশনি। তারপর মেরেছিল সিটি, জিভের তলায় আঙুল রেখে। বাচ্চির জন্ম থেকেই সুরে দখল। সে সিটির মধ্যেও সুরকে নামিয়ে উঠিয়ে গানের মত সুরেলাই শুধু নয়—তার মধ্যে কথার ইঙ্গিত ফোটাতে পারত। ওদের দলের দরকারেই বাচ্চি এটা আবিষ্কার ক'রে অভ্যাস করেছিল। পল্টনরা যখন কোন বদমাইশী কাজ করত, ও থাকত পাহারায়। বিশেষ ক'রে পাড়ার বাইরে। পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায় ওরা যখন লুকিয়ে বসে থাকত ওই ফিরিঙ্গীপাড়ার ছেলেদের উপর আচমকা হামলা করবার জন্য কিংবা পিকপকেটের মাল ভাগ করবার জন্য—তখন বাচ্চিকেই থাকতে হ'ত পাহারায়; তার কারণ ও শিস দিয়ে প্রায় কথা বলে ইশারা দিত।

—হু—ক্। সমান সুরে সমান টানে ছুটো হু—ক্ শুনেই বুঝত—ভাগ্। গ-য়ের জায়গায় ক শিসটা ঠিক স্পষ্ট হ'ত।

যেদিন বাচ্চি নানীর সঙ্গে চুড়ি বেচে ফিরে এসে ওদের আড্ডায় পেত না সেদিন পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায়, পাড়ায় না-পেলে কবরখানার ধারে এসে শিস দিত, হু, হু-হু—হু। অর্থাৎ ময় আয়া হুঁ। রোশনি শব্দটার রো শব্দটা তো স্পষ্ট ফোটাতে পারত শিসের মধ্যে। 'শ'টা ঠিক হ'ত না আবার 'নি'টা বোঝা যেত।

ওই দিন—ওই সকালেই সে প্রথম চেষ্টা করেছিল শিসের মধ্যে রোশনি শব্দটা ফুটিয়ে রোশনিকে ডাকতে। কয়লা কুড়োবার ঝুড়িটা হাতে বেরিয়ে ওই প'ড়ো বাড়িটার উঠোনে এসে প্রথম কথা দিয়েই ডেকেছিল—রোশনি, রোশনি! উত্তর না-পেয়ে বারান্দায় উঠে নীচের তলার ঘরে উঁকি মেরেছিল; ঘরে একা বুড়ো ঘুমোচ্ছিল বেহুঁশ হয়ে, মুখটা তার আজও মনে পড়ছে; ঝাঁকড়া চুল দাড়ি গোঁফে ঢাকা—বিশ্রী কোঁচকানো চামড়া মুখখানায়—হাঁ ক'রে ঘুমোচ্ছিল—ছু'তিনটে দাঁত ছাড়া দাঁত ছিল না—কালো

মাড়ি দুটো নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে হাঁ হয়ে ফাঁক হয়ে গিয়ে বীভৎস হয়ে উঠেছিল—তার সঙ্গে শব্দ হচ্ছিল—ফু-ফু-ফু—ফৎ। রোশনি তবে কোথায়? কোথাও আশেপাশে রয়েছে ভেবে প্রথম সে সোজা সিটি মেরেছিল—হু—। তারপরই তার খেয়াল হয়েছিল শিসের মধ্যেই 'রোশনি' নামটা ফোটাতে। তাই চেষ্টা করেছিল—এবং ঠিক পেরেছিল। তার শিস বলেছিল—রোশনি! মাঝের শব্দটা অস্পষ্ট কিন্তু প্রথম ও শেষটা বেশ পষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে কোঠার বারান্দা থেকে কে ধপ করে লাফিয়ে পড়েছিল। চোর যেমন পালাবার সময় লাফায় তেমনি চোরের লাফ। কিন্তু পড়েই সে আর চোরের মত ভীরু ভীতু থাকে নি—ডাকাতের মত ভয়ংকর হয়ে তার সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আবে শালা, তু বাচ্চি? সে পল্টন! সঙ্গে সঙ্গে সে তার গলা চেপে ধরে বলেছিল—আবে হারামী এতনা ফজেরে কেয়া কাম তেরা রোশনিকে সাথ? বাতাও!

ভয় পেয়েছিল বাচ্চি। কসাইয়ের ছেলে পল্টনের চোখের একটা চাউনি ছিল—তার মধ্যে খুন নাচত।

বাচ্চি কোন জবাব দিতে পারে নি। হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উপরের ভাঙা বারান্দাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে রোশনি বলেছিল—উর সাথে হমি কোয়লা কুড়ানে যাব। ছোড়ো উস্কো পল্টন সাব—রাজা বাহাদুর! উকে হমি বলেছিলম।

বাচ্চির গলা পাকড়ে ধরা ভয়ংকর, পল্টনের থাবার মত হাতখানা আলগা হয়ে গিয়েছিল—সে উপরের দিকে মুখ তুলে রোশনিকে প্রশ্ন করেছিল—কোয়লা? হমি কাঁচা কোয়লা লিয়ে দিয়েছি—শালা রেলের কোয়লার ইস্টকসে এতনা বড়া দুঠো চাঙড়া লিয়ে এলম—তব ভি কোয়লা?

কুৎসিত অশ্লীল গাল দিয়ে বলেছিল—একেলে ই হারামী না,

তু ভি—ই হারামীর সাথ মহব্বতি করছিস, কুত্তি কাঁহাকা। তোর জান ভি লে লেবে হমি।

রোশনি আশ্চর্য। সে ভয় করে নি, বলেছিল—কোয়লা—রেলের কোয়লা। লিয়ে যা উ তু লিয়ে যা। ধুঁয়াকে মারে জান নিকাল যাতা হ্যায়—দোনো আঁখসে দরিয়াকে মাফিক পানি নিকালতা। উ লে যা তু।

কথাটা সত্য। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া মিথ্যে নয়। দমে গিয়েছিল পল্টন। রোশনি বলেছিল—হমি কুত্তি, তু শেরকে বাচ্চা শের। আঃ—হা। তু হমার জান লিবি—উসকে আগে হমি ভি তুকে কাটবে। ওহি জহরসে তু মরবি। যাও—চলা যাও। কুত্তিকে পাশ মৎ আও।

পল্টন তো পল্টন বাচ্চি পর্যন্ত রোশনির ওই কথা বলার ভঙ্গি এবং ওই বিচিত্র কথা শুনে তার ভয় ভুলে গিয়েছিল—ভুলে গিয়েছিল যে পল্টন তার গলা ধরে আছে। পল্টনও তার গলা ছেড়ে দিয়েছিল।

তার গলা ছেড়ে দিয়ে দাঁত বের ক'রে হেসে পল্টন বলেছিল—তুকে কুত্তি হমি নেহি বোলা হ্যায়—

—ঝুট বাত, তু ঝুটা আদমী। বোলিস নি হমাকে কুত্তি?

—নেহি। কভি নেহি। বললাম—এই বাচ্চিটো কুত্তা আছে—উকে যে পিয়ার করবে সে কুত্তা আছে। হমাকে পিয়ার করিস তু—হমি শের—তু শেরনী।

রোশনি বলেছিল—তু যা বাচ্চি—তুকে বলেছিলাম যাব—কোয়লা আনব, তো নেহি যায়েগা, তু যা। ধুঁয়াসে মরব হমি। তু যা।

এরই মধ্যে উঠে পড়েছিল বুড়ো—খকখক শব্দে কাশতে শুরু করেছিল। সকালবেলা বুড়োর একবার কাশি উঠত। গাঁজা না খেলে থামত না। রোশনি তার হাতে তুলে দিত কল্কে, তারপর

দেশলাই ধরিয়ে ধরত, বুড়ো কাশতে কাশতে হাঁপাত। এই সময়টায় সে কাউকে খাতির করত না। দম বন্ধ করা কাশির মধ্যেও সে কোনক্রমে ডেকেছিল—রো—শ—নি!

পল্টন মুহূর্তে একপাশে আড়ালে স'রে গিয়ে বলেছিল—যো—যো—আজ যো তু বাচ্চিকে সাথমে। বিকালে হমি পোড়া কয়লা জরুর এনে দিব।

বলেই ছুটে পালিয়েছিল। দূরে গিয়ে বাচ্চিকে ইশারা ক'রে ডেকে বলেছিল—শুন বে বাচ্চি—উ কুত্তি তুর সাথে যাবে কোয়লা আনতে। দেখবি—আর কোই হারামীর সাথে দিল্লগী না করে।

কথা শেষ করেই বস্তির সরু একটা গলির ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়েছিল সে। বাচ্চি দাঁড়িয়ে ছিল চুপ ক'রে। এতক্ষণে তার মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল—ভাঙা কোঠার উপরের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা থেকে পল্টন লাফিয়ে পড়ল। তারপর রোশনি এল। তাহলে—? মনে পড়ল গত কালের দুপুরবেলার কথা। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চির মনও রোশনির উপর বিরূপ হয়ে গিয়েছিল।

আশ্চর্য! এই টুকরো টুকরো ঘটনা, কথা এমন ঝকঝকে হয়ে মনে রয়েছে এতকাল পর! তার এতটুকু ভুলে যায় নি—এতটুকু এদিক ওদিক হয় নি। এই জীবনের মালার কতকটা শুকিয়ে ঝরে গেছে, কতকটা প'চে দলা বেঁধে গেছে কিন্তু এমনই কতকগুলো জায়গায় ফুলগুলি পরের পর সাজানো রয়েছে—টাটকা তাজা ফুলগুলি যেন আজকেই কিছুক্ষণ আগে তোলা ফুল। গন্ধটা উগ্র মাদকতা ভরা। বহড়া মুকুলের গন্ধের মত, মহুয়া ফুলের গন্ধের মত। সাঁওতাল পরগনায় দুমকার কাছে ফাদার তাকে মিশনে দিয়েছিলেন। নিজেও ছিলেন লনা চাচী গোমেশকে নিয়ে। সে-সময় সে দেখেছে এসব ফুল। কত ফুল ফোটে সেখানকার বনে। সব নাম মনে

নেই—রঙ গন্ধ সব ভুলে গেছে কিন্তু মহুয়া বহড়া মনে আছে; রোশনির কথা ঠিক তেমনি।

রাগ হয়েছিল রোশনির উপর কিন্তু সে রাগ ক'রে চলে খেতে পারে নি। ওঃ, যদি তাই পারত! দাঁড়িয়ে ছিল সে। রোশনি এসেছিল কিছুক্ষণ পর। বুড়োকে গাঁজার কল্কে হাতে ধরিয়ে দিয়ে—তাতে বেশ আগুন ধরিয়ে সে এসেছিল তার কাছে। হেসে বলেছিল—আ—হাঃ—মেরি বাঁশুরিয়া রে! কাল রাতে তোর নিদ্ হয়নি রে! আঃ মেরি জান!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথা তখনই বুঝতে পারত রোশনি। বুঝতে পেরেছিল। হেসে বলেছিল—গোস্যা হয়ে গেল হমর বাঁশুরিয়ার! আ হাঃ! ঠোঁটে চু-চু শব্দ ক'রে আদরের সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশিয়ে তার স্বাদ ক'রে তুলেছিল মদের মত।

এবার ফিক্ ক'রে হেসে ফেলেছিল বাচ্চি। একমূহূর্তে সব ভুলে গিয়ে মনে হয়েছিল রোশনির চেয়ে ভাল, রোশনির চেয়ে মধুর আর কেউ নেই—কিছু নেই।

রোশনি এবার জিজ্ঞাসা করেছিল—এতনা ফজেরে—এত্যো ভোরে—কি রে বাচ্চি? হমাকে দেখতে এলি? কোয়লা আনতে যাবি—একদফা রোশনিকে দেখতে যাবি? বলে মুচকে মুচকে হাসতে লেগেছিল। তারপর বলেছিল—হমি যদি ঝুটা বাত বলতাম বাচ্চি না কি হমি ভি কোয়লা চুনতে যাব—তো কি হ'ত? মারত তোকে উ শয়তান! আঃ বাঁশুরিয়া বহুত পেয়ার করে হমাকে। হমার লেগে ছুটে আইল। রাতে নিদ্ হ'ল না। হা-হা-রে!

বাচ্চি বলেছিল—হাঁ। তোকে দেখতে এলম। রাতে সারারাত ঘুম হ'ল না।

হমার লেগে?

—হাঁ—হাঁ তুর লেগে জরুর। আওর নানীর লেগে ভি ঘুম হ'ল না।

—নানী মর যায়েগি ? বহুত বেমার ?

—হাঁ। কাল রাতে বহুত বোখার। বহুত।

কথাটা শেষ ক'রেই বাচ্চি বলে ফেলেছিল নানীর রাত্রের কথা। জনহীন গলিপথটার মুখে অকারণে এদিক ওদিক কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে ফিসফিস ক'রে বলেছিল—নানীর টাকা আছে রোশনি ! এতো !

হাসিতে লাস্যে রোশনির ঝিকিমিকি মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে একটা চমক খেলে গিয়েছে, সব বদলে গিয়ে আর একরকম হয়ে উঠেছিল সে। সব চাঞ্চল্য সব ঝিকমিকিনি স্থির হয়ে গিয়েছিল। সরু লম্বা চোখ দুটোকে বিস্ফারিত ক'রে বিস্ময়ে স্থির হয়ে গিয়ে রোশনি বলেছিল—টাকা ?—

—হাঁ, এতো। নানী বললে—হমার যতন কর বাচ্চি, তুকে সব হমি দিয়ে দিব।

—তুকে দিবে'!

—হাঁ। বললে—খোদা কসম, ভগবানকে নাম নিয়ে বলছি—সব তুকে দিব। উ মরবে, তার আগে দিবে। নেহি তো ফৈজু মিয়া সব লিয়ে লিবে। আউর বহুত মজাদার বাত বললে নানী—তুকে বলব ব'লে আইলম।

—ঠার যা। আভি আতা হম। তুরন্ত।

ছুটে চলে গিয়ে তখুনি সে একটা ছোট টুকরি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।—চল্। কোয়লা চুনব আর শুনব।

—তু যাবি ?

—হাঁ। বাত শুনব—নানী কি বললে।

খুশী হয়ে উঠেছিল বাচ্চি। নানীর কথা শুনে যে-উচ্ছ্বাসে সে গতরাত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল রোশনির আগ্রহে বিস্ময়ে সে

উচ্ছ্বাস তার জীবনকে ছাপিয়ে যেন উথলে উঠেছিল। সে নেচে উঠেছিল লাফ দিয়ে দিয়ে। তারপর গান ধরে দিয়েছিল—সেই গানটা—চিড়িয়া বোল বোল কাঁহা গিয়া মেরি প্যারী? এ চিড়িয়া রে—রেললাইনের ধারে কয়লা কুড়োতে কুড়োতে স-বিস্তারে সে বলেছিল নানীর কথা। সব থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছিল চুড়ির দোকান করার কথা, ভাল ঘর ভাড়া করার কথা—সাদীর কথা; খুবসুরতি বহু নিয়ে কত রঙ্গরসের খেলার কথা। নানী যাকে বলেছিল—দিল্লগী!

রোশনিও উল্লসিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। তারপর বলেছিল—শুন বাচ্চি! নানীর খুব যতন কর। হাঁ! পল্টন রামেশ্বরোয়া ভি বলে কি বাচ্চির নানীর বহুত টাকা আছে। মাট্টিমে গাড়া আছে। আউর সব আদমী লোকভি বলে রে! উ ঠিক দিবে তুকে। ওই টাকা লিয়ে তু হমি মজেসে থাকব। উ হারামী পল্টন শয়তান বদমাশ আছে। উকে হমার বিলকুল খারাব লাগে। হম লোক মজেসে থাকব। নেহিতো কলকাত্তাসে ভাগব—চলে যায়েগা বম্বই নেহিতো দিল্লী, নেহিতো আজমীঢ়, তু গীত শিখে লিবি, ইয়া চুস্ত পায়জামা পিঁধবি, ইয়া পাঞ্জাবি চঢ়াবি, ইয়ে টোপী,—হমি পিঁধব সাটিনকে ঘাঘরি, মলমলকে কাঁচুলি, বানারসী ওঢ়নি, পায়েরমে বাঁধব ঘুঙরি; হাঁতমে লিব মেহদী—আঁখে লিব সুরমা; বাস—বড়া বড়া মজলিসমে গানা নাচা করব। হাঁ। উস্তাদ বাচ্চি সাব—আউর তওয়াইফ রোশনি বেগম! লেকেন উ পল্টন শালাকে মৎ বোলনা। খ-ব-র-দা-র!

বাচ্চি তা পারে নি। পল্টনকে রামেশ্বরকে দবিরকে গণপৎকে এতবড় সৌভাগ্যের কথা কি না-বলে থাকতে পারে? সে সেইদিন বিকেলেই বলেছিল।

সেদিন দুপুরেও সে রোশনির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। নানীর

জ্বর সেদিন ছেড়ে আবার এসেছিল, তবে কমে নানীর যত্নও সে করেছিল। সকালে কয়লা কুড়িয়ে ফিরে এসে নানীকে মুখ ধোবার জল দিয়েছিল, দোকান থেকে চা আর নেড়ো বিস্কুট কিনে এনে দিয়েছিল ; নানী বলেছিল—দেখ্ তো বাচ্চি—সুরতিয়াকে পুছ্ তো ওকরা পাস আচার হ্যায় কি নেহি! তাও সে এনে দিয়েছিল। বুড়ী শুয়ে শুয়ে আচার চেটে জিভে টাকরায় টোকর দিতে দিতে বলেছিল—তু বহুত ভালো ছেলিয়া রে। বহুত ভালো!

খুশী হয়েছিল বাচ্চি—এবং নানীকে আরও খুশী করবার জন্য বলেছিল—নানী!

—ক্যা?

—পায়ের দাবা দি? আরাম লাগবে

বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে থলথলে পা দুখানার একখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—দে।

পা টিপতে টিপতে বলেছিল—তোহার খুব যতন করব হমি নানী।

—জিতা রহো বাচ্চা। ভগোয়ান খোদা তেরা ভালা করে! তু আচ্ছা লড়কা, ভালো ছেলিয়া।

বাচ্চি পা টিপতে টিপতে বলেছিল—হমারা সাদী কিসকা সাথ দিবি নানী?

নানী তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল সবিস্ময়ে।

বাচ্চি খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিল কিন্তু তার অদম্য আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় এবং উচ্ছ্বাসে সে নিরুৎসাহকে অতিক্রম ক'রে বলেছিল—কাল রাতে তু বললি নানী!

মনে পড়ে, ভারী একটি মিষ্টি হাসি নানীর শুকনো মুখে ফুটে উঠেছিল।

সে হাসিতে বাচ্চি যেন আরও উৎসাহিত হয়েছিল এবং উত্তরটা পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে বলেছিল—নানী!

নানী হেসেই বলেছিল—উসকে আগে তো জোয়ান হোনা চাহি। জোয়ানি আসুক। আচ্ছা খুবসুরতি লেড়কী ঢুঁড়ে আনব।

বাচ্চি বলেছিল—রোশনি বহুৎ খুবসুরত নানী!

—রোশনি? ওঃ হাঁ। ভিখ মেঙে ফিরে—উ। না। না। উ আচ্ছা নেহি। খারাপ লেড়কী। বদমাশ লেড়কী। উ না। খবরদার—উ লোকের পাশ মৎ যাও।

তারপর নানীর মুখ চোখ কঠিন হয়ে উঠেছিল—বলেছিল—চোর বদমাশ হারামজাদ বনে যাবি। ডাকু বনে যাবি। খ-ব-র দা-র!

আবার একটু পর মিষ্টকণ্ঠে বলেছিল—সব কোইকে ধরম আছে বাচ্চি—উ লোকের ধরম নাই। দেখ্—হমি কভি চোরী করি নাই। কভি না। জুয়াচুরি ভি নেহি কিয়া। হাঁ—তিন চারটো লেড়কা কুড়িয়ে এনে বেচেছি—উলোককে খিলায়া পিলায়া—ভাত দিয়া কাপড়া দিয়া—ছোটাসে বড়া কিয়া—উসকে দাম নিলম। তুহার পর মায়া পড়ল—তুকে বেচলম না। অধরম হম নেহি কিয়া। তুহার নানা হমারা খসম—উ মুঝে বহুত দুখ দিয়া, হম ভি দিয়া। শোধ হো গিয়া। চোরি অধরম কভি কুছ নেহি কিয়া। রোশনি আওর উসকা বাপকে জাত নেহি ধরম নেহি, ভিখ ভি মাংতা, চোরি ভি করতা। পল্টন এক হারামজাদ হ্যায়। মৎ যাও উ লোকের পাশ। আচ্ছি খুবসুরত লেড়কী হম খুদ আপনা আঁখসে পছন করেগা। তুম জোয়ান হো যাও। হাঁ। বদমাশি ন কর না। হমার সব কুছ তুকে দিব হমি। বিলকুল সব।

এমন মিষ্ট স্বরে কথা নানী আর একদিনও বলে নি। একদিনও না।

কথাগুলো শুনে কেমন হয়ে গিয়েছিল বাচ্চি। সবই ভাল লেগেছিল কিন্তু রোশনি খারাপ এ কথা ভাল লাগে নি। না—না। নানী জানে না। কুছ নেহি জান্তা। রোশনি খারাব নেহি হ্যায়। কভি না।

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নানীর উপর রাগও হয়েছিল। কিন্তু সে রাগ যেন ভিজে কাঠের আগুনের মত—ভাল জ্বলে নি। জ্বলে উঠতে যখনই চেয়েছে তখন নানীর খুব মিষ্টি সুরের ওই কথাগুলি মনে পড়েছে—হমার সব কুছ তুকে দিব হমি। বিলকুল সব!

ভিজে কাঠের আগুনে দাউ দাউ ক'রে পুড়ে যায় না মানুষ কিন্তু তার ধোঁয়ায় চোখে জল আসে। হঠাৎ একসময় তার চোখে সত্যি সত্যিই জল এসেছিল।

নানী তাকে ডেকে বলেছিল—বাচ্চি, আজ তো হমি পাকাইতে পারব না রে। এক কাম কর। পয়সা লে। ওই হোটেল-সনি—রোটী নিয়ে আয়, আর কি আনবি? গোস্? না—আণ্ডা লিয়ে আয়। একঠো আণ্ডা। না। দোঠো আণ্ডা আন—একঠো হমার লিয়ে—দুসরাঠো তু খাবি। আর মোটোসে চারগো রোটী। হাঁ?

ওই রোটী আণ্ডা কিনে ফিরবার পথেই তার দেখা হয়ে গিয়েছিল দবির গণপতের সঙ্গে। সে বেরুচ্ছে—ওরা ঢুকছে। বাচ্চিকে দেখেই বলেছিল—কি রে বে, হোটেলে কাহে বে? অঁা? আরে—ই আণ্ডা রোটী? বাপরে বাপ! জরুর কইকো ট্যাঁক মারছিস তু!

সে রেগে উঠেছিল—কভি না! নানী পয়সা দিলে—

—নানী পয়সা দিলে? শালা! নানী তোকরা আপনা বাবা লাগে—ওহি লিয়ে পয়সা দিলে—।

—ই নানী খাবে। নানী আজ না পাকাইলে ভাত। বোখার হয়েছিল রাতকে।

দবির গালে হাত দিয়ে বলেছিল—তব্ তো নানী জরুর মর যায়গা। জরুর! হোটেলসে রোটী-আণ্ডা পয়সা দিয়ে কিনে খাচ্ছে বুড়ী তো উ আর বাঁচবে না।

বলে হেসে উঠেছিল খুব। গণপৎ বলেছিল—ঠিক আছে—বাচ্চিকে হমরা সাথে লিয়ে লিব—উ শালা বিচ্ছু বহুৎ আচ্ছা সিটি মেরে সিগন্যাল দিতে পারে; শালা সিগন্যাল দেগা—হমলোক হাঁত সাফাই কর দেগা। দে বে—উসকে লিয়ে এখুনি সেলামী দিয়ে দে। এক আণ্ডা হামকে দে, এক আণ্ডা দবিরকে।

হাতও সে বাড়িয়েছিল। কিন্তু বাচ্চি হাত সরিয়ে নিয়ে সামলেছিল ডিম দুটো। এবং বলেছিল—নহি। নহি যানে মাংতা তু লোকের সাথ।

—এ বে শালা বিচ্ছু। নেহি দেগা?

—না—না দেগা।

—খায়েগা? হমলোকের সাথ খায়েগা গোস আণ্ডা পরেঠা আলুদম? সিগরেট পিয়েগা? পকেট থেকে ঝকঝকে একটা মনিব্যাগ বের করেছিল।

বাচ্চি আর নিজেকে সামলাতে পারে নি। আণ্ডা গোস পরেঠা আলুদম খাবে। সিগারেট টানবে। হাতে ঝকঝকে মনিব্যাগ। সে বলেছিল—একঠো আণ্ডা দুটো রোটী লে ভাই। এক আণ্ডা দু রোটি মৎ লেনা। নেহিতো নানী হমাকে পিটবে—আর বেমারী বুড়ী—বহুৎ তকলিফ হোবে।

দবির আবার বলেছিল—ভাগ শালা হারামী। ভাগ। নেহি মাংতা উ আণ্ডা রোটী। ভাগ কুত্তা কাঁহাকা। বলে ওরা হোটেলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। বাচ্চির ক্ষোভের সীমা ছিল না। সে বলেছিল—হমার ভি টাকা আছে রে! হাঁ। এত্তো। নানী হমাকে দিবে। তখুন দেখবি—ই হোটেলমে না, বড় হোটেলমে খায়েগা হম।

বলে সেও বাড়ির দিকে চলতে শুরু করেছিল।

পিছন থেকে গণপৎ তাকে ডেকেছিল—এ বাচ্চি! আবে! আরে, শুন্—শুন্। গণপতের শেষ কথাগুলোর সঙ্গে দবিরের ডাকও সে শুনতে পেয়েছিল—বাচ্চি!

দলের মধ্যে পল্টনের পরই দবিরকে সকলে ভয় করত। দবির একটা কাজ পারে যা পল্টনও পারত না। সে জ্যান্ত মুরগী ধরে দাঁতে ক'রে গলার নালীটা কেটে দিয়ে রক্ত খেতো। তার রক্তাক্ত মুখ বুক দেখে ভয় পেলে সে পরম কৌতুকে রক্তে-লাল জিভ দাঁত বের ক'রে হা-হা ক'রে হাসত।

বাচ্চি কিন্তু তবুও ফেরে নি। ওদের সঙ্গে থেকে মেলামেশা ক'রে বাচ্চিও নেহাত ভীতু ছিল না। বাচ্চিও একটা মোক্ষম মার জানত। নিজেই আবিষ্কার করেছিল। বয়সে ও মাথায় ছোট বাচ্চি ওই ফিরিঙ্গী আর কৃশ্চানদের ছেলেগুলোর সঙ্গে মারামারির সময় আবিষ্কার করেছিল যে, মাথাও একটা জবরদস্ত হাতিয়ার, যেমন শক্ত তেমনি জোরালো। মাথাটা মহিষেব মত বাগিয়ে যদি পেটে কি বুকে কি মুখে একটা ঢুঁ মারতে পারে তো যেমনি দুশমন হোক না তাকে কায়দা হতেই হবে। দবির পল্টনের সঙ্গে লড়াই তার হয় নি—লড়তে সাহস তার হয় নি কোন দিন—কিন্তু গণপৎ রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে মারামারি হয়েছে—সে লড়েছে। বেশী মার সেই খেয়েছে কিন্তু সব শেষে সুযোগ পেয়ে পেটে ঢুঁ মেরে জিতে গিয়েছে। সেদিন দবিরের ডাকেও সে সাড়া দেয় নি, ওই হাতিয়ারের ' ় সাহসে আর নানী তাকে একদিন টাকা দিয়ে বড়লোক ক'রে দেবে অহংকারে ফেরে নি সে, নানীর কাছেই ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গিয়েছিল। ওই দিনটার ওই লগ্নে উচ্চারণ করা ওই কটা কথা বলার ফলে তার জীবনের এই বিচিত্র ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে গিয়েছিল।

আঃ, ওই দিনটা যদি না-আসত!

নানীর কাছে বসে সে বার বার বলতে চেষ্টা করেছিল—নানী, টাকাগুলো তো তুই আমাকে দিবি বলেছিস। খোদার নাম ভগবানের নাম নিয়ে কসমও খেয়েছিস। তা' টাকাগুলো তুই

এখনি দিয়ে দে আমাকে। আজ এখনই। আমি তোকে খোদার নাম ভগবানের নাম নিয়ে কসম খেয়ে বলছি—তুই যা বলবি তাই শুনব আমি। খুব যতন করব। তোর বোখার হলে বেমার হলে তোর কাছে শুয়ে থাকব, মাথার শিয়রে বসে থাকব, পাহারা দেব —তোয় খসমের ভূতকে কিছুতেই তোর কাছে ঘেঁষতে দেব না।

সঙ্গে সঙ্গে আরও বলতে তার ইচ্ছে হয়েছিল—আর যদি তু টাকা না দিবি তো তোকে ঠিক বলছি—আমি জরুর ভাগব। এমন দূর ভাগব তুই আর পাত্তাই পাবিনে।

এখান থেকে ভেগে একদম হাওড়া টিশন। ওখানে 'লাটফরমমে' সুট ক'রে 'ঘুসে' গিয়ে 'পচ্ছিমওয়ালী' ডাকগাড়ির কোন থাড কিলাসের 'বিরিঞ্চির' তলায় লুকিয়ে শুয়ে থাকব। চলে যাব একদম বম্বই কি দিল্লী কি আজমেঢ় সরীফ। সে গান গেয়ে ভিখ 'মঙে' খাবে। ওই বুড়ো বলেছে—সে নিজেও জানে ভিখ তার বহুৎ মিলবে।

মনে মনে অনেক প্রার্থনা করেছিল কিন্তু কথাটা নানীকে কিছুতেই বলতে পারে নি। কিছুতেই না।

নানী রুটি আণ্ডা খেয়ে খানিকটা বল পেয়ে ইতিমধ্যে আর একরকম—সেই আগের নানী হয়ে আসছিল; প্রথমটা বুঝতে পারে নি, বুঝতে পারলে হঠাৎ নানীর সেই চিরকালের গালাগালিতে। তার পাশে সে একখানা পাখা নিয়ে বসে ছিল —বাতাসই করছিল, কিন্তু এই ভাবনার মধ্যে কখন থেমে গিয়েছিল হাত, খেয়াল ছিল না। হঠাৎ রূঢ় একটা খোঁচার সঙ্গে নানীর জিভের ডগায় লেগে-থাকা সেই "কুত্তিকে বাচ্চা হারামী কাঁহাকা" গাল শুনে এবং আচমকা খোঁচা খেয়ে চমকে উঠে খেয়াল হ'ল। কিসের একটা ডাট দিয়ে তার পাঁজরায় খোঁচা মেরেছিল নানী— সঙ্গে সঙ্গে বের হয়েছিল সেই পুরান নানীর মিঠা বুলি,—এ কুত্তিকে বাচ্চা হারামী কাঁহাকা! ক্যা? কি হইল রে হারামী? কি

ভাবছিস রে শালা? অ্যাঁ? রোশনি? মারে হারামীকে লোহেকা ডাণ্ডা! বিনা ডাণ্ডাসে কুত্তা সিধা নেহি হোতা!'

মাথায় মুহূর্তে রক্ত চড়ে গিয়েছিল তার। ইচ্ছে হয়েছিল পাখার বাঁটটা দিয়ে নানীর মুখে মাথায় ওই মোটা পেটে পিটে তাকে জর্জরিত ক'রে দেয়। কিন্তু নানী যেটা দিয়ে তার পাঁজরায় খোঁচা মেরেছিল সেটা তখনও তার হাতে—সেটা একটা নেপালী কুক্‌রী—তার বালিশের নীচে থাকে।

রাগ তাকে সংবরণ করতে হয়েছিল। ভয়ে।

নানী বলেছিল—শালা হারামী কুত্তির বাচ্চা—কাল রাতসে বলছি হারামী হমাকে যতন কর, খুশী রাখ—হমর সব কুছ তুকে দিব। এহি তেরা যখন—এই সেবা রে হারামী?

সে বাতাস করতে শুরু করেছিল। আর কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল নানীর মুখের দিকে। বাতাসের আরামে চোখ বুজে বুড়ী মাংসের ঢিবির মত পড়ে আছে। বিশ্রী, অত্যন্ত বিশ্রী লাগছে নানীকে। না শুধু বিশ্রী নয় ভয়ঙ্কর লাগছে। ভয় লাগছে বুড়ীকে দেখে।

এঃ মুখখানায় কি সরু সরু চুলের মত লম্বা লম্বা দাগ। হিজিবিজি দাগ না মাকড়সার জালের মত। যেন বুড়ীর মুখের উপর একটা মাকড়সা জাল পেতেছে!

এঃ!

পাখার বাতাসে নানী ঘুমিয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের মধ্যে। তবুও পাখা থামাতে তার সাহস হয়নি। পাখা চালাতে চালাতে হঠাৎ মনে হয়েছিল—এই বার যদি ধাঁ ক'রে 'কুক্‌রী'খানা শিয়র থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে ওই বুঢঢীর গলায় জোর এক কোপ বসিয়ে দেয় তো কেমন হয়!

পরক্ষণেই শিউরে উঠেছিল। বা—প—রে! রক্তে বিলকুল ভেসে যাবে। টকটকে রাঙা খুন!

বা—প—রে! ছটফট করবে নানী। চিল্লাবে! গোঙাবে। ওঃ—বাপ!

বাপ রে! পুলিস আসবে। ধরে নিয়ে যাবে। তামাম মহল্লার লোক তাকে থুক দেবে, তাকে বলবে—খুন করো হারামীকে। কোমর পর্যন্ত গাড়াতে গেড়ে দিয়ে ডালকুত্তাকে খিলাও।

বাপ রে—! খোদা—ভগবান হয়তো মাথার উপর বিজলী হাঁকড়ে দেবে।

হয়তো রাত্রির অন্ধকারে নানীর খসমের মতই নানী তার পিছে পিছে ফিরবে। বাপ রে!

সে পাখাটা রেখে পালিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। সে একটা আশ্চর্য ভয়, নানীর উপর আক্রোশ রাগ ভিজে কাঠের আগুনের মত নিভিয়ে আসতে আসতেও ধোঁয়ায় তার দম বন্ধ ক'রে দিচ্ছিল।

বাইরে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল অশথগাছটার ছায়ায়, একটা দেড়টা বেলা। ঝাঁঝাঁ করছিল রোদ। পাখীগুলো পর্যন্ত ডাকছিল না। সুরতিয়া মাসীর দোরে তালা বন্ধ। যাদ্দু বুড়ো ঘর বন্ধ ক'রে বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। সেই ঢিপসী কসবীটার গলা শোনা যাচ্ছে শুধু। মাতালের মত জড়ানো কথায় গাল দিচ্ছিল রোদকে, গরমকে, সূরয দেওতাকে। সে চুপচাপ ভাবছিল কি করবে? ভয়টা কেটে গিয়ে একটা কেমন উদাস ভাব জেগেছিল মনে। ভাবছিল—যাবে সে পালিয়ে। আজই এই এখনি। বরাবর হাওড়া টিশন। তারপর—দূর মুল্লুক! বম্বই, দিল্লী, নয়তো 'আজমেঢ় সরীফ'। রোশনির ঝাঁকড়াচুলো বুড়ো বলে—যদি কেউ গোয়ালিয়রে মিয়া তানসেনের কবরে গিয়ে মানসিক ক'রে এক বরিষ ফি রোজ চেরাগ বা বাতি দেয় আর যখন কেউ জেগে থাকে না তখন গানা গায় তবে এক বছরের মধ্যেই সে 'বড়াভারী' গানেওলা হয়ে ওঠে। তাই সে যাবে। ওই বেইমানী বুঢ্ঢী থাকুক একা। সে চলে যাবার পর ফের আসুক বোখার—চেঁচাক গলা

ফাটিয়ে বাচ্চিকে ডেকে ; বাচ্চি তখন ট্রেনে চলবে ঝমাঝম ঝমাঝম। আর কোণ থেকে দাঁত বের ক'রে বুঢ্যা নানা দু'হাত বাড়িয়ে গলা টিপে ধরবার জন্যে আসুক এগিয়ে। যাক—বুঢ়ীয়া মরে যাক!

গলি গলি এগিয়ে সে পাড়ার যেটা বড় রাস্তা সেটা পর্যন্ত এসেছিল। বোশেখ মাসের দুপুর—দোকানদানীর ঝাঁপ বন্ধ। ঘরগুলোর দোর বন্ধ; একটা দোকানের ভিতরে গ্রামোফোনে গান হচ্ছিল শুনে সে থমকে দাঁড়াল। গীত হচ্ছিল; শুনতে শুনতে তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মক্স করতে শুরু করলে সে। হঠাৎ সিটি শুনে সে ঘুরে দাঁড়াল। রোশনিদের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে পল্টন। ডাকছিল সে হাতছানি দিয়ে। হাসতে হাসতে হাতছানি দিচ্ছে।

সে মাথা নেড়ে ইশারায় প্রশ্ন করলে—কি?

—শুন্—শুন্।

এগিয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—ক্যা?

—হিঁয়া কি করছিস রে?

—গীত শুনছি।

—চল্।

—কাঁহা?

—চল্ না, রোশনিকে হুঁয়া যায়েগা।

সঙ্গে সঙ্গেই সে পা বাড়িয়েছিল। পল্টনের দোস্তি ভাবটা তার মিষ্টি লেগেছিল। পথে পল্টন বলেছিল—নানীয়া কেমুন আছে? খুব বেমার?

—নহি। আজ রোটী আণ্ডা খেয়ে বিলকুল ঠিক হোয়ে গেলো। দেখ না—হামাকে কেমুন মারলে। একঠো কুকুরী রাখে মাথার কাছে—উরি খাপ দিয়ে—দেখ—পাঁজরা মে—হামারা—ই দেখ।

দাগটা সে দেখিয়েছিল। তারপর বলেছিল—হম তো আজ চলা যায়েগা ভাই। জরুর চলা যায়েগা। নেহি তো উ এক রোজ হমাকে মেরে দিবে জানসে।

বিচিত্র দৃষ্টিতে পল্টন তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কতো টাকা পেলি? নিকাল, দেঁখে!

—টাকা? হাঁ হয়ে গিয়েছিল বাচ্চি।

—নানীর টাকা রে হারামী। উঠায় লিলি তো।

—নেহি। খোদা কসম! ভগবান কসম! দেখ—দেখ—ই দেখ, হামার কাপড়া জামা—বিলকুল দেখ।

নিজে থেকেই সে ঝাড়াপোড়া দিয়ে দেখিয়েছিল। ই দেখ, ই দেখ।

—তব? কেমুন ক'রে যাবি? কাঁহা যাবি?

বাচ্চি বলেছিল নিজের কল্পনার কথা—চলে যাবে—হাওড়া স্টেশন—সেখানে একদিন দু'দিন গানা গেয়ে ভিখ মাঙবে; তারপর যা পাবে তাই নিয়ে—ঘুষে যাবে 'পাটফরমে'। পচ্ছিমওয়ালী গাড়ীর 'বিরিঞ্চির' তলায় শুয়ে লুকিয়ে থাকবে। একেবারে গিয়ে নামবে দিল্লী। সেখান থেকে যাবে আজমেঢ়। সেখান থেকে যাবে গোয়ালিয়র—মিঞা তানসেনের কবরের কাছে থাকবে, দিনে গানা গেয়ে ভিখ মাঙবে, রাত্রে চেরাগ দেবে মিঞার কবরে—আর গানা গাইবে। এক বছরে ওস্তাদ হয়ে যাবে। তখুন আর কোনো দুখ তার থাকবে না।

হেসে ফেলেছিল পল্টন। কিন্তু রোশনি হাসে নি। সে ভুরু কুঁচকে বসেছিল। পল্টন বলেছিল—তু ভারী বুদ্ধু আছিস রে বাচ্চি।

—কাহে?

—আবে, যাবি তো শালা—নানীর টাকাউকা লিয়ে তবে যা।

—উ বুড়ী দিবে না—উ কভি মরবে না।

—না রে হারামী না। দিবে না তো এক রোজ রাতমে টাকা মাট্টি থেকে উঠিয়ে লিয়ে চলে যাবি। পহেলে—দেখে লে—কুন জাগামে গাঢ়া আছে। উসকে বাদ বুড়ীয়ার তামকুলে গাঞ্জা মিলায়ে

দিয়ে দিবি—বুড়ী টানবে—বেহোঁস হয়ে নিদ্ যাবে—তখুন উঠায়ে লিয়ে ভাগবি। হাঁ। তুর ডর লাগবে তো—হামি ভি যাব তুর সাথে। হামাকে একশো টাকা দিবি—আর হোটলে খিলাবি। হামি তুকে টিকট কিনে দিল্লীর গাড়িতে সওয়ারী ক'রে দিব। হাঁ!

অবাক হয়ে সে পল্টনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। পল্টন বলেই গিয়েছিল—টাকা না-উঠিয়ে লিয়ে যাবি তো সবকোই তুকে বুদ্ধু বলবে।

এতক্ষণে সে বলেছিল—উ কভি বলবে না পল্টন কাহা রূপেয়া রাখলে।

—উ বলবে না—ই তো ঠিক বাত। লেকিন তু সন্ধান ক'রে লিবিরে বে! খবরদার—তু ভাগবি না। খবরদার। বুড়ীয়ার খুব যতন কর, বাত শুন। বহুৎ পিয়ার কর। উসকি পিয়ার বনে যা।

এতক্ষণে উৎসাহ পেয়েছিল বাচ্চি। নানীর কথায় আর পল্টনের কথায় এক জায়গায় মিলে গিয়েছিল। সে উৎসাহিত হয়ে বলেছিল—হাঁ—হাঁ—ই বাত—উ ভি বললে ভাই।

—বললে? কি বললে—বাতাও তো।

—বললে—তু হামার যতন কর বাচ্চি—সেবা কর, বাত শুন—হামার টাকা আছে বাচ্চি, হামার কোই নাই, তুকে মানুষ করলম, পাললম—তুকে দিব।

—হাঁ—হাঁ। ঠিক বাত। না দিবে তো তু উঠায়ে লিবি। পিয়ারু বন যা। যতন কর; খুশী কর; আর হুঁসিয়ারিসে নজর রাখ। ঠিক সন্ধান মিলবে। পাতা মিলবে। কতো টাকা আছে কুছু বললে?

—ওনেক—এত্তো—!

—তব ঠিক আছে। মাত ভাগ। রহে যা। শালা—মারবে তো মার খাবি রে বুদ্ধু। টাকা তো মিলবে। কেয়া রোশনি? বোল না তু। তুর বাত শুনবে বাচ্চি।

রোশনি বলেছিল—হাঁ—হাঁ—ই তো ঠিক বাত।

পল্টন বলেছিল—তু হামাকে আউর একশো টাকা দিস, তখুন হামি রোশনিকে ভি দিয়ে দিব।

—খোদা কসম।

—হাঁ। খোদা কসম।

—ভগবান কসম।

—জরুর ভগবান কসম।

—হাঁ, তব হামি থাকলম।

বুকখানা তার ধ্বক ধ্বক ক'রে লাফাতে শুরু করেছিল। মনে মনে সঙ্গে সঙ্গে কত ছবি ফোটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পল্টনকে টাকা দিয়ে—রোশনিকে নিয়ে দিল্লীর গাড়িতে সওয়ারী হয়ে যাবে। গাড়ি চলবে—ঝমাঝম ঝমাঝম। রমারম—রমারম! দিল্লীতে গিয়ে নামবে। লালকিল্লা—জামা মসজিদ, বাপরে বাপ!

পল্টন বের করেছিল—রোটী গোস্ত। বলেছিল—লে বে খা। শালা দবীর গণপৎ—ছোটা আদমী—ছোটা নজর—তুকে খানে নেহি দিয়া। লে, হামার পাশে খা। হাঁ! পাক্কা বাত! তু পাত্তা লাগাবি—বহুত হুঁসিয়ারিসে। এক মহিনা—দো মহিনা—না না এক বরিষ! জরুর মিলেগা এক রোজ! হামাকে বলবি। হমি তুকে গাঞ্জা দিব—তামকুলের স্বাদ মিলাকে—দিয়ে দিবি। বুড়ী বেহোঁস হয়ে যাবে। হমি দরওয়াজাতে ঠকঠক ইসারা দিব, তু কেঁয়াড়ি খুলবি। বাস। হাঁ!

শুনতে শুনতে বাচ্চির মনে হয়েছিল—তার ভিতরে যেন একটা কি খেলে যাচ্ছে। আশ্চর্য কিছু। কাল নানী যখন বলেছিল—তখন যেমন কিছু খেলেছিল, কাল দু পহরে রোশনির কাছে বসে যখন কথা বলেছিল—তখন যেমন কিছু খেলেছিল—তেমনি কিছু, কিন্তু তার থেকে হাজার গুণে চড়া। সব যেন চনচন করে। দুনিয়া যেন হারিয়ে যায়। চোখে পলক পড়ে না। বুকে যেন

হাতুড়ী ঠোকে। ধড় ধড় করে। যত তার অস্বস্তি—তত তার সুখ।

*   *   *   *

ওই তার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। সে পল্টনের পাতা ফাঁদে পা দিলে। ভুল হয়ে গেল। বিলকুল ভুল।

ওই দিনটা যদি না আসত তার জীবনে!

পল্টনের কথায়—নতুন মতলব নিয়ে সে ফিরেছিল নানীর কাছে। যদি না ফিরত! যদি দিনটা না আসত!

সে সেই দিনই ওই রোশনিদের বাড়ি থেকেই খুশিতে নাচতে নাচতে নানীর কাছে ফিরে এসেছিল। যে কাজ সংসারে সকলকে লুকিয়ে করতে হয় সে-কাজের চেয়ে মাতানো কাজ আর হয় না—তার ভাবনাতেও মাতন লাগে মনে। মাতনলাগা মন নিয়ে ফিরছিল বাচ্চি। মনে হচ্ছিল—নানী ঘুমুবে, সে পাংখা চালাবে, নানীর নাক ডাকবে তখন উঠে আস্তে আস্তে মেঝের উপর গোড়ালি ঠুকবে। ঠক্—ঠক্। হঠাৎ শব্দ উঠবে—ঢপ্!

ঠিক এই সময়েই তার নজরে পড়েছিল ডানদিকে ছুটো ছিটেবেড়ার ঘরের মাঝখানে যে জল পড়ার আর মেথর ঢোকার গলি সেই গলির মধ্যে একটা মুরগী বসে আছে একেবারে স্থির হয়ে। বাচ্চি ঠিক বুঝতে পেরেছিল মুরগীটা ওভাবে কেন বসে আছে। মুরগীটা চোরা মুরগী। ও লুকিয়ে ডিম পেড়ে বেড়ায়। এখানে ডিম পেড়ে তার উপর বুক দিয়ে বসে আছে। সে পরম কৌতুক অনুভব করেছিল এবং খুব খুশী হয়েই তাড়া দিয়ে মুরগীটার দিকে ছুটে গিয়েছিল; এই ডিম পাওয়াকে বাচ্চি ভেবেছিল নানীর টাকা পাওয়ার ইঙ্গিত আভাস। কক্ কক্ শব্দ ক'রে মুরগীটা পালিয়েছিল তার তাড়ায়, সে ডিমটা তুলে নিয়ে প্যাণ্টের পকেটে পুরে নিয়ে এক ছুটে এসে হাজির হয়েছিল নানীর ঘরে। নানী তখন ঘরের ভিতর শুয়ে শুয়েই গাল দিচ্ছে বাচ্চিকে।

—বেচে দিব হারামী কুত্তির বাচ্চাকে, হমি বেচে দিব। কোই না লিবে তো বদমাশ কুত্তার মতুন ডাণ্ডা মারকে ভাগায় দিব। শালার বেটা শালা হারামীর বেটা হারামী—

বাচ্চি সে গালাগাল গ্রাহ্য করে নি। সে খুশির আতিশয্যে ভিতরে গিয়ে ডিমটা তার সামনে ধরেছিল—নানী—আণ্ডা। মুরগীকে আণ্ডা। তু খাবি ?

অবাক হয়ে গিয়েছিল নানী। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার গালাগালি। ডিমটার দিকে সে শুধু তাকিয়ে থেকেছিল। ডিম ! তার জন্যে এনেছে বাচ্চি। সে খাবে। পরক্ষণেই সেই কয়েকটা মাত্র সোনার তারা বসানো কালো দাঁত বের ক'রে হেসে বলেছিল—আচ্ছা। হমার লেগে আনলি ?

—হাঁ, একদম তাজা।

—কাঁহাসে মিলল ?

—ওহি গলির অন্দর মুরগীঠো চিল্লাচ্ছিল। হমি শোচলম কি—তুপহর বেলা—কোই নেই বাহারমে—বিল্লী উল্লি মুরগী পাকড়াচ্ছে। গেলম—দেখলম—গলিকে অন্দর মুরগী আণ্ডা দিয়ে উপরমে বসে আছে। হমি উসকে ভাগিয়ে দিয়ে নিয়ে এলম। তাজা আণ্ডা। তু খাবি। এক রোজমে তাগদ্ হোয় যাবে।

পিঠে হাত বুলিয়ে নানী বলেছিল—বৈঠ থোড়া হমার পাশ। আউর নগিজে আয়—হাঁ। তু হমার লেগে আণ্ডা আনলি। তুকে হমি পিয়ার করি।

এর পর সত্যিসত্যিই নানী বাচ্চিকে পিয়ার করত। নানীর পিয়ার করার রকম যেমন সেই রকমে। এতকাল—নয় দশ বছর পরে—এই আশ্চর্য জন্মান্তরে জন হয়ে গত জন্মের কথা মনে করতে গিয়ে সে নিশ্চয় বলতে পারে—রকম যেমনই হোক নানী পিয়ার তাকে করত। তার বিছানাটা ভাল ক'রে দিয়েছিল, তাকে

পায়জামা কামিজ কিনে দিয়েছিল। বিড়ির জন্তে একটা ক'রে পয়সা দিত। মধ্যে মধ্যে জাপটে ধরত তাকে আদর ক'রে। কখনও গানও গাইতে বলত। আবার গালিগালাজও দিত। সেই—আগে যা বলত তাই—হারামী হারামজাদে কুত্তির বাচ্চা কুত্তা। আরও অনেক খারাপ গালাগালি।

বাচ্চিও তার জন্তে বিড়ির দোকান থেকে তামাকের পাতা চেয়ে আনত; বাজারে দু' আনায় ছ আনা আট আনার বাজার আনবার সময় সুযোগ পেলে পাকা আমড়া—দুটো একটা লিচু—সেই বছরেই একদিন একটা আমও তাকে এনে দিয়েছিল। নানীর পা দিনান্তে একবার সে টিপে দিত। আবার ঝগড়ার সময় নানী গালাগাল দিলে সেও সাহস ক'রে গাল দিতে পেরেছিল।

নানী বলত—হারামী।

সেও বলত—তু হারামী।

নানী বলত—কুত্তির বাচ্চা।

সে বলত—বুড্‌ঢী ভঁইষি তু।

নানীকে সে যে গালগুলো দিত সেগুলো সে শিখেছিল তাদের আঙিনার বাসিন্দে সেই মোট্‌কী কসবী মেয়েটার কাছে। সে তাকে শেখাত।

সুরতিয়া চাচী মারামারির পর দুজনকেই বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করত। যদ্দু পাগলা বসে বসে কাশত—ড্যাবড্যাব ক'রে চেয়ে দেখত।

গালাগাল থেকে মধ্যে মধ্যে নানী রেগে উঠত—আগুনের মত—বাচ্চিকে ধরতে পারলে চুলের মুঠো ধরে মারত; চড় কিল মেরেই খুশী হ'ত না—কোন কোন দিন তার মাটির ফুরসীর কাঠের নলটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে পিটত। বাচ্চি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাত; মধ্যে মধ্যে অসহ্য হ'লে আঁচড়ে কামড়ে দিত। নানী বুড়ী হয়েছিল—নইলে তার দেহের কাঠামোর ওজন ছিল—শক্ত এবং ভারী—গায়ে জোরও ছিল অনেক বেশী।

মারামারি লাগলে যাদ্দু রঙওয়ালা উঠে দাঁড়াত এবং উত্তেজিতভাবে হুকুমের সুরে বলত—ছোড়ো। ছোড়ো। ছোড় দো। নানী। বাচ্চি—ফরক হো যাও। মান যাও। তাতেও না ছাড়লে সে ওইখানে দাঁড়িয়েই ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠত—গেয়া—গেয়া! মর গেয়া! এই গেইলো! আয় ভগোয়ান! এ বাপ! প্রতিটি কথার সঙ্গে সে আতঙ্কে চমকে চমকে উঠত।

মোটকী হি হি ক'রে হাসত।

মার খেয়ে মার দিয়ে প্রায়দিনই বাচ্চি পালিয়ে যেত। সেই দিল্লী বম্বই যাবার সংকল্প কিছুক্ষণের জন্যে আবার জাগত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই নানীর কণ্ঠস্বর শোনা যেত—বা—চ্চি। এ—বা—চ্চি!

বাচ্চির মনে পল্টনের কথাটা নতুন ক'রে জাগত পালাবে—কিন্তু আজ মেঝে খুঁড়ে দেখে তবে পালাবে। মধ্যে মধ্যে নানীর তামাকের সঙ্গে গাঁজাও সে খাওয়াত। ওই যাদ্দুর কাছ থেকে—রোশনির ওই বুড়োর কাছ থেকে ছোট ছোট টুকরোর গাঁজা সে যোগাড় করত; লুকিয়ে রেখে দিত। তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে সেজে দিত নানীকে। নানী খুব জোরে জোরে তামাক টানত সে-দিন। এবং খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। সে পা ঠুকে দেখত। কিন্তু পায় নি। নিশানা পায় নি।

রোশনির কাছে তার গতিটা কিন্তু অবাধ হয়েছিল এর পর। পল্টন কিছু বলত না। রোশনি তাকে বলত—হুঁশিয়ার বাচ্চি—মেরি বাঁশুরিয়া, সন্ধান মিলবে তো খবরদার পল্টনকে বলবি না। বলবি তো পল্টন তুকে মেরে ভাগায় দিবে, আর এক রোজ রাতে বুড়ীয়ার ঘরে সিঁদ কেটে সব বার ক'রে লিবে। তুকে হমার পাশে আসতে দিচ্ছে ওহি খবরকে লিয়ে। বহুৎ হুঁশিয়ার, সন্ধান মিলবে তো হমাকে বলবি—হমি মতলব বাতলাব; এক রোজ রাতে বিলকুল উঠায় লেকে তু আর হমি ভাগব। হুঁশিয়ার! হাঁ!

জায়গার নিশানা সে পায় নি। তবে নানীর টাকাগুলো সে দেখেছিল। হঠাৎ একদিন। অনেক রাত্রে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এবং ভিতর ঘরে নানীর সাড়া পেয়ে একটা ফুটোয় চোখ পেতেছিল। ফুটোটা সে আবিষ্কার করেছিল এবং তারপর সরু কাঠি দিয়ে সেটাকে বড় করে নিয়ে একটা কাঠি গুঁজে রাখত। সেই ফুটোয় চোখ রেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ঘরে আলো জেলে নানী তক্তাপোষের উপর বসে আছে। তার কোলের উপর অনেক নোট। অনেক।

অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। দেখছিল। জেগেও ছিল। কিন্তু হঠাৎ নানী আলোটা নিবিয়ে দিয়েছিল। কোথায় যে সে রেখেছিল কিছু বুঝতে পারে নি।

সে-কথা পল্টনকে সে বলেছিল।

পল্টন খুশী হয়ে তাকে খুব খাইয়েছিল—বলেছিল—আর কি। কিল্লা ফতে তো হো গয়া। রাখ নজর রাখ। খুব যতন কর।

যতন সে করত। আরও করতে সুরু করেছিল। করতে করতেই এল আর এক রাত্রি। বাচ্চির মৃত্যু রাত্রি। শীতের বর্ষার দিন। সে দিন বড় দিন।

ওঃ, কি সে দিন! কি ভয়ঙ্কর!

কিন্তু সব দিনের মূল ওই দিনটা।—

সে দিনটা না এলে এ দিনটাও আসত না। ওঃ!

॥ ছয় ॥

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল জনের বুক থেকে। আশ্চর্য ওই দিনটা তার জীবনে। আজকাল খবরের কাগজে প্রত্যেক দিন জ্যোতিষীরা ভিন্ন ভিন্ন রাশির পরের দিনের ভাগ্যফল লিখে দেয়। তার জন্ম তারিখ সন সাল বার মাস কিছুই জানা

নেই। কিন্তু ওই দিনটা তার জীবনে আশ্চর্য। ফাদার শখ ক'রে জ্যোতিষচর্চা করেন। এ পাড়ার অনেকে আসে। বাঙালী হিন্দুও আসে। বিশেষ ক'রে গ্রামোফোন কোম্পানির লোকেদের অনেকে। গাইয়ে বাজিয়ে বেশী। ফাদার তার হাতের রেখা দেখে একটা জন্মকুণ্ডলী তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন—করেছেনও। শুনে শুনে খানিকটা খানিকটা সে বুঝতে পারে। ফাদারের বিচার সব ভুল! সব ভুল! সব ভুল!

তার জন্মকুণ্ডলীতে যে সব গ্রহ আছে তাদের নামই তিনি জানেন না। জনের দুটো জন্ম। একটা জন্মে সে বাচ্চি—অন্য জন্মে সে জন। বাচ্চির জন্মের লগ্নে ছিল নানী। তার বিরোধী ঘরে শত্রু ছিল—শনি রাহু কেতুর মত ছিল—পল্টন দবির গণপৎ রামেশ্বর। আর ছিল আর একটি গ্রহ—ভেনাসের মত—রোশনি।

মনে পড়ছে নিষ্ঠুর গ্রহের চক্রান্ত বাচ্চিকে কবরখানায় জীবন্ত ঠেলে দিয়েছিল। ওঃ! ওঃ! কি সে নিষ্ঠুর স্মৃতি! শীতের বর্ষা। প্রবল বর্ষণ হয়েছিল দিনে—বিকেলবেলা খানিকটা রোদ উঠেছিল অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর আবার মেঘ এসেছিল—আকাশ জুড়ে মেঘ—তার সঙ্গে বাতাস। সন্ধ্যে থেকে রিমিঝিমি বর্ষণ! আর কি শীত! সেই শীতের রাত্রি, যুদ্ধের আমলের কলকাতার রাত্রি। রাস্তার আলোয় ঠুঙি পরানো। জনহীন রাস্তায় ঢাকনি পরানো আলো রিমিঝিমি বৃষ্টির ঝাপসা আবরণের মধ্যে মড়ার চোখের মত দেখাচ্ছিল। তারই মধ্যে অন্ধকার থমথমে গাছে ঢাকা পার্ক স্ট্রীটের কবরখানা। সেই কবরখানায় বাঁচতে এসেছিল বাচ্চি। কবরখানায় কি জীবন্ত মানুষ বাঁচে? বাঁচে না। বাচ্চি মরেছিল! ওঃ!

*　　　*　　　*

জন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। একটা অ-সুখের অস্বস্তি,

একটি নিরুপায় অবস্থার উদ্বেগ তিলে তিলে বেড়ে বেড়ে এতক্ষণে যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছে, অস্থির ক'রে তুলেছে তাকে। অধীর পদক্ষেপে কয়েকবার পায়চারি ক'রে আবার এসে দাঁড়াল সামনের ছাদের টুকরোটার ধারে। আলসের উপর ভর দিয়ে।

সমস্ত শহরটা ঘুমে আচ্ছন্ন—ইট কাঠ পাথরের বাড়িগুলো অন্ধকারের মধ্যে থমথম করছে। আলসে থেকে সরে এসে সে এদিকের ঘর আর রান্নাঘরের দুটো কোণ যেখানে 'এল' অক্ষরের মত মিলেছে মানুষ পার হবার মত ছোট একটা ফাঁক রেখে, সেইখানে এসে দাঁড়াল। কান পেতে সে শুনলে কোন শব্দ কোথাও উঠছে কিনা। খুট খুট ক'রে লনার ক্রাচের শব্দ? না। ফাদারের সিগারের গন্ধ? অথবা অতিসন্তর্পিত ভারী পায়ের শব্দ? না, তাও না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারের যন্ত্রের অতি মৃদু টুং টুং শব্দ? না, তাও না। এতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু একটি শব্দ পেয়েছে। ঘুমন্ত মানুষের নিশ্বাসের শব্দ! গাঢ় লম্বা টানা নিশ্বাস। ফাদারের বোধ হয় মধ্যে মধ্যে নাক ডাকছে। সব ঘুমিয়েছে। লনা ফাদার—সবাই। তারা জানে—নিরূপায় জন—কোথায় যাবে? কি করবে? সেও ক্লান্ত হয়ে এতক্ষণ শুয়ে পড়েছে—সেও ঘুমিয়েছে। নিন্দা সে করবে না ফাদারের। তিনি ভাবেন বস্তির দুঃখ—বস্তির অন্ধকার থেকে এখানে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আলোতে এনেছেন, বাচ্চিকে জন করেছেন, ধর্মহীনকে ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন,—বাচ্চি জন তাতেই উদ্ধার হয়ে গেছে। লনা ভাবে—। লনা কি ভাবে তা সঠিক বোঝে না জন। হ্যাঁ, সে বোঝে না। কখনও মনে হয় সে তাকে অপবিত্র ভাবে। Unclean ভাবে। তাই এ উপেক্ষা। কখনও মনে হয় সে তাকে করুণা করে—ভালোবাসে না। তার আকর্ষণ নেই এ তো নয়; নইলে তার দিকে এগিয়ে যায় কেন? কিন্তু কি ঠাণ্ডা তার স্পর্শ! উত্তাপহীন—আবেগহীন। জনের হাতে উত্তাপ, হৃদয়ে উত্তাপ—

তবু আরও উত্তপ্ত হাতের স্পর্শ—হাতধরার জোরের মধ্যে আবেগ—চোখের দৃষ্টির মধ্যে মদিরতা—নিশ্বাসের স্পর্শের মধ্যে উত্তপ্ত কামনার স্পর্শ চায় সে। তার কিছু নেই লনার মধ্যে। কিছু নেই। কাছে গিয়ে হাত ধ'রে তার মধ্যে এ উত্তাপ সঞ্চারিত করতে চায় সে। কিন্তু লনা হাত ছাড়িয়ে নেয়, আবেগহীন শীতল কণ্ঠে বলে—আমি এর যোগ্য নই জন। আমি পঙ্গু, আমি অক্ষম। না জন—না। সে পিছন ফিরে ক্রাচে ভর দিয়ে চলে যায়—হয়তো তখন তার ওদিকে-ফেরানো চোখের দৃষ্টির মধ্যে থাকে ঘৃণা, হয়তো বা ঘৃণার থেকেও বেশী থাকে ভয়—আতঙ্কের সঙ্গে ঘৃণা একসঙ্গে। তার দৃষ্টিতে জনকে দেখায় ভয়ংকর—দৈত্যের মত। পিছিয়ে আসতে হয় জনকে—অপরাধীর মত।

ফাদার বলেন—লনা মূর্তিমতী পবিত্রতা। ওরই মধ্যেই তিনি মুখে না বলেও প্রকাশ করেন—জন, তুমি আনক্লীন—তুমি অপবিত্র। এটুকু মুখে না-বলে মুখে বলেন—লনার মত পবিত্র হও জন। তোমার কাছ থেকে শুধু এইটুকু—এইটুকু মাত্র চাই। এত সুন্দর তুমি জন—এত সুন্দর গান গাইতে পার জন—এর সঙ্গে তোমার অন্তরকে যদি পবিত্র করতে পার তবে ঈশ্বর এসে তোমার হৃদয়ে আসন পাতবেন।

খুব আদরের সঙ্গে অকপট স্নেহে তার মাথায় হাত রেখে হেসে বলেন—Be good my child! Be a good child. Like Launa.

চেষ্টা কি সে করে নি? করেছে। ফাদার—তুমি তার সাক্ষী, লনা—সেও তার সাক্ষী। আজও লনা স্বীকার করেছে সে কথা। কিন্তু পারে নি। পারে নি। পৃথিবীতে কেউ পারে কি না জন জানে না—হয়তো পারে—কিন্তু জন পারে না। চেষ্টা সে করেছে—পারে নি।

ফাদার, তুমি ঘুমোচ্ছ ; লনা ঘুমোচ্ছে ; হয়তো স্বর্গের স্বপ্ন দেখছ। পবিত্র স্বপ্ন। চাচী যে চাচী সেও ঘুমোচ্ছে। সেও কোন সুন্দর স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সে? তার ঘুম নেই। এই গভীর রাত্রি—এই রাত্রেও সে জেগে আছে। জেগেই সে স্বপ্ন দেখছে। তার চোখের সামনে রোশনি হাসছে।

হঠাৎ জনের মনে পড়ে গেল একটা ঘটনা। ফাদার তাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সাঁওতাল পরগনায়—সেখানকার কৃশ্চান মিশনে তাকে পড়তে দিয়েছিলেন। তাদের বাংলোর পাশের বাংলোতে একজন ইংরেজ পাদ্রী ডাক্তার থাকতেন। তার কম্পাউণ্ডে একটা বড় খাঁচায় তিনি ধরে রেখেছিলেন একটা নেকড়ে বাঘ। গায়ে ডোরাকাটা বড় নেকড়ে। সেটা রাত্রে চীৎকার করত। দিনে করত না—চুপচাপ থাকত কিন্তু রাত্রে চীৎকার করত। দুঃসাহসী জন, সে রাত্রে উঠে তার খাঁচার সামনে দাঁড়াত এক একদিন। ভারি মজা মনে হ'ত। অস্থির অধীর পায়ে খাচাটার এদিক থেকে ওদিক অবিশ্রান্ত ঘুরত। অবিরাম। ফাদার একদিন জেগে উঠে দেখেছিলেন জন বিছানায় নেই। চমকে উঠে তিনি বাইরে এসে তাকে খুঁজে পেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘরে ফিরিয়ে এনে বলেছিলেন—ঘুমোও জন। এই রাত্রির অন্ধকার মানুষের বিশ্রামের জন্য। অন্ধকারে মানুষ ঘুমোয়—জন্তুরা এই সময় জাগে। অন্ধকারের মধ্যেই ওদের স্ফূর্তি।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—জন্তুটা বনের স্বপ্ন দেখছে এই রাত্রের অন্ধকারে। কতদিন রাত্রে যখন সে জেগে থেকেছে—ঘুম কিছুতেই আসে নি—রোশনি হাতছানি দিয়ে ডেকেছে—নানীর কথা মনে হয়েছে—তখন তার এই কথাটা মনে পড়েছে।

ঠিক তাই! ঠিক তাই! কিন্তু কি করবে সে?

করবে। হঠাৎ জনের মনে হ'ল—আজ যা করবার সে ঠিক

করবে। আর নয়। সেদিন—সেই যে দিনটি যদি জীবনে না আসত তবে এমন ক'রে কবরখানায় মরে বাচ্চি থেকে তাকে জন হ'তে হ'ত না। এসেছিল—এসেছিল—কিন্তু যদি সে সেদিন নানীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশনে চলে যেত তা হ'লেও এমন দুর্ভোগ সে ভুগত না। ঠিক তেমনি ভুল আজ আবার সে করবে না। না। আজই সে এখান থেকে চলে যাবে। এই ক'ঘণ্টা আগেও সে যেতে পা বাড়িয়েও যেতে পারে নি; ফিটনের ঘোড়ার পায়ের শব্দে মনে পড়েছে পল্টনকে; ফিরে এসেছে। আবার এসেছে এখানকার খাঁচা থেকে পালাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা। পালাবে সে। ওই আলসে ডিঙিয়ে কার্নিসে নেমে রেনওয়াটার পাইপ ধ'রে সে নীচে নেমে পড়ে অন্ধকার কলকাতার মধ্যে হারিয়ে যাবে—বনের মধ্যে জন্তু যেমন হারিয়ে যায়।

আলসের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালে। নীচে অন্ধকার জমে আছে। গোটা গলিটার মধ্যে ওই বড় রাস্তার মুখে খানিকটা আলোর ছটা এসে পড়েছে—তারপর অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে ভিতরের দিকে থমথম করছে। অন্ধকার গলির মধ্যে সাড়া উঠছে; ইঁদুর ছুঁচো ছুটে বেড়াচ্ছে। একটা কি গোঙাচ্ছে। —ওঁ—। কুকুর পথে শুয়ে আছে—ইঁদুর ছুঁচোর ছুটোছুটিতে বিরক্ত হয়ে শাসাচ্ছে। রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে নামতে গেলে এই অন্ধকার দিকটায় নামতে হবে। এলিয়ট রোডের দিকটায় আলো আছে, মানুষকে চেনা না-গেলেও বোঝা যায় এবং রাস্তাটার উপর পুলিস থাকে। কোন বাড়ির বারান্দায় বসে ঝিমোয়। রাস্তায় হেঁটে গেলে সন্দেহের চোখে তাকাবে নিশ্চয়—কিন্তু বলবে না কিছু বোধ হয়। কেন বলবে? যদি জিজ্ঞাসাও করে—কে? কোথায় যাবে? তারও উত্তর বোধ হয় দেওয়া যাবে। কি দেওয়া যাবে?—ডাক্তারের কাছে। অথবা—টেলিফোন পেলাম আমার আত্মীয়ের খুব অসুখ, সেখানে যাব। তারপর হনহন ক'রে চলে

যাবে। খুব ব্যস্ত ভাবে। কিন্তু তারপর?—তারপর? একমাত্র তার জানা জায়গা পার্ক স্ট্রীটের কবরস্থান। কিন্তু—। শিউরে উঠল সে। ওইখানে বাচ্চি একদিন এসে ম'রে এই নতুন জন জন্ম পেয়েছিল। আবার কবরস্থানে গিয়ে—আজ রাত্রে আবার ম'রে নতুন ক'রে বাচ্চি হবে। কিন্তু রাস্তার দিকে রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে নামতে যদি দেখতে পায় পুলিস তা হ'লে চোর বলে ধরবে। তখন—? শিউরে উঠল সে। না—ওদিকে না—এই গলির দিকেই নামতে হবে। এই অন্ধকারের মধ্যেই নামা ভাল।

আলসের উপর সে চড়তে গেল। কিন্তু একি! এ যে হাত পা কাঁপছে, বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছে! ঘামছে সে। তবুও সে চেষ্টা করলে কিন্তু উঠতে গিয়েও পারলে না, নেমে পড়ল। ওঃ, জন হয়ে জন্মে বাচ্চি জন্মের সেই সাহস সেই বিচিত্র শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। সে আর নেই।

বারো বছরের বাচ্চি সেই শীতের বর্ষণমুখর রাত্রিকালে একা চলে এসেছিল এবং পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকেছিল কবরখানায়। সে কি আজ সে পারে!

* * * *

ওই সর্বনাশা শীতের রাত্রি। বাচ্চির মৃত্যুদিন ছিল সেই বছরের বড়দিনের সময়। বর্ষা নেমেছিল দিনে। ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি হয়েছিল। দুপুরবেলা জল জমেছিল পথে। কলকাতায় তখন বোমার ভয়। ময়দানে গোরা পল্টনের ছড়াছড়ি। বিকেলবেলা রোদ ক'রে আবার সন্ধ্যে হ'তে মেঘ জমেছিল ঘনঘটায়। বাতাস দিচ্ছিল। কনকনে শীতে বাতাস আর রিমিঝিমি বৃষ্টি কাতর ক'রে তুলেছিল পৃথিবীকে। জ্বর হ'লে নানী যেমন কাতর হয়েছিল তেমনি কাতর। তবু তারই মধ্যে তারা—পল্টন দবির গণপৎ রামেশ্বর বাচ্চি এসেছিল ময়দানে বড়দিনের তামাশা দেখতে।

ভোরবেলা উঠেই সে পালিয়েছিল। পল্টন দবির গণপৎ রামেশ্বর ক'দিন আগে থেকেই বড়দিনের গল্প করছিল। গির্জেতে সেদিন খুব সেজেগুজে আসবে কৃশ্চান মেয়েরা, ফিরিঙ্গী মেয়েরা, খাস মেমসায়েবরা। মেট্রোতে চৌরিঙ্গীতে বড় বড় দোকান কাগজের ফুলের মালায় সাজিয়েছে। পল্টনেরা সকালেই বেরুবে শুনেছিল —সেও বেরিয়েছিল। রোশনি আর বুড়োর বেরুবার কথা সব থেকে আগে। গির্জের সামনে রাস্তায় ভালো দেখে জায়গা নেবে, বুড়োর সেদিন সব থেকে ছেঁড়া একটা জামা পরবার কথা— রোশনিরও তাই, কালো রঙের একখানা ছেঁড়া কাপড় পরবে; আগের দিন থেকে মাথায় তেল দেয় নি; বুড়োকে নিয়ে দাঁড়াবে— বুড়ো কাতরে চীৎকার করবে—এয় খোদা! হে ভগোয়ান!

রোশনি শুধু বলবে—সেলাম সাহাব! সেলাম মেমসাব!

দবির গণপৎ পকেট মারবে, চৌরঙ্গী ধর্মতলার মোড় থেকে হগ মার্কেট। পল্টন বসে থাকবে ফিটনের কোচবক্সে, রামেশ্বর বসে থাকবে কর্জন পার্কে, বাচ্চি ঘুরবে—পুলিস পিছু নিলে সিটিও মারবে—বড়দিনও দেখা হবে।

সকালবেলাতেই আকাশে মেঘ ছিল। বাতাসও ছিল। কিন্তু বেলা দশটা হতে-না-হতে ঘনঘোর হ'ল মেঘ—বাতাস কিছুটা থামল —সঙ্গে সঙ্গে নামল বৃষ্টি। সাহেব মেম—কৃশ্চান মেয়ে পুরুষ— কালো মেম কালো সাহেবদের সে কি লাঞ্ছনা আর বেইজ্জতি! শীতের কাল, তার উপর ভালো পোশাক—বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে বৃস্টল হোটেল থেকে লেড্‌ল পর্যন্ত গাড়িবান্দার তলায় ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সির, প্রাইভেট মোটরের চাকায় ছেটানো জলে কাদায় সাহেব মেমের পাতলুন গাউন দাগে দাগে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল।

চীৎকার করছিল—ট্যাক্সি—ট্যাক্সি! এ ফিটন—ফিটন!

কখনও কখনও কাদার ছিটে থেকে বাঁচবার জন্যে পাতলুন গাউন গুটিয়ে বেঁকে চুরে চীৎকার ক'রে উঠছিল—ই—!

বাচ্চি খুব হেসেছিল—হি—হি—হি—হি ক'রে। দবির গণপৎ লাল হয়ে গিয়েছিল, রামেশ্বর কর্জন পার্ক ছেড়ে এসে ভিড়ে মিশে গিয়েছিল। বাচ্চি লেডল কোম্পানি দোকানের বড় বড় দুটো থামের ফাঁকের মধ্যে ঢুকে বসেছিল পরম আরামে। লোকের ভিড়ের মধ্যে এতটুকু গরম লাগে নি। মেমসাহেবদের গায়ের পোশাকের মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে ঢুকছিল। তার সামনেই ছিল একজন মেমসাহেব—খুব মিহি মোজা পরা পা দুখানা তার সামনে। হাত বুলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ভয়ে পারে নি। তবে গায়ের কাছে নাকটা নিয়ে গিয়ে খুব টেনে টেনে নিশ্বাস নিয়ে ওই মিষ্টি গন্ধটা শুঁকেছিল। ভারী মিষ্টি গন্ধ। একটা নেশা লেগেছিল। কোথা দিয়ে যে কেটে গিয়েছিল সারা ওই বর্ষার প্রথম দুপুরটা খেয়াল ছিল না। বারোটা নাগাদ ভিড় কম হয়েছিল। বৃষ্টিও কমেছিল কিছুটা।

দবির গণপৎ রামেশ্বর রাস্তার ওপারে ফিটনের আড্ডার জায়গায় এবার এসে একসঙ্গে জমেছিল। তাদের খুব হাসি। তারা তাকে ডেকেছিল ইশারা করে। তাদের সেদিন পোশাক ছিল ভদ্রলোকের মত। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসেছিল পল্টন তার দাদার ফিটনের সঙ্গে। রোশনি আর বুড়োর পাত্তা মেলে নি। বৃষ্টির মধ্যে ভিক্ষে ছেড়ে বা ভিক্ষে করতে কোথায় গিয়েছিল কেউ জানত না।

দবির গণপৎ রামেশ্বর রোজগার করেছিল—ভাল রোজগার। ওরা ছিল ছুটকো চোর পকেটমার। কোন দলের ছিল না। আসল কাজ ছিল ফৈজু মিয়ার পুরনো মোটর পার্টসের কারবারে মাল যোগান। ফৈজু মিয়ার কেনা ভাঙা গাড়ি ওরাই খুলত, ওরাই ভাঙত—ডাঁই করত। মোটর পার্টস খুলতে ছিল ওস্তাদ। সেই

কাজের ফাঁকে ছিল পিকপকেটের কাজ। তাই দলের একতিয়ার রাখত না। মেমসাহেবদের ব্রোচ পেয়েছিল ছুটো, ছোট মনিব্যাগ মেরেছিল ছুটো। তার সঙ্গে ফাউন্টেন পেন তিনটে। ব্যাগে টাকা মিলেছিল তিরিশটা। পল্টন বাহবা দিয়ে বলেছিল—আজ তো শালা কামাল কর দিয়া। তু লোক আধাসে বেশী লিয়ে লে ভাই। বোরোচ পেন—সব রাখ। উ দিয়ে যা মিলবে—তু লোকের। রূপেয়ার আধাসে এক টাকা বেশী লে। ষোলো টাকা। চার আদমীর চার চার রূপেয়া। আর চৌদা রূপেয়া ফুর্তি। আঁ? হমি দিব ছু'টকা। যোলা হয়ে যাবে। চল—হোটলমে খাব, উসকে বাদ এক ফিটন লিব, চিড়িয়াখানা যাব; বহুৎ খুবসুরৎ জেনানী আসবে। মেমসাবরা রকম রকম পোশাক পিঁধে আসবে, চল্।

বাচ্চি ওদের পিছু নিয়েছিল।

পল্টন বলেছিল—আয় বে শালা—আয়। তোর নানীর রূপেয়ার নিশানা কবে মিলবে শালা তু জানিস। এখুন খেয়ে ফুর্তি তো ক'রে লে। আয়।

বাচ্চি সেদিন বলে ফেলেছিল—নিশানা পায়া নেহি লেকিন বুড়ীয়ার টাকা হমি দেখেছি। গদ্দিপর এই এত্যো লোট লিয়ে গিনছিলো!

—দেখলি—আপনা আঁখসে?

—ভগবানকে কিরিয়া, খোদা কসম—এতনা। বলতে বলতে চোখ ছুটো তার বড় হয়ে উঠেছিল।

—শালা! পল্টন কাকে বলেছিল কথাটা বাচ্চি বুঝতে পারে নি। বোঝবার অবকাশও পায় নি—পরমুহূর্তেই আবার এসেছিল বৃষ্টি এবং পল্টন বলেছিল—পানি গিরছে ফিন, চল্। চল্ একঠো থাট কিলাস গাড়ি লিয়ে লি। ছুকানসে খানা কিনে লি, লিয়ে চল্—চিড়িয়াখানা। বাচ্চি শালা, রোশনি তো হাওয়া হোয়

গেলো, তু শালা গানা লাগা। বোল বোল চিড়িয়া বোল বোল!
কাঁহা গয়ি মেরী প্যারী! লাগা।

চিড়িয়াখানা থেকে ফিরেছিল সন্ধ্যেবেলা। আমোদ খুব হয়েছিল সেদিন। সারাটা দিন কোন কথা কারও কথা মনে পড়ে নি। নানী মারবে সে কথাও না, রোশনি থাকলে আরও আমোদ হ'ত এ কথাও মনে হয় নি। ফিরতে হয়ে গেল সন্ধ্যেবেলা। আলো জ্বলছে। ঠুঙিপরা আলো হলেও মেট্রোর তলায় চৌরিঙ্গীর পাশের বড় বড় হোটেলে অনেক আলো অনেক বাজনা। ওদিকে আকাশে মেঘ আবার ঘন হয়ে এসেছিল। বাতাস দিচ্ছিল এলোমেলো। ঝড়ের বাতাস।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল চিড়িয়াখানা পোঁছেই। ফেরবার সময় হেঁটে সারাটা পথ মাতামাতি করেছিল। গান গেয়েছিল হল্লা করেছিল। গাড়ী-চড়া মেয়েদের দেখে শিস দিয়েছিল। কুৎসিত কথা বলেছিল। চৌরিঙ্গীর ফুটপাথ ধরে আসবার সময় দোকানের জিনিস দেখে কতবার দাঁড়িয়েছিল, পিছন থেকে সাহেব মেম গোরা ভদ্রলোকদের বক দেখিয়েছিল, জিভ কেটে ভেঙিয়েছিল। মোড় ফিরেছিল লিণ্ডসে স্ট্রীটে। হগ মার্কেট পার হয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পড়ে প্রথম মনে পড়েছিল তার নানীর কথা। সারাদিন আজ সে হল্লা ক'রে বেড়িয়েছে। নানী আজ ক্ষেপে আছে। মনে পড়েছিল তার সেই মাকড়সার জাল-আঁকা মোটা মুখখানা। বিল্লীর মত কটা কটা চোখ। আজ রাগে ফুলে উঠবে বুড়ী। হাতে নেবে সেই ফুরসীর কাঠের নলটা। সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে নেমেছিল বৃষ্টি। জোর বৃষ্টি নয়, রিমিঝিমি—কখনও ফিনফিনে ধারায় গাঢ় কুয়াসার মত। লাইটপোস্টে আলোর মাথায় ঠুঙির নীচে মনে হচ্ছিল একখানা সাদা কাপড় যেন মেলে দেওয়া হয়েছে। পথ জনশূন্য। গাড়ি চলছিল। এমন শীতের

রাত্রের বৃষ্টির মধ্যেও অনেক গাড়ি। বড়দিনের বাজার। পল্টনেরা মনের আনন্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা ফিরে দাঁড়িয়ে বাচ্চিকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে ডেকেছিল—এই বাচ্চি!

বাচ্চির সামনে তখন ভাসছিল নানীর ছায়ামূর্তি।

আতঙ্কে সে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নানীর মুখখানা ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে।

নানীর মুখখানায় যেন একটা মাকড়সা সরু সরু দাগের জাল বুনে চলছে দিনের পর দিন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। ওই দাগগুলো তার ভাল ক'রে চোখে পড়েছে—বুড়ীর সেই অসুখের সময় থেকে। সে দিন দিনের বেলা নানী তাকে যখন বাতাস বন্ধ করার জন্য বকেছিল—কুক্‌রির খাপ দিয়ে খোঁচা দিয়েছিল—তখনই। তখনই দেখেছিল—আয় বাপ, মুখের চামড়ায় কি দাগ—ঠিক মাকড়সার জাল–তার নিচে বুড়ীর চোখ দুটো ঠিক যেন মাকড়সা। তেল মাখলে চান করলে দাগগুলো মিলিয়ে থাকে। কিন্তু রাগলেই দাগগুলো বেরিয়ে পড়ে। সেই ভয়ঙ্কর মাকড়সার জালপড়া মুখ নিয়ে বুড়ী আজ দাঁড়িয়ে আছে। তাকে মারবে। হাড় ভেঙে দেবে।

তারা আবার ডেকেছিল—আবে! এই!

—বাচ্চি!

চমক ভেঙেছিল বাচ্চির। সে বলেছিল—যা তু লোক। হমি যাবে না।

পল্টন এগিয়ে এসেছিল—ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি রে? আচ্ছি ছোকরী? কাঁহা রে?

—নেহি।

—তব?

—হম নেহি যায়েগা। যায়েগা তো উ হারামী নানী হমার হাড্ডি তোড় দেগা। নেহি যায়েগা।

দবির গণপৎ রামেশ্বর এরাও এসেছিল কাছে—ওই এক কৌতূহলে। সব শুনে ওরা চুপ থেকেছিল। শুধু গণপৎ প্রশ্ন করেছিল—নেহি যায়েগা—থাকবি কুথা রে—এহি বরখায়! শালা হাওয়া পানি আউর ঠাণ্ডাসে তো মর যাবি।

বাচ্চি বলেছিল—পল্টন বলবে তো রোশনিদের হুঁয়া থাকব।

—শালা বুড়োয়া তুকে খুন ক'রে দিবে।

—নহি। হমি বুড়োয়াকে বলব উদের সাথমে হমি থাকব, গীত গাহে গাহে ভিখ মাঙব। বুড়োয়া হমাকে তো বলছে ই বাত। পল্টন বলেছিল—খবরদার! উ শালা তুকে ভিখমাঙোয়া বানাকে ছেড়ে দিবে। চুষে লিবে শালাকে। আউর—

একবার থেমে তারপর বলেছিল—উ তুকে না খুন করবে তো হমি তুকে খুন করবে।

তারপর আবার বলেছিল—শালা ফিকির ঢুঁড়তা তু। বিলকুল তোর ঝুটা বাত। শালা হুঁয়া তু দিল্লগী করেগা রাতকো!

—খোদা কসম—

—ভাগ শালা—খোদা কসম! মারেগা থাপ্পড়—

—তব হমি দুসরা জাগা যায়েগা।

—যো। জহন্নামমে যো। চল্ বে—চল্।

দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে বলেছিল—এহি লে বে আঠ আন্নি। কুছু কিনে লিয়ে যা নানীর লেগে। ঘুসে যা ঘরে। মারবে দু'চার ঘা। মারনে দে। কাল তুকে এমন চিজ এনে দিব বে—তু বুঢ়ীয়ার খানার সাথ মিশিয়ে দিবি, বুঢ়ীয়া হাঁ হয়ে যাবে। রাতকো হম লোক আসব। তু কেঁয়াড়ী খুলবি; হম লোক ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে— ; হাঁ! ইশারা একটা করেছিল সে। চল্। বাত শুন্।

বাচ্চি তামাক কিনেছিল, কিমাম কিনেছিল নানীর জন্তে।

ঘরের আঙিনায় যখন ফিরেছিল তখন সব ঘরের দোর বন্ধ।

মোটকী কসবীর দোর পর্যন্ত বন্ধ। যাদ্দু যে যাদ্দু সেও সেদিন গান গাচ্ছিল না তার ভাঙা গলায়।

বাচ্চি ঘরের ছাঁদতলায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল ডাকবে কি না! নানী সেই মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসবে; হাতে সেই কাঠের সটকার নল; কিন্তু কোথায় যাবে সে এই রাত্রে! এই শীত এই বর্ষা এই হাওয়া! ভিজে সে গেছেই—পায়জামা কামিজ জলে ভিজে সেঁটে লেগে গিয়েছে—বাতাস লেগে হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কনকন করছে। সারাদিন হল্লা ক'রে ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ।

হঠাৎ বয়েছিল একটা জোর দমকা বাতাস। আর বৃষ্টি এসেছিল জোরে। ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি। সে আর থাকতে পারে নি—দরজায় গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল—নানী—নানী!

ঘর থেকে নানীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছিল—নেহি—নেহি—

সে বলেছিল—মর যায়ব। নানী—মর যাবে হমি।

—যা যা—মর যা। কুত্তা কাঁহাকা—হারামী খানকীকে বাচ্চা—তু মর যা—

সে তবুও জোরে ধাক্কা দিয়েছিল। নানী—নানী! দরওয়াজা তোড় যায়েগা।

তোড়বার আগেই দরজা খুলেছিল আর কাঠের নল হাতে নানী বেরিয়েছিল তার সেই ভয়ংকর মুখ নিয়ে। দরজার মুখ আগলে তার মাথায় মুখে কাঁধে নিষ্ঠুরভাবে কাঠের নলটা দিয়ে মারতে শুরু করেছিল—মর যা—মর যা। ভাগ যা, নেহি ঘুসনে দেগা।

নাকে কপালে কাঠের নলটা পড়ছিল। সে তবুও তাকে ঠেলতে চেষ্ট করেছিল—কিন্তু মোটা নানী অনেক ভারী—তার গায়ে অনেক জোর। সে মুখখানা নীচে ক'রে নাক চোখ বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল—তখন কাঠের নল পড়েছিল মাথায়। অকস্মাৎ সে খুঁজে পেয়েছিল মারের একটা হদিস—জন্তুর মত মাথা দিয়েই সে নানীকে ঢুঁ মারতে শুরু করেছিল—তারও ক্রোধ জ্বলে উঠেছিল

আগুনের মত। প্রথম ঢুঁ মারতেই নানী বলে উঠেছিল—আরে শালা বেইমান তু হমাকে মারছিস—! বলে আবার সে কঠিন জোরে মেরেছিল তার মাথায়—নলটা ভেঙে গিয়েছিল সে আঘাতে। সেও প্রচণ্ড জোরে মেরেছিল ঢুঁ। ঢুঁটা লেগেছিল কোথায় সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু নানী একটা কাতর আর্তনাদ ক'রে কুঁজো হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর সে একটা ভয়ংকর দৃশ্য। নানী বার বার আঁঃ আঁঃ আঁঃ শব্দ ক'রে দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে গোঙাতে শুরু করেছিল।

মুহূর্তে ভয়ে আতঙ্কে বাচ্চি যেন পাথর হয়ে গেল; মন দেহ সব যেন অসাড় পঙ্গু হয়ে গেল। তারপরই হঠাৎ দুরন্ত ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। নানী মরে গেল? মেরে ফেললে সে? কি হবে, ফাঁসী? থরথর ক'রে কেঁপে উঠল সে। পরমুহূর্তেই সে ছুটে পালাবার জন্য পিছন ফিরল। ছুটলও খানিকটা; নানীদের বাড়ি ক'খানার মাঝের উঠানটা পার হয়ে গলির মুখে এসে হঠাৎ থামল। কে যেন থামিয়ে দিলে। নানী মরে গেল; কিন্তু নানীর টাকা। খুঁজে দেখবে না সে? সারারাত ঢুঁড়ে বের করে নিয়ে সে ভাগবে। হাঁ, টাকা নিয়ে ভাগবে। একমুহূর্তে অনেক কথা মনের মধ্যে খেলে গিয়েছিল। রোশনিকে—বুড়ো—পল্টন। অনেক।

আস্তে আস্তে সে ফিরে এসেছিল। বুড়ীর হাতের লণ্ঠনটা দোরগোড়ায় জ্বলছে। সেই আলোয় দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল যে বুড়ী উঠে বসেছে, কোঁতাচ্ছে। আশ্বস্তও হল। বুড়া মরে নি—তার ফাঁসী হবে না। ভাবলে—যাবে কিনা বুড়ীর কাছে। হাত ধরে তুলবে? না। বুড়ী আজ তার জান রাখবে না। হয়তো চীৎকার ক'রে হল্লা করবে, লোক জড়ো করবে; তাদের বলবে—দেখ হারামজাদা কুত্তার বেইমানি। হয়তো বালিশের তলা থেকে তার কুকরীটা বের করে মারবে তাকে। তা হলে কি করবে সে? মন বললে—পালাবে। পালানো ছাড়া কোন কিছু করবার

নেই। কোথায় পালাবে? কোথায়? দারুণ শীতের রাত্রে প্রবল বৃষ্টিতে সে ভিজে গেছে, বাতাসে শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত হিম হয়ে গেছে, কনকন করছে। মনে হচ্ছে মরে যাবে। যাবে সুরতিয়া চাচীর কাছে? যাদ্দুর কাছে? বলবে—একটু কোণে থাকতে দাও নইলে মরে যাব। কিন্তু সেই মুহূর্তে বুড়ীর গলা শোনা গেল—মেরে ফেললে—আমাকে মেরে ফেললে! হা-হা করে চীৎকার করে উঠল।

বর্ষায় ভিজে বাতাসে জর্জর শীতের নিষ্ঠুর রাত্রি তাতে চমকালো না; কেউ সাড়া দেয় নি। প্রতিটি ঘরের দরজা জানলা বন্ধ, মানুষ মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু চমকে উঠল বাচ্চি। বুড়ী আওয়াজ দিয়েছে। একটা আশ্বাসও পেলে সে; বুড়ী মরে যায় নি।

এর পরই বুড়ীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল—তেরা জান লেবে হমি। তারপর অশ্লীল গালাগালি। বাচ্চি সে গালাগাল শুনে ভয়ের মধ্যেও ক্রুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু লজ্জা পায় নি। জন আজ লজ্জা অনুভব করছে।

গালাগালি এগিয়ে আসছিল। আলোর ছটা আঙিনার মধ্যে দুলে বুঝিয়ে দিচ্ছিল সে চলেছে—শুধু চলাই নয় ক্রমশঃ আলোর ছটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে বুঝিয়ে দিয়েছিল—এগিয়ে আসছে। গলির মুখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা করে নি বাচ্চি; সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল।

ছুটে এসে রোশনিদের গলির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল। নীচেটা অন্ধকার। উপরে মধ্যে মধ্যে দুটো জ্বলন্ত কিছু দপ্ দপ্ ক'রে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দুজনে বসে বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে। পল্টন আর রোশনি।

ডাকবে তাদের? ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারে নি। শয়তানের মত রাগী পল্টন—এখন ডাকলে ক্ষেপে উঠে উপর থেকে

লাফ দিয়ে প'ড়ে কোন কথা বলতে না দিয়েই তাকে মারবে। টুঁটি টিপে ধরবে। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মন্থর পদক্ষেপে ফিরে গলি থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। তারপর চলতে শুরু করেছিল। কিন্তু নানীর কণ্ঠস্বর তাদের গলির মুখে শুনে চমকে উঠে আবার ছুটেছিল সে। নানীও আজ বাঘিনীর আক্রোশে তার পিছনে ছুটেছে। পাড়াটায় শোরগোল তুলে সকলকে জাগাবে সে। এ পাড়ায় কোথাও তার স্থান নেই। সে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। ক্যান্টোফার লেন থেকে বেরিয়ে লিন্টন স্ট্রীট ধরে সে ছুটেছিল। একটা বড় বাড়ির গাড়িবারান্দাতে ঢুকতে গিয়ে ঢুকতে পারে নি ; বড় একটা কুকুর হাউ হাউ ক'রে ডেকে উঠেছিল বাড়ির ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে চমকে উঠে সে পালিয়েছিল। তাকে পালাতে দেখে রাস্তার দুটো কুকুর তাড়া করেছিল। পথের খোয়া কুড়িয়ে ছুঁড়েও তাদের নিরস্ত করতে পারে নি। অগত্যা সে ছুটেছিল। পথের খালে গর্তে জল জমে আছে—পিচের উপরও ছিলছিলে জল। বৃষ্টিটা মন্দা হয়ে এসেছে, ফিনফিন ধারায় পড়তে শুরু করেছে আবার। তার সঙ্গে বাতাস। ঠুলিপরানো আলোগুলো বৃষ্টির ঝাপসার মধ্যে মড়ার চোখের মত মনে হচ্ছে। হঠাৎ সামনে পড়েছিল বিজলী কারখানার দক্ষিণে সারকুলার রোডের উপর প্রকাণ্ড কবরখানাটা। হাঁ। এইখানে। মুর্দারা কেউ তার পিছনে লাগবে না, তাড়িয়ে দেবে না। মনে পড়েছিল বড় বড় কয়েকটা ছাদওয়ালা কবর আছে এখানে। সেইখানে—সেইখানে ; সেখানে কেউ আসবে না, কেউ তাড়া দেবে না। চারিদিকে পাঁচিল কিন্তু বাচ্চি জানত পূর্ব-দক্ষিণ কোণটায় একটা ভাঙা জায়গা আছে। সেই দিক দিয়ে দিব্যি সে ঢুকে যেতে পারবে।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ভাঙনটায় উঠতে গিয়ে সে একবার পড়ে গিয়েছিল, যে ইটখানা ধরে উঠতে চেষ্টা করেছিল সেখানা ছেড়ে

গিয়ে মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়েছিল। কিন্তু কতটা লাগল তা অনুভব করবার সময়ও ছিল না। এই শীতের বর্ষারাত্রেও কোথায় কোন মোড় থেকে বা বাড়ির বারান্দা থেকে পুলিস হেঁকে উঠবে। কেউ হয়তো কোনক্রমে দোতলার খুলে যাওয়া জানালা বন্ধ করতে উঠে দেখে গোল তুলবে—চোর! চোর! কাতরাবার সময় নেই। হাত বুলোবার সময় নেই। সে তাড়াতাড়ি উঠে আবার চেষ্টা ক'রে উঠে পড়েছিল ভাঙা জায়গাটায়, নামবার সময় কষ্ট থাকলেও সমস্যা ছিল না। লাফিয়ে মাটিতে পড়ে কয়েক মুহূর্ত উপুড় হয়ে পড়েছিল। কান্না পেয়েছিল। কেঁদেছিল। এবং কেঁদেছিল মা—মা ডেকে।

কিছুক্ষণ পর উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে গিয়ে ছাদ বা ছত্রীওয়ালা একটা কবরের উপর একটা থামে ঠেস দিয়ে বসেছিল।

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি। দারুণ শীতের উপর বৃষ্টি এবং বাতাসের প্রহারে কলকাতা শহরেও যেন মানুষের সাড়া ছিল না। কবর-স্থানটায় অন্ধকার থমথম করছিল, বয়ে যাচ্ছিল শুধু ভিজে বাতাস। ওপাশে ট্রামের বিজলী কারখানায় একটা ওঁ—ওঁ শব্দ উঠছিল। কবরখানাটাকে ঘিরে চারিপাশের রাস্তায় আলোর ছটায় ফিনফিনে বৃষ্টি কুয়াশার মত ঘিরে রয়েছে কবরখানাটাকে। কখনও কখনও এক একখানা মোটর যাচ্ছে। কখনও ফিটনের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। সব মিলিয়ে সে যেন কেমন মনে হচ্ছিল। কেমন যেন। বোঝবার মত সাড় ছিল না তার। সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করছিল—সব যেন এলিয়ে যাচ্ছে। ভিজে কাপড়ের শীতে দেহটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। সে শুয়ে পড়েছিল কবরের উপরেই।

কতক্ষণ পর সে জানে না। তার মনে নেই। আজও মনে করতে পারে না। হঠাৎ সে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে উঠেছিল, সে

আতঙ্ক এত জোরালো যে তার অসাড় দেহে সাড় জাগিয়েছিল। এ কি? কে কাঁদছে! না—। কান্না নয়, গান!

গানের সুর! গান নয়! ওঃ, এ কি সুর? কোথা থেকে উঠছে সুর? মন উত্তর দিয়েছিল। কবর থেকে উঠছে। কবরের ভিতরে মরা মানুষেরা কান্নার সুরে গান গাইছে। মানুষকে ডাকছে। ওঃ! বুকের ভিতর কেমন মোচড় দিয়ে উঠছে। মুচড়ে দিচ্ছে। হা-হা ক'রে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে নয়—কান্না টেনে আনছে। কোন কবর থেকে এই সুর বাজিয়ে যেন কবরের লোকেরা বলছে—আমাদের উঠতে দাও। তোমাদের ভালবাসতে দাও। এই অন্ধকারে এই ভিজে মাটির তলায় থাকতে পারছি না। মনে হ'ল কবরের মুখগুলো যেন খুলে যাচ্ছে; এবং কবরের ভিতর থেকে মরা মানুষেরা মাথা তুলছে—তারা কাঁদছে কিন্তু উঠতে পারছে না। মনে হ'ল তার নীচে যে কবরটা সেটা থেকেও মানুষটা তাকে ঠেলছে। বলছে—কাঁদতে দাও। উঠতে দাও।

ওঃ, কি সুর! কি গান! হা—হা ক'রে কেঁদে উঠল সে। তার সঙ্গে আতঙ্কবিহ্বলতার আর্ত চীৎকার—আঁ—আঁ—আঁ—মিশে গেল। সে লাফ দিয়ে পড়ল কবরটা থেকে। দেহের যন্ত্রণা অসাড়ত্ব সব কোথায় চলে গেল। কবর থেকে প্রেতেরা উঠে তাকে ধরেছে। সে ছুটল। কোথায় কোন্ দিকে? ফটকের দিকেই আঁ—আঁ চীৎকার ক'রে ছুটতে চেষ্টা করল। ছুটতে গিয়ে রাস্তার পাশের কেয়ারির ইটে হুঁচোট খেয়ে উপুড় হয়ে সে পড়ে গেল।

সব অন্ধকার—সব স্তব্ধ—সব হারিয়ে গিয়েছিল।

* * * *

আবার যখনকার কথা মনে পড়ছে তখন তার পাশে একটি কালো মেয়ে; আর ছোট্ট একটি মেয়ে। রোশনি থেকে ছোট; সুন্দর একটি মেয়ে। ঘরদোর সব অচেনা অজানা। কিন্তু সে

বেশীক্ষণের জন্য নয়, অল্পক্ষণ পরেই আবার অন্ধকার। আবার চোখ মেলেছিল—আলোয় ফিরেছিল। এবার দেখেছিল একজন সাহেব লোককে। আর শব্দ উঠছিল খুব মিষ্টি সুরে—টুং—টুং—টুং—টাং। সাহেব ঘরের কোণে রাখা টেবিলের মত একটা কিসে আঙুল দিয়ে ঠুকে শব্দ ওঠাচ্ছিলেন। তার কান মন সে শব্দে জুড়িয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে সে তাকিয়েছিল সেই দিকে। হঠাৎ সাহেব ঘুরে তাকিয়ে তার চোখ চাওয়া দেখে খুব মিষ্টি ক'রে বলেছিলেন—কেমন আছ তুমি?

সে বিহ্বলের মত বলেছিল—অঁা?

—কেমন আছ? ভাল লাগছে?

ঘাড় নেড়ে সে 'হ্যাঁ' জানিয়েছিল।

—কি নাম তোমার?

—বাচ্চি।

—বাচ্চি? ভাল নাম কি?

—অঁা?

—বাড়ি কোথায়? ঠিকানা জান? বাবার নাম কি?

ঘাড় নেড়েছিল সে 'না'। অর্থাৎ নেই—জানে না। বাবা ঠিকানা বাড়ি সব 'না'।

—তবে? কে আছে তোমার?

—নানী।

—নানী?

—না, উ হমর কোই না! আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সে। নানীর কাছে সে যাবে না। নানী মারবে। হয়তো খুন ক'রে ফেলবে। না—না—না।

তারপর বলেছিল সে—পানি—পানি।

ফাদার। ফাদারই তাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন সেদিন রাত্রে।

ওই দুর্যোগের রাত্রে ফাদারের মনে পড়েছিল পুত্রকন্যার মৃত্যু-রাত্রি। দুর্যোগের রাত্রে মনে পড়ে যায়। এখনও যান ফাদার। সেদিনও গিয়েছিলেন। কবরখানার গেটের দারোয়ানেরা এই পাগল মানুষকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। বুড়ো গেটকীপার তাঁর পুত্রকন্যার সমাধি যেদিন হয় সেদিনও এখানে ছিল। কত রাত্রিতে এমনই দুর্যোগের মধ্যে ফাদার বিশ্বাস এসে তাঁর বেহালা নিয়ে ওই বিচিত্র সুর বাজান। ও সুর সুরকার ফাদার বিশ্বাসেরই তৈরী। তিনি বাজিয়ে কাঁদেন—ওরা শুনে কাঁদে। আশ্চর্য সুর। সুরে কান্না!

তিনি বাজাচ্ছিলেন ওই সুর। মনে মনে বলছিলেন—জন—লনা—আমি তোমাদের ভুলি নি। আমি তোমাদের ভুলি নি। আমি তোমাদের ভুলি নি।

এমনি সময়ে একটা আঁ—আঁ চীৎকার ক'রে কবরখানার মধ্য থেকে ছুটে ফটকের দিকে এসেছিল একটি ছেলে। দারোয়ানেরা চমকে উঠেছিল, আতঙ্কিত হয়েছিল, ফাদারও বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ ছেলেটি ঠোক্কর খেয়ে আছড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। ফাদার গেটের রেলিং টপকে ওপারে পড়ে ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে এনেছিলেন। দারোয়ান গেট খুলেছিল, গেটে ঝুলানো আলোর নীচে এসে না কি ফাদার চমকে উঠেছিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিলেন—একটা গাড়ি—নয় ট্যাক্সি—জলদি! শীগ্‌গির আনো। নইলে মরে যাবে!

· ভিজে ভিজে দেহখানা তার বরফের মত ঠাণ্ডা! ঠোঁটের রক্ত কিসে যেন চুষে নিয়েছে। সাদা ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে।

চাচী আরও বলে—ফাদার তার মুখের মধ্যে তাঁর ছেলে জনের আশ্চর্য আদল দেখেছিলেন। চাচী বলে—কবরখানা থেকে গাড়িতে ক'রে বাড়ি এনে তাকে নিজে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কাপড় জামা

বদলে বলেছিলেন—চাচী, আগুন ক'রে আন—আগুন। নইলে বাচ্চাটা বাঁচবে না। জলদি করো চাচী। বহুৎ জলদি।

আগুন ক'রে এনে চাচী দেখেছিল ফাদার নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছেন বাচ্চার মুখের দিকে।

চাচী বলেছিল—কোথা থেকে আনলেন ফাদার ?

ফাদার বলেছিলেন—আশ্চর্য চাচী—বাচ্চা যেন কবর থেকে উঠে এল।

—কবর থেকে ? বাবাসাহেব !

—না—না। কবরখানা থেকে। কিন্তু সে সব কথা থাক—তুমি গরম কাপড় ছেঁড়া দেখে আন—ওর পায়ে হাতে সেঁক দাও। দাও, আমাকে দাও।

ঘণ্টা কয়েক সেঁক দিয়ে হাত পা গরম হয়েছিল, গরম দুধের সঙ্গে ব্রাণ্ডি খাইয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর শরীর গরম হয়েছিল—আর কিছুক্ষণ পর সেঁক দরকার হয় নি—গায়ের তাপ হয়েছিল আগুনের মত। অজ্ঞান ছেলেটা চোখ চেয়েছিল কিন্তু সে চোখ জবাফুলের মত লাল, দৃষ্টি বিহ্বল, অর্থহীন। তারপর চোখ বুজেছিল। চোখ খুলেছিল দেড়মাস পর। পঁয়তাল্লিশ দিন গনা। মধ্যে মধ্যে বস্তির ভাষায় গাল দিত—হারামী! ভঁইষী! বদমাশ নানী! কখনও চেঁচাত—মৎ মারো। নেহিতো হমি তুকে খুন ক'রে দিব। নানী! নানী! কখনও ডাকত—রোশনি—ই—।

চাচী বলে—লনা এসে দাঁড়াত দরজায়। অবাক হয়ে চেয়ে দেখত, শুনত। জিজ্ঞাসা করত—হারামী কি চাচী? ভঁইষী ? নানী কে ?

চাচী তাকে সরিয়ে নিয়ে যেত তার নিজের ঘরে। ফাদার লনার ঘর করে দিয়েছিলেন তার ছেলেবয়স থেকে, তখন সে হাঁটতে পারত না, ঘরখানা কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, খেলনায় ভ'রে দিয়েছিলেন। লনার কথার জবাবে চাচী তাকে বলত—ওসব

কথা জ্বরের ঘোরে বলছে। রোগে বলে মানুষ। ওসব কথা খারাপ কথা, ব্যারামের কথা। তুমি এ ঘরে এসো না। তোমারও অসুখ হবে।

ফাদারকে বলেছিল—এ কোথা থেকে বস্তির খারাপ লোকের একটা পচা বাচ্চা নিয়ে এলেন বাবাসাহেব! যা' তা' খারাপ কথা বলছে। লনা আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল—হারামী কি চাচী? ভুঁইষী কি? ওকে—

ফাদার বলেছিলেন—এ অবস্থায় ওকে কোথায় ফেলে দেব বেটী?

—হাসপাতাল আছে। সেখানে দিন।

—হাসপাতাল? বলেই তিনি অন্যমনস্কভাবেই যেন তাকিয়েছিলেন দেওয়ালের দিকে। তবু বুঝতে পারে নি চাচী। তবু ফাদারের ওই বিচিত্র অন্যমনস্কতায় বিস্মিত হয়ে চুপ ক'রে ছিল। চাচী বলে—আমি মনে মনে রাগ ক'রেই বলতে যাচ্ছিলাম—বাবাসাহেব, তাহ'লে লনাকে নিয়ে আমি নীচের তলায় যাই। ঘরদোর ভাল ক'রে সাফ ক'রে নি। ওষুদ বিষুদ যা ছড়িয়ে দেয় সে সব ছড়িয়ে নি। ওখানে লনা থাকলে ও নিজেই ওপর-তলায় আসতে পারবে না। পায়ের তো জোর নেই—

ফাদার গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বারোবছরের মরা ছেলে জনের ছবির পাশে। কয়েক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে ছবিখানা দেখে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। চাচীর তখন যেন চোখ থেকে একটা পর্দা স'রে গিয়েছিল। সেও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ছবিটার কাছে গিয়ে দেখে চমকে উঠেছিল। —তাই তো! অনেকটা মিল তো! অনেক মিল। নাক চোখ কপাল চিবুক! সব! শুধু এ বাচ্চার রঙটা একটু ফিকে। হ্যাঁ

তারপর আর চাচী কোন কথা বলে নি। শুধু লনাকে সে

নিজে আড়াল ক'রে রাখতে চেয়েছিল। সে যমে মানুষে লড়াই করা রোগ—নিউমোনিয়া।

বিয়াল্লিশ দিন থেকে তার চেতনা ফিরেছিল। মধ্যে মধ্যে চোখ চাইত, অবাক হয়ে সব দেখত। আবার চোখ বুজত। জ্বর ছেড়েছিল পঁয়তাল্লিশ দিনে।

ফাদার দাঁড়িয়ে পিয়ানোর ডালা খুলে টুং টুং শব্দের সুরধ্বনি তুলছিলেন। ফাদার তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেদিন। নাম—কে আছে—কোথায় বাড়ি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

সে বলেছিল—নানী আছে। বাড়ি ওইখানে। নানী তার কেউ নয়। না—উ হমর কোই না। কোই না। তারপর সে চেয়েছিল—পানি—পানি।

ফাদারই জল দিয়েছিলেন তার মুখে। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন—কিছু খাবে? বল কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে—

বাচ্চি বলেছিল—বিড়ি। একঠো বিড়ি। দেগা?

সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন শব্দ উঠেছিল ঘরের দরজায়।

—বিড়ি! চাচী ছিল দরজায় দাঁড়িয়ে, তার হাতে ছিল কাচের বাসন, বিস্ময়ের ঝাঁকিতে তার হাত থেকে উলটে পড়ে গেছে কয়েকটা কাপ। মাথার দিকের জানালার ওপাশে দাঁড়িয়েছিল লনা। বাচ্চি দেখে নি কিন্তু ফাদার দেখেছিলেন। তার মুখে ফুটে উঠেছিল আতঙ্কিত বিস্ময়। সে যেন ভয় পেয়েছিল। ফাদার বলেছিলেন—বিড়ি খেতে নেই। ছোট ছেলে তুমি। তার উপর খুব অসুখ করেছিল তোমার। বিড়ি খেলে আবার অসুখ হবে। কাশি হবে, বুকে ব্যথা হবে।

জানালার ওপাশ থেকে খুব মিষ্টি কণ্ঠস্বরে কেউ বলেছিল—ঈশ্বর রাগ করবেন।

এবার সে চেষ্টা ক'রে ওপাশে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছিল। ধবধবে

সাদা ফ্রক পরা বড় বড় শান্তদৃষ্টি চোখ, সুন্দর মেয়েটিকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একবার মনে পড়েছিল রোশনিকে।

রোশনি থেকে এ অনেক সুন্দর! হ্যাঁ। ভারী সুন্দর।

ফাদার বলেছিলেন—ওর নাম লনা।

লনা! লনা! লনা!

কয়েক মুহূর্ত পর সে হেসে বলেছিল—হমর নাম—বাচ্চি।

সে বলেছিল—তুমি বিড়ি খাও, খারাপ ছেলে তুমি।

ভয় পেয়েছিল বাচ্চি। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ফাদার তার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন—বিড়ি না-খেলেই তুমি ভাল ছেলে হয়ে যাবে।

বাচ্চি অসহায়ভাবে ফাদারের মুখের দিকে তাকিয়েছিল—তাতে ছিল ভয় এবং কাতরতা দুই। তার গায়ে হাত বুলিয়ে ফাদার তাকে বলেছিলেন—এইটে খাও তুমি।

রঙীন কাগজে মোড়া ভারী সুন্দর একটি লজেন্স দিয়েছিলেন। —খাও—খেয়ে দেখ। তারপর তিনি উঠে চলে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন—ঘুমোও। অনেকক্ষণ কথা বলেছ।

লজেন্সটা সত্যিই মিষ্টি। খুব মিষ্টি। এমন লজেন্স সে কখনও খায় নি। কিন্তু বিড়ি—। হঠাৎ কেমন একটা ভয় হয়েছিল তার। পাকা ঘর, সুন্দর আসবাব, নরম বিছানা, এমন সুন্দর গন্ধ—কেমন যেন একটি মিষ্টি গন্ধ চারিদিকে ছড়ানো আছে, সুন্দর গন্ধ, সাবানের গন্ধের মত; তার সঙ্গে ফুলের গন্ধ—টেবিলের উপর ফুল আছে। দেওয়ালে সুন্দর ছবি। অনেক উঁচুতে কৃশ্চানদের গির্জাতে যেমন ছবি থাকে মূর্তি থাকে তেমনি মূর্তি ছবি।

* * * *

তাকালো জন দেওয়ালের দিকে।

আজ তার ঘরেও টাঙানো রয়েছে মাদার মেরীর ছবি,

কোলে তাঁর সেই শিশু যাঁকে ফাদার বলেন অমৃতের সন্তান। ওই টাঙানো রয়েছে ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইষ্ট।

ফাদারের ঘরে আছে, লনার ঘরে আছে। আনন্দেও গিয়ে ওই মূর্তির তলায় হাতজোড় ক'রে দাঁড়ায়, নতজানু হয়, দুঃখেও যায় নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে। সেও করে। কত দিন করে।

আজ কিন্তু করে নি। কয়েকবার ওদিকে তাকিয়েছে সে কিন্তু ও মূর্তি ছবি কোন আকর্ষণে টানে নি তাকে, নিজের মন থেকেও কোনও সাড়া ওঠে নি ; কোনও সাড়া ওঠে নি, কোনও সাড়া না।

আজ কেমন একটা বিদ্বেষ অনুভব করছে। একটা তীব্র ভালো না-লাগা।

সেদিন ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন অস্বস্তি বোধ করেছিল। রোশনিদের আড্ডার অশথগাছটা যেমন প্রথম প্রথম ভয় অস্বস্তি জাগাতো তেমনি! মুহূর্তে মুহূর্তে তিলে তিলে এই অস্বস্তি, এই ভয় তার বাড়ছিল। বিন্দু বিন্দু জল জমার মত। মনে পড়ছিল বস্তি। নানী! নানী মারুক ধরুক যাই করুক—এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। রোশনি ওই লেড়কীর থেকে কালো ময়লা কাপড় পরে কিন্তু তবু তাকে ভালো মনে হয়েছিল। অনেক আপনার। রোশনি কি হাসে! কি তার সরু লম্বা চোখে ঝিকিমিকি চাউনি! এ মেয়ের বড় চোখ কিন্তু কেমন চাউনি! হাসে না। হাসলেও সে হাসি যেন কেমন! এদের কথাবার্তা আরও যেন ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

এখানে সে কেমন ক'রে থাকবে! হঠাৎ প্রাণটা যেন ছাড়োছাড়ো ক'রে উঠেছিল, ভেবেছিল পালিয়ে যাবে। আবেগে উত্তেজনায় সে উঠে বিছানা থেকে নামতে চেয়েছিল কিন্তু পা দুটো যেন অসাড়। দাঁড়াতেই পারে নি। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করেছিল।

কিছুক্ষণ পর সে মেয়েগলায় প্রশ্ন শুনেছিল—কাঁদছ ?

সে মুখ তুলে দেখেছিল চাচীকে। তার হাতে একটা কাঁচের গেলাসে কি খাবার। চাচী বলেছিল—হরলিকস্‌টা খেয়ে নাও। কেঁদো না। খাও।

প্রথমটা ইচ্ছে হয় নি। তারপর খিদের তাড়ায় ইচ্ছে হয়েছিল—খাবার সময় একটি ভারী মিষ্টি গন্ধ আর স্বাদ তার আরও ভাল লেগেছিল। সবটাই খেয়ে নিয়েছিল সে। খাবার সময় ফাদারও এসে ঢুকে দাঁড়িয়েছিলেন। খাওয়া হয়ে গেলে বলেছিলেন—এবার ঘুমোও।

চাচী বলেছিল—কাঁদছিল ও বাবাসাহেব।

—কাঁদছ ? কেন ? কোন যন্ত্রণা হচ্ছে ? তবে কি হচ্ছে ?

সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল শুধু, কি হচ্ছে বলতে পারে নি।

চাচী বলেছিল—হয়তো আপন জনের জন্যে মন কেমন করছে বাবাসাহেব। কি রে বাচ্চা ?

—তোমার আপন জন কে আছে ? এই তো তখন বললে—নানী আমার কেউ না !

সেই নিরুত্তর হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া বাচ্চির কোন উত্তর ছিল ? ছিল না। সে খুঁজে পায় নি।

ফাদার বলেছিলেন—বেশ, বল নানী কোথায় থাকেন। আমি খোঁজ করি। তাঁকে খবর দি।

—না।

আতঙ্ক হয়েছিল তার। এখানকার এই অস্বস্তি এই ভয়ের থেকেও সেখানকার ভয়, সেখানকার কষ্ট, দুঃখ, বে-আরাম, বস্তির থুবড়ে পড়ো পড়ো ঘর, তার অন্ধকার, তার খারাপ গন্ধ, বিস্বাদ খাবার—নানীর দেওয়া সেই এতটুকু জায়গায় শক্ত দুর্গন্ধ বিছানা—নিষ্ঠুর গরম—নানীর গালাগাল ;—মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল

গেলেই নানী বলবে—কি রে কুত্তির বাচ্চা কুত্তা—বেমারি হয়েছে —এখন আমার কাছে এসেছিস? ভাগ্। শালা হারামী বেইমান নিমকহারাম—হমাকে জানে মেরে দিতে চেয়েছিলি,—আবার এসেছিস?

রোশনি পল্টন দবির গণপৎ তার এই চেহারা দেখে হাসবে। বলবে—শালা—রোঁওয়াওঠা কুত্তা বনে গিয়েছিস। দেখ্ দেখ্ বে —শালার মুখ দেখ্। হি—হি—হি—হি—হি—। সে বিশ্রী হাসি আর থামবে না। তাই এই কিছুক্ষণ আগে যে বস্তিতে ফিরে যাবার জন্যে লুকিয়ে সে কেঁদেছিল সেই বস্তিতে যাবার নামে—নানীকে খবর দেবার নামে সে আতঙ্কভরে বলে উঠেছিল—না—না।

নানী যদি এখানে আসে তবে চাচী লনা তাকে আরও বেশী ঘেন্না করবে। নানী এদের তুলনায় অনেক বিশ্রী অনেক খারাপ এ বুঝতে তার কষ্ট হয় নি।

ফাদার কিন্তু তার 'না' কথায় বিস্মিত হয়েছিলেন—বলেছিলেন —কেন বল তো?

উত্তর দেয় নি সে।

—সে তোমার কেউ 'না' বলছ, তবে কিভাবে থাকতে তার কাছে?

তারও উত্তর দেয় নি। ফাদার বলেছিলেন—বল।

—উ হমাকে বহুৎ মারে। দুখ দেতা হ্যায়। খারাব গালি দেয়। বলে—কুত্তির বাচ্চা—কুত্তা—হারামী—শালা—তুকে কুড়িয়ে আনলম বেচনেকো লিয়ে—

বাধা দিয়ে ফাদার বলেছিলেন—বাংলা বুলি তুমি জান না?

—হাঁ জানি। খুব আচ্ছা জানি না। তুমার মতুন।

—তবে বাংলাতে বল। বল তো, নানী তোমাকে কুড়িয়ে এনেছিল বলছ—

—হাঁ, ও বুড়ী চুড়ি 'বিক্রী' করে, বহুৎ জাগা যায়, মা বাপ মরা ছেলিয়া লিয়ে আসে। বস্তিমে—

—না। বল, বস্তিতে।

—বস্তিতে আদমীরা বলে—হামার আগে পাঁচ সাত ছেলিয়া 'পেলে পেলে' বড়া ক'রে বিকে দিয়েছে। কিনবার খরিদ্দার আসে বুড়ীর কাছে। হামাকে বিক্রী করলে না। সুরতিয়া চাচী, যাদ্দ বুড়োয়া বলে—তুর মিঠা চেহারা জন্যে তু বেঁচে গেলি। কিন্তু তুর নসীবে অনেক দুখ আছে।

—তোমার মা বাবাকে মনে পড়ে না?

—বাবাটা আমি দেখি নি। একটি মেয়েলোক—খুব সুন্দর—হাঁ খুব ভালো দেখতে—হাঁ, উকে মনে পড়ছে। খুব সুন্দর ছিল সে। খুব মিষ্টি হাসত। মাথায় ঘোমটা দিত।

ফাদার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলেন। বোধ হয় ভেবেছিলেন। কি ভেবেছিলেন? জন বড় হয়ে মধ্যে মধ্যে ভেবে দেখেছে—তার মনে হয়েছে ভেবেছিলেন বংশের কথা। কারণ মধ্যে মধ্যে চাচী এ কথা বলে তার উপর রাগ ক'রে। ফাদার বলেন—না—না। আমি বেশ বুঝতে পারি ও খারাপ বংশের ছেলে নয় চাচী। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বলেন—তা ছাড়া বংশই বা বড় হবে কেন চাচী? মানুষ সবচেয়ে বড়। জন গুণী ছেলে।

সেই গুণের পরিচয় বাচ্চি সেই দিনই আপনার অজ্ঞাতসারেই দিয়েছিল।

ওই সময়েই সেদিন দুপুরের রেডিয়ো শুরু হয়েছিল। শুরুর যন্ত্রসংগীতের ধ্বনি বাচ্চির কানে আসবামাত্র সে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। ঘোষণার পর গান। কি গান আজ আর মনে নেই জনের। বাচ্চি তখন সুর বুঝত, গানের কথার অর্থ বুঝত না। গানের সঙ্গে আধশোওয়া অবস্থায় বাচ্চি স্থির শান্ত হয়ে গিয়েছিল, চোখ দুটি আর ফাদারের দিকে নিবদ্ধ ছিল না, নিবদ্ধ হয়েছিল

ছাদের দিকে অর্থাৎ উর্ধ্বলোকে এবং তার হাত দুখানি আপনা থেকে যেন খাটের বাজুতে বাজনা বাজিয়ে চলেছিল। সে নিজে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন ছিল না, শুধু অভ্যাসে হয়ে গিয়েছিল। গানের সঙ্গে বাঁধা ওর স্নায়ুতন্ত্রী আপনি বেজে উঠেছিল।

গান থামলে ফাদার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি বাজনা বাজাতে জান, না?

ফাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হয়ে সে একটু হেসে বলেছিল—হাঁ।

—কার কাছে শিখলে? কে শেখালে?

—কোই না! হমি জানি। আপসে পারি।

—তুমি জান? আপনা থেকে পার? হ্যাঁ তাই বটে। তুমি পার। ফাদারের সে মুখচ্ছবি তার আজও মনে আছে। আলোর ছটায় ঝলমল করা মুখচ্ছবি। আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তবলা বাজাতে পার?

—উ হমি বাজাই নি কখুনও।

—বাজাও নি বাজাতে পার। আর কি পার?

—বাঁশি বাজাইতে পারি। আর ওই যে মাটির খেলা সারেঙ্গী মিলে—উ বাজাই। হারমনি বাঁশিভি বাজাই। তুমি গানা করো, হমি বাজাইয়ে দিব। নিজে ভি বহুৎ আচ্ছা গানা পারি।

ফাদার বলেছিলেন—আমি তোমাকে খুব ভাল ক'রে গান শেখাব। শিখবে?

—হাঁ। সে উঠে বসতে চেষ্টা করেছিল উৎসাহে—উত্তেজনায়।

ফাদার খাটের পাশের দিকে এসে তাকে কোলে তুলে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন—দেখ। কত বাজনা দেখ।

অবাক হয়ে গিয়েছিল বাচ্চি। ঘরের চারিটা পাশে—লম্বা টেবিলের উপর কত বাদ্যযন্ত্র সাজানো। চারিটা দেওয়ালে কত যন্ত্র ঝোলানো। তবলা বাঁয়া মৃদঙ্গ মাদল পাখোয়াজ ঢোল—

বাঁশের বাঁশি সে কত! হারমোনিয়ম পিয়নো সেতার এসরাজ বেহালা সারেঙ্গী একতারা দোতারা—তার সঙ্গে মাটির খেলনা সারেঙ্গীও ছিল।

সে বলেছিল—আরে বাপরে বাপ—ই কেত্তো!

ফাদার বলেছিলেন—না। এ কতো! তাই বল। বাংলা বল।

সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। একটু সলজ্জ ছিল সে হাসি। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল—একটা বাঁশের বাঁশি দিবে? বাজাব।

—না। বাঁশিতে এখন বুকে লাগবে তোমার। এইটে নাও। ফাদার তাকে সেই মাটি বাঁশে তৈরী খেলার সারেঙ্গী দিয়েছিলেন।—এইটে বাজাও এখন। ভাল হয়ে ওঠ, সব যন্ত্র বাজাতে শিখবে। গান লেখাপড়া সব শিখবে।

সে সেইটে নিয়ে বাজিয়েছিল—সেই তার প্রিয় গান ক'টি—

সোনেকা দাঁড়পর সোনেকি চিড়িয়া
লোহেকা লায়েন পর লোহেকি গাড়িয়া—

আর—

চিড়িয়া বোল বোল—চিড়িয়া রে—
কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী!

ফাদার বলেছিলেন—বাঃ! সুন্দর বাজাতে পার। আরও কত সুন্দর বাজাতে পারবে শিখলে।

তার বাজনা শুনে চাচী এসে দাঁড়িয়েছিল—তার মুখে এবার ছিল বিস্ময় প্রশংসা। জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিল লনা। এবার তার চোখেও ছিল প্রসন্ন বিস্ময়—সস্নেহ প্রশংসা। মুখে একটি হাসির রেখাও দেখা দিয়েছিল।

গান বাজানো শেষ ক'রে সে লনাকে প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা

নেহি হ্যায় ? কথাটা আধখানা বলে থেমে গিয়ে বাংলায় বলেছিল—ভাল লাগল না ?

লনা ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' জানিয়ে ভারী মিষ্টি একটু হেসেছিল।

সেদিন ওই যন্ত্রটি বুকে করেই সে তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

॥ সাত ॥

ঘুমের মধ্যেই কেমন ক'রে ওই মাটি ও বাঁশের তৈরী বাজনাটা খাট থেকে মেঝেয় পড়ে ভেঙে গিয়েছিল।

সেদিন হয়তো কিছু ইঙ্গিত ছিল ওর মধ্যে। বাচ্চির সেটা বুঝবার শক্তি ছিল না। জন চোখ বন্ধ ক'রে ভাবতে চেষ্টা করলে। কি ছিল ? হ্যাঁ ছিল। ছিল এই যে, ওই যে-যন্ত্রটা বাজিয়ে সে সেদিন বস্তির মানুষ হয়েও এদের সঙ্গে এই ঘরেদোরে, এই আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে মেলাতে পেরেছিল সেটা নেহাতই মাটির—এবং সেটা এমনি ভাবেই ঘুমের মধ্যে ভেঙে যাবে। তাই গেল। গেছে প্রতিদিন—ভেঙেছে—আবার আর একটা কিছু নিয়ে ভুলে থেকেছে। আবার ভেঙেছে। এ দুঃখ নিত্য পেয়ে এসেছে।

ঘুম ভেঙে উঠে যন্ত্রটা খুঁজে পায় নি বুকের উপর। সে আবদেরে ছেলের মতই বলে উঠেছিল—হমার বাজা—হমার—। বলেই তার মনে হয়েছিল—বাংলায় বলতে হবে। বলেছিল—আমার বাজনা—আমার বাজনা! বেশ জোরেই বলেছিল।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল না-দেখা এক বুড়ো, চোখে তার ঘষা কাচের মত কাচের চশমা, তার ভিতর দিয়ে চোখ দুটোকে কি

রকম বড় দেখাচ্ছিল। সে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। বাচ্চি চুপ ক'রে গিয়েছিল ভয় পেয়ে।

গোমেশ! বুড়ো গোমেশ তু'মাসের উপর সে-সময় এখানে ছিল না। চোখের ছানি কাটাতে গিয়েছিল সাঁওতাল পরগনায় বেনাগড়িয়া মিশন হাসপাতালে। সেখানকার এক রেভারেণ্ড ফাদারের বন্ধু। বেনাগড়িয়ার হাসপাতালের চোখের চিকিৎসা ভাল। গোমেশের বিশ্বাস সেখানকার উপর বেশী। অন্ততঃ কৃশ্চান ব'লে আর ফাদারের বন্ধু রেভারেণ্ডের অনুগ্রহে তার বেশী যত্ন হবে এই বিশ্বাসটা তার ছিল দৃঢ়। এবং যুদ্ধের বাজারে কলকাতার হাসপাতালে জায়গা পাওয়া ছিল শক্ত। গোমেশ সেখান থেকে সেই দিনই ফিরেছিল। ফিরে সব শুনেছিল—একবার তার ঘুমের মধ্যে দেখেও গিয়েছিল। আবার বাচ্চির সাড়া পেয়েই এসে দাঁড়িয়েছিল।

এমন চশমাপরা অচেনা লোকটিকে দেখে বাচ্চি চুপ ক'রে গিয়েছিল। ভয় হয়েছিল। কিন্তু গোমেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মেঝে থেকে ভাঙা বাজনাটা তুলে তাকে দেখিয়েছিল—পড়ে ভেঙে গেছে। ঘুমের ঘোরে ফেলেছিলে। একটু হেসেছিল সে।

ভাঙা যন্ত্রটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে সে কেঁদে ফেলেছিল।

—কেঁদো না হে, আবার কিনে দেবে। তারপর বলেছিল—হ্যাঁ তার মত বটে। হ্যাঁ।

সেদিন বাচ্চি কথা বুঝতে পারে নি, পরে বুঝেছে—গোমেশ বলেছিল জনের কথা। চাচী লনা জন—ফাদারের মেয়ে এবং ছেলে লনা জনকে দেখে নি। গোমেশ তাদের মানুষ করেছিল। বাচ্চির মধ্যে জনের চেহারার আদল দেখে সে ফাদারের চেয়েও অভিভূত হয়েছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেছিল কিন্তু তাতে তার তৃপ্তি হয় নি। জাগ্রত অবস্থায় সজাগ চোখ না-দেখে মিল কতটা

ঠিক ধরা যায় নি। দেখতে দেখতে বলেছিল—তার চোখ ছিল কটা। মায়ের মত। এর কালো। সে ছিল—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে চলে গিয়েছিল।

চাচী এসেছিল হরলিক্স নিয়ে।—খাও।

—আঁ?

—খাও। খেয়ে নাও।

কোলের ভাঙা যন্ত্রটা নাড়তে নাড়তেই সে কোন রকমে খেয়ে চুপ ক'রে বসেছিল।—ভেঙে গেল! ভেঙে গেল জানালার ওপাশ থেকে মিষ্টি কণ্ঠে বলেছিল—এটা নেবে?

লনা তার হারমোনিকা বাঁশিটা বাড়িয়ে ধরেছিল। তার মুখ আবার উজ্জ্বল হয়েছিল।—তুমি খুব ভালো মিস্। তুমি খুব ভালো। হাত বাড়িয়ে পায় নি। চাচী কিন্তু মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেটা নিয়ে নিয়েছিল—বলেছিল—না। লনা—আবার এখুনি তুমি কাঁদবে। ওকে ফাদার এনে দেবেন। না। তুমি বড় বাউণ্ডুলে মেয়ে লনা। তাকে চাচী বলেছিল—তোমাকে কিনে দেবেন বাবাসাহেব। কেঁদো না। এটা লনার। এ নিতে নেই। বলে সে চলে গিয়েছিল।

সে কেমন হয়ে গিয়েছিল।

লনা ওপাশ থেকে বলেছিল—আমি কাঁদতাম না। সত্যি কাঁদতাম না।

বাচ্চি কাঁদো-কাঁদো হয়েও কাঁদতে পারে নি; ভয় করেছিল। এরা তার কেউ নয়! কেউ নয়! সুন্দর মেয়েটি শুধু ভালো। হ্যাঁ ভালো। সেও তার দিকে কেমন দুঃখী দুঃখী ভাবে তাকিয়েছিল। কিন্তু তাও সে থাকতে পায় নি। চাচী ওঘরে গিয়ে তার হাত ধ'রে বলেছিল—ডাক্তার কি বলেছে। কাছে খুব যেয়ো না। নিমোনিয়া হয়েছিল ওর। সরে এস।

জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে আবার তার মনে হয়েছিল—এখানে সে থাকতে পারবে না, পারবে না—পারবে না। মনে পড়েছিল নানীকে। নানীর ঘর। রোশনিদের আড্ডা। বিড়ি খাওয়া, গল্প করা। দুপুরে সেই বসে বসে হাসা, দিল্লগী করা। পল্টনদের সঙ্গে ধরমতলা পর্যন্ত তোলপাড় করা। ওঃ, সে কি মজা—কি আনন্দ!

চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে আবার সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কতক্ষণ পর তার ঘুম ভেঙেছিল কারুর হাউ হাউ কান্নার আওয়াজে। ভয় পেয়েছিল সে। এখানকার প্রতিটি উচ্চ শব্দে সে চমকে উঠছিল। মনে হচ্ছিল তাকেই যেন শাসাচ্ছে।

সেদিনের ওই কান্নার শব্দ সত্যিই তাকে শাসাচ্ছিল। কাঁদছিল গোমেশ। হাউ হাউ ক'রে কেঁদে বলছিল—না—না। তাকে এমন করে মুছে দিয়ো না বাবাসাহেব। না—। আমি দিতে দেব না। তার হারমোনিকা বাঁশি আমি দেব না। তুমি ওকে কিনে দিয়ো। কোথা থেকে কাকে, একটা বস্তির বাচ্চাকে কুড়িয়ে আনলে তুমি—! তাকে তুমি জনের জিনিস দেবে? না—না—না।

বুকের ভিতরটা তার ধ্বক ধ্বক ক'রে মাথা ঠুকতে শুরু করেছিল।

তাকে বলছে। তাকে! মনে পড়েছিল বস্তি। সেখানে নানী কতদিন তাড়িয়ে দিয়েছে, সে মারামারি ক'রে পালিয়েছে, ব'সে থেকেছে রেললাইনের ধারে, কারুর দাওয়ায়, ঘুরেছে পথে পথে; সব জায়গাটাই যেন ঘর ছিল; কোনদিন বুক এমন ধ্বক ধ্বক করে নি। সেদিন কবরখানাতেও করে নি।

উপুড় হয়ে সে শুয়ে পড়েছিল। মুখ গুঁজে শুয়ে ভাবছিল—সে পালিয়ে যাবে। রাত্রে সকলে ঘুমুলে সে পালিয়ে যাবে।

ফাদার এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার কাছে। ডেকেছিলেন—জন! বাচ্চি!

সাড়া দেয় নি সে। ঘুমের ভান ক'রে পড়ে ছিল। তিনি তার কপালে হাত দিয়ে দেখে—টেবিলের উপর কি একটা রেখে চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় আলো নিভিয়ে নীল আলোটা জ্বেলে দিয়েছিলেন। তিনি চলে গেলে সে চোখ মেলেছিল। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে জিনিসটা নিয়ে দেখেছিল সেটা কি? হারমোনিকা বাঁশি। কিন্তু সে তার ভাল লাগে নি। রেখে দিয়ে ভেবেছিল বস্তির কথা। ভারী ভাল লাগে তার সেখানে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে নি। চোখ মেললেই চোখে পড়ছিল দেওয়ালের গায়ে ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইষ্টের মূর্তি। ভয় লাগছিল তার। উঃ—কি কান্না কান্না মুখ! উঃ—হাতে পায়ে পেরেক পোতা! উঃ! এমনি ক'রে তাকে যদি—

রাত্রির অন্ধকারকে তার ভয় ছিল না। অনেক রাত্রির কলকাতার খাঁ-খাঁ-করা পথকেও তার ভয় ছিল না। তার শরীরে বল ছিল না। দাঁড়াতে সে পারছিল না।

কি করবে সে? সকলে ঘুমুচ্ছিল; ঠিক আজকের মত। হ্যাঁ, ঠিক আজকের মত। একলা জেগে ছিল সে। এখানে কিছুতে ঘুম আসছিল না। কান্না পাচ্ছিল।—নানী! নানী!

শেষ টেনে নিয়েছিল বাঁশিটা। হারমোনিকা বাঁশি। এমন হারমোনিকা বাঁশি সে কখনও বাজায় নি। সস্তা আট আনা দশ আনার বাঁশি গণপতের আছে। বাজিয়েছে সে। এ বাঁশি সে বাজাতে দেখেছে ফিরিঙ্গী ছোকরাদের। বাজিয়ে মার্চ করে। এমনিও বাজায়।

সে ফুঁ দিতে গিয়েছিল। কিন্তু দেয় নি। ভয় হয়েছিল—জেগে উঠবে। বকবে। হ্যাঁ ওই বুড়ো বকবে। ওই চাচী কেড়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাঁশিটাই তার মন হালকা করেছিল। ভাবতে

শুরু করেছিল—গায়ে একটু বল পেলেই সে রাত্রে বাঁশিটা নিয়ে পালাবে। একেবারে গিয়ে উঠবে রোশনিদের আড্ডায়। সেখানে নিঝুম রাত্রে সেই মুখ-থুবড়ে-পড়া বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশিটা বাজাতে শুরু করবে—রোশনি জেগে উঠবে—পল্টনও। পল্টন মারতে এসেও মারবে না। বলবে—এবে শালা বাচ্চি—তু ?—

রোশনি বলবে—আ, মেরি বাঁশুরিয়া! কেয়া বাঁশরী—আঃ—হাঃ!

বাচ্চি বাঁশিতে একটা নতুন গানের সুর বাজিয়ে দেবে। এখানে কয়েকদিন থাকলে ঠিক তুলে নেবে।

* * * *

ভোরবেলা উঠে ফাদার তাঁর বেহালা বাজান। সেই সুর। কবরখানায় সেদিন রাত্রে তিনি যে সুর বাজিয়েছিলেন। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভেঙে যায়—তার কান্না পায়। ঘুম না-ভাঙলেও ঘুমের মধ্যেই কাঁদতে হয়। সে কেঁদেছে। ছেলেবেলা সে কেঁদেছে।

পরের দিন সে কেঁদেছিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুম ভেঙেছিল। সারাটা দিন সে বাঁশিটা নাড়াচাড়া করেছিল—মনে মনে সুরটা তুলতে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু বাঁশিতে বাজিয়ে তুলতে সাহস করে নি।

সকালবেলায় গোমেশ এসে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে বাঁশিটা দেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ চশমাপরা চোখ দুটো উপরের দিকে তুলে চলে গিয়েছিল। তার ভয় হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর চাচী তাকে বিস্কুট আর হরলিক্স খাইয়ে বলেছিল শোন। ওই বাঁশিটা তুমি রেখে দাও, বাজিয়ো না। অবাকও হয়েছিল সে, ভয়ও পেয়েছিল, নিরুত্তর হয়ে চাচীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। চাচী বলেছিল—তোমাকে নতুন বাঁশি এনে দেবে গোমেশ দাদা। ওটা তখন তাকে দিয়ে দিয়ো। হাঁ।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফাদার এসে মিষ্টি হেসে বলেছিলেন—কাল রাত্রে তোমাকে এই বাঁশিটা দিয়েছি। আজ তোমাকে একটা নতুন বাজনা এনে দেব। তারের বাজনা। হাতে বাজাবে। এখন তোমার শরীর ভাল না—বাঁশি এখন বাজাতে নেই—ভাল নয়। তবে একবার আধবার বাজাতে পার। বাজিয়েছ ওটা?

সে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না—বাজায় নি।

—একবার বাজাও। দেখ বাজাতে পার কি না।

সভয়ে সে বলেছিল—উ গোস্যা—

—না—না। বাধা দিয়ে ফাদার বলেছিলেন—না—না। বাংলাতে বল। বাংলাতে।

সে লজ্জিত হয়েছিল—সংকুচিত হয়েছিল।—উ রাগ কোরবে না?

—গোমেশ! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি। তারপর বলেছিলেন—আচ্ছা—ওটা বাজিয়ো না। থাক। ব'লে ও-ঘরে গিয়ে একটা সুন্দর পিতলের বাঁশি এনে দিয়েছিলেন। সে খুব খুশী হয়ে উঠেছিল—বলেছিল—ই হম—। থেমে গিয়ে আবার বলেছিল—ই আমি বাজাতে পারি। ই খুব ভালো বাঁশি আছে।

—বাজাও।

সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, কি বাজাব?

তিনি বুঝেছিলেন—বলেছিলেন—যা জান, বাজাও।

সে বাজাতে চেষ্টা করেছিল—ফাদার যে সুর সেই কবরখানায় বাজিয়েছিলেন—যা আজ ভোরে সন্ত বাজিয়েছেন সেই সুর। অত্যন্ত জটিল—অত্যন্ত কঠিন। তবু সে প্রথম কলির খানিকটা নির্ভুলভাবে বাজিয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ে উত্তেজনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন ফাদার। সে থেমে গিয়েছিল ভয়ে। তিনি বলেছিলেন—বাজাও, বাজাও।

—আর পারি না। শিখতে পারলম না।

—পারবে। তুমি পারবে। শুনলে পারবে। তোমাকে শেখাব। আমি শিখিয়ে দেব। কিন্তু আর বাঁশি বাজিয়ো না—তুমি হাঁপাচ্ছ।

মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এতক্ষণে তার চোখে পড়েছিল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে লনা। তার দৃষ্টিতে হাসি—ঠোঁট দুটিও হাসিতে ঈষৎ বিকশিত।

সেও হেসেছিল। হঠাৎ বাচ্চির মনে পড়েছিল রোশনিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে রোশনিকে যা বলে খুশী হ'ত—রোশনি মুচকি হেসে একটা চোখ টিপে কথাহীন উত্তর দিতে যাতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত সেই কথা বলেছিল ঠিক তেমনি ভঙ্গি ক'রে। আজ জন ঠিক সেই কথাগুলো মনে মনে আওড়াতে পারে কিন্তু এই অন্ধকার ঘরে একলা বসে নিজেকেও শুনিয়ে মুখ ফুটে বলতে পারে না। তার অর্থ হয়তো বলা যায়। যার অর্থ—তোর চোখের 'রোশনি' আমার কলিজায় বিদ্যুচ্চমকের মত চমক দিয়ে যায়। আমি ঝলসে গেলাম—মরেই গিয়েছি। এ সব পল্টন দবির গণপতের কথা নয়, সে এসব শিখেছিল তাদের উঠোনের সেই দেহব্যবসায়িনী বীভৎস মেয়েটার ঘরের কথাবার্তা শুনে। কথার শেষে যে ভঙ্গিটা করেছিল সেটা শিখেছিল পল্টনদের কাছে—ঠোঁট দুটো শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে জড়ো ক'রে শিসটা ভিতরে টেনে নিত। এটা পল্টনরা করত কৃশ্চান আর ফিরিঙ্গী বা ভদ্রঘরের বেণীদোলানো ইস্কুলের মেয়েদের দেখে।

মুহূর্তে অঘটন ঘটে গিয়েছিল। দুরন্ত ভয়ে আর্তনাদের মত চীৎকার ক'রে লনা চাচীকে ডেকেছিল—চাচী! এবং ঘরের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

এর পর সে থরথর ক'রে কাঁপতে শুরু করেছিল ভয়ে—আতঙ্কে। এবং মনে মনে বার বার ডেকেছিল—নানী—নানী। রোশনি—

রোশনি! পল্টন! পল্টনকেও তার পরিত্রাতা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তার নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। পালাতে সে পারে নি।

অঘটন ঘটেছিল।

চাচী গোমেশ এসে তাকে কটু কথা বলতে বাকী রাখে নি। সে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে শুধু কেঁদেছিল। নানী—নানী—নানী রে! রোশনি—রোশনি! হমাকে নিয়ে যা। নিয়ে যা।

গোমেশ বার বার বলেছিল—বল্ তোর নানী কোথা থাকে? কোথায়? এই! এই ছেলে! এই লড়কা! এ—ই!

সে উত্তর দিতে পারে নি। বোবা হয়ে গিয়েছিল—কাঠের মত অসাড় হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক পর ফাদার এসেছিলেন ফিরে। তিনি নতুন তারের যন্ত্র হারমোনিকা বাঁশি আর পোশাক কিনে এনেছিলেন। কিন্তু সে উঠে বসতে পারে নি—মুখ তুলতে ভয় হয়েছিল। দারুণ ভয়।

ওদিকে গোমেশ চাচী চীৎকার করছিল।

—ও পাপ, সাক্ষাৎ পাপ! ওকে ঘরে ঢুকিয়ো না বাবাসাহেব, সর্বনাশ হবে। এমন সর্বনাশ হবে যে সেদিন মাথায় সাপে কামড়ানোর মত হবে—তাগা বাঁধবার জায়গা থাকবে না।

চুপ ক'রে শুনে গিয়েছিলেন ফাদার। তাকেও কিছু বলেন নি, ওদেরও কিছু না। সেদিন বিকেলেও তাঁর কাজে বের হন নি। শুধু খাবার সময় তাকে নিজে এসে খাইয়ে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যেবেলা এসে তার পাশে বসে ডেকেছিলেন—শোন। ওঠ, উঠে বস। ওঠ।

সে উঠেছিল, কিন্তু ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিল। ফাদার বলেছিলেন—কেঁদো না।

সে আরও বেশী ক'রে কেঁদে উঠে বলেছিল—আর হমি উ বাত—

—না। বল—আর আমি—, বল।

—উ সব কথা বলব না। কখনও বলব না।

—হ্যাঁ। বলতে নেই। পাপ হয়। ঈশ্বর রাগ করেন। ঈশ্বরকে ডাক, বল—, বল আমার সঙ্গে, বল—হে ঈশ্বর—হে করুণাময়, আমাকে করুণা কর। আমাকে ভাল করে দাও।

গোমেশ এসে প্রতিবাদ ক'রে বলেছিল—মায়ায় ডুবে সর্বনাশ করছেন বাবাসাহেব!

—গোমেশ!

—না। আপনি বুঝতে পারছেন না। বাবাসাহেব—নিম চিরকাল তেতো। ঘি দিয়ে ভাজলেও চিনি মেশালেও মিষ্টি হয় না।

হেসে ফাদার বলেছিলেন—হয় গোমেশ। ঈশ্বর দয়া করলে হয়। লর্ড ক্রাইস্ট স্পর্শ করেছিলেন একজন কুষ্ঠরোগীকে—

—ও তার চেয়েও পাপী। ঈশ্বর ওকে দয়া করবেন না।

—করবেন। ওর একটা গুণ তোমরা দেখেও দেখছ না। ওর গানের ক্ষমতা। ঈশ্বর ওকে ওই ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। দুর্লভ শক্তি। ওই গানেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে ওকে দয়া করবেন। ওরই মধ্যে ওর ভালো হবার শক্তি আছে, বাসনা আছে।

গোমেশ কিছু না-বলে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

ফাদার তার উপর বেশী ক'রে ঝুঁকে পড়লেন। প্রায় সব সময় তার কাছে থাকতেন। তাকে যে যন্ত্রটা দিয়েছিলেন সেটা বাজিয়ে তাকে শেখাতেন। বাচ্চি সেটা পারত। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শিখে নিত। খুব খুশী হতেন। রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতেন। তখন জানত না, এখন সে বলতে পারে সে সব রবীন্দ্রনাথের গান। গানগুলির মানে বুঝিয়ে দিতেন। বলতেন—সঙ্গে সঙ্গে গাও। জোরে গেয়ো না—আস্তে আস্তে গাও। সে গাইত। একটা গান রোজ বাজিয়ে শোনাতেন—বোঝাতেন—তাকে গাওয়াতেন।

আজ আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও!

আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।

গানের মানে বুঝিয়ে দিলেও সে বুঝতে পারত না, কিন্তু ওর সুর থেকে একটা কি অনুভব করত। মন কেমন হয়ে যেত। চুপ ক'রে বসে থাকত। ধীরে ধীরে ক'দিনের মধ্যে আবার কাছে এগিয়ে আসছিল লনা চাচী; গোমেশও মধ্যে মধ্যে এসে ছাদের ওপাশটায় দাঁড়াত।

*　　*　　*

হঠাৎ একদিন এল পুলিস। সঙ্গে ফৈজু মিয়া।

ফাদার বাড়িতে ছিলেন না। তিনি গিয়েছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানির রিহারস্থালে। বাচ্চি বলে ছেলেকে তারা চায়।

ফৈজু মিয়া তাকে সনাক্ত করেছিল—এই বাচ্চি! আরে শয়তান!

চীৎকার ক'রে উঠেছিল সে—না—না। হুমি যাব না। হুমি যাব না।

গোমেশ অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চাচী এসে বলেছিল—বাবাসাহেব আসুন দারোগাসাহেব। তিনি ওকে কবরখানা থেকে কুড়িয়ে এনেছেন বড়দিনের জলঝড়ের রাত্রে। ওঁর মরা ছেলের মত দেখতে। এর রঙ একটু ফরসা, নইলে ভাবতাম সেই ছেলে কবর থেকে উঠে এসেছে। যমের সঙ্গে লড়াই ক'রে বাঁচিয়েছেন একে। উনি ছেলের মত ভালবাসেন।

দারোগা ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন—কবে এনেছিলেন?

—বড়দিনের জল-ঝড়ের রাত্রে। অজ্ঞান মড়ার মত অবস্থা জলে ভিজে। রাত্রি থেকেই জ্বর—নিউমোনিয়া। বহু কষ্টে বাঁচিয়েছেন।

—তাঁকে টেলিফোনে খবর দাও। জরুরী দরকার।

কোন একটা বাড়ি থেকে গোমেশ খবর দিয়েছিল ফাদারকে। চাচী তার পাশে বসে তাকে সাহস দিয়ে বলেছিল—ভয় কি, ফাদার এখুনি আসছেন।

লনা এসে দাঁড়িয়েছিল জানালায়। তার বুকটা মানুষের হাতে ধরা-পড়া পাখীর বাচ্চার মত লাফিয়েছিল সারাক্ষণ।

ফৈজু মিয়া সামনে দাঁড়িয়েছিল। বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল—কে ছিল তোর সঙ্গে আর?

নির্বোধের মত উত্তরে প্রশ্ন করেছিল—আঁ?

—কৌন কৌন থা রে সাথমে?

সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কোন মতেই বুঝতে পারে নি।

—এক্কেলে ই কাম কিয়া? আঁ?

—আঁ?

—নানীর মাথা পথল মেরে ভাঙলি—তু এক্কেলে ভাঙলি? সাথমে কই নেহি থা?

আঁতকে উঠেছিল বাচ্চি। একটা দুর্বোধ্য অর্ধস্ফুট শব্দ বেরুতে বেরুতে থেমে গিয়েছিল। শব্দও নয়, একটা ধ্বনি মাত্র। বিস্ময় এবং আতঙ্কের ব্যঞ্জনাই ছিল সে ধ্বনিতে।

চাচী চমকে উঠেছিল, গোমেশ চমকে উঠেছিল, লনাও উঠেছিল—সে বোবা পাথর হয়ে গিয়েছিল।

*　　　　*　　　　*

নানীর মাথাটা মুখটা বড় একটা পাথর দিয়ে ছেঁচে দিয়ে তার ঘরদোর তছনছ ক'রে দিয়ে গেছে কে বা কারা। পাড়ার লোকে বলছে—যে করুক যারা করুক বাচ্চি আছে। বাচ্চি তখন থেকেই নেই। যাদ্দু বলেছে—বর্ষা নেমেছিল যে রাত্রে সে রাত্রে বুড়ীয়াকে বাচ্চি মেরে ঘায়েল ক'রে পালিয়েছিল। বর্ষা নেমেছিল—দারুণ ঠাণ্ডা গিরেছিল—ঘরে শুয়ে সে বুড়ীয়ার 'চিল্লানি' শুনেছে কিন্তু ঠাণ্ডার ভয়ে সে ওঠে নি। পরের দিন সারা দিন বুড়ী কাতরে বেড়িয়েছিল যন্ত্রণায় আর গালিগালাজ করেছিল। বাচ্চি উঁকিঝুঁকি মেরেছিল কিন্তু সামনে আসে নি। সুরতিয়া বলেছে পরের দিনের কথা। আগের রাত্রের কোন চীৎকার সে শোনে নি।

সেই দেহব্যবসায়িনীও তাই বলেছে। বুড়ী গাল দিয়েছে বাচ্চিকে সারা দিন, মধ্যে মধ্যে বাচ্চির উঁকিঝুঁকির সাড়ায় কুকরী হাতে বলছে—আও না—সামনে আও! কুত্তির বাচ্চা কুত্তা! আও! কিন্তু বাচ্চি সামনে আসে নি। আড়াল থেকেই পালিয়েছে। তার পরদিন সকালে নানীর ঘরের দরজা খোলা হাঁ-হাঁ করছিল। ভিতরে নানী পড়েছিল; তার মথাটা মুখটা প্রকাণ্ড একটা পাথর দিয়ে আঘাত দিয়ে ছেঁচে দিয়ে গেছে। মেঝেটা খুঁড়েছে ক' জায়গায়; মাথার তলায় একটা চামড়ার বালিশ ফেড়েছে ফাড়া বালিশটার ভিতর একখানা দশটাকার নোট একটা খুচরো টাকা থেকে গিয়েছে। দারোগা বললেন—বুড়ীর টাকা ছিল—সবাই বলছে এবং ওই বালিশটার মধ্যে ছিল, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এবং সন্ধান ওই পলাতক বাচ্চিই দিয়েছে—আর ও তাদের সঙ্গে ছিল এও পুলিসের বিশ্বাস। কিন্তু ফাদার ন্যাথানিয়েল বলছেন—

ফাদার এসে সব শুনে বলেছিলেন—আমি বলছি এ বিশ্বাস আপনাদের ভুল। সেদিন কৃসমাস ডে ২৫শে ডিসেম্বর প্রবল বর্ষার দুর্যোগে আমার মনে পড়েছিল আমার পুত্র-কন্যার মৃত্যুরাত্রি। এমনি দুর্যোগের রাত্রে একসঙ্গে তারা মারা গিয়েছিল। এমন রাত্রে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আমি ছুটে চলে যাই কবরখানায়। তাদের বাজনা বাজিয়ে শুনিয়ে আসি—মরবার দিন সন্ধ্যার সময়ও ডাক্তার পাই নি—তারা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল—তাদের বাজনা শুনিয়েছিলাম। বাজনা শুনতে তারা ভালবাসত। আমি সেই দুর্যোগে গিয়েছিলাম কবরখানায়, ফটকে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছিলাম—হঠাৎ একটা ভয়ার্ত চীৎকার ক'রে ভিতর থেকে ছুটে এসেছিল একটি ছেলে। পথে হুচোট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। আমি ফটক ডিঙিয়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নি। দারোয়ান ফটক খুলে দেয়। ফটকে আলোর নীচে ওর মুখ দেখে

আমি চমকে যাই। অবিকল আমার মরা ছেলে জন। শুধু দারিদ্র্য-মলিন। তফাত আছে। সেদিন কিন্তু চোখে পড়ে নি আমার। জলে ভিজে সর্বাঙ্গ হিম—ঠোঁট দুটো সাদা। আমার মনে একটা অদ্ভুত ভাবের আলোড়ন উঠেছিল। মনে হয়েছিল—। থাক সে কথা। গাড়ি খুঁজে পাই নি—একখানা রিক্‌শ ক'রে বাড়ি এনেছিলাম। আগুন ক'রে সেঁকেছিলাম। একবার মাত্র চোখ মেলে আবার সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। শেষরাত্রে জ্বর। সকালেই ডাক্তার ডেকেছিলাম—ডাক্তার ঘোষকে। ডাক্তার বলেছিলেন—নিউমোনিয়া। তারপর পঁয়তাল্লিশ দিন জ্বর। জ্বর ছেড়েছে পঁয়তাল্লিশ দিনে। এখনও ভাল বল পায় নি—উঠতে পারে না। ডাক্তার সাক্ষী আছেন।

দারোগা বলেছিলেন—আপনি বললেন—আপনার কথা অবিশ্বাস করছি না। ডাক্তার ঘোষকে আইন মানতে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু আপনার কথাই যথেষ্ট। কিন্তু ওকে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করতেই হবে। কারণ এর সন্ধানের সূত্র ওর কাছেই পাওয়া সম্ভব।

—বেশ, জিজ্ঞাসা করুন। বাচ্চিকে ফাদার বলেছিলেন—তুমি সত্য কথা বল জন, কোন ভয় করো না, তুমি নির্দোষ—আমি সাক্ষী। মনে রেখো ভগবান তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সব জানেন। মিথ্যা বললে তিনি রুষ্ট হলে দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে। সত্য বলবে।

দারোগা আরম্ভ করিলেন নানীর টাকার কথা ধরে।

—নানীর টাকা কোথায় থাকত তুমি জানতে?

—না।

—টাকা ছিল জানতে তো?

—নানী বলেছিল। নিজে বলেছিল।

—কি বলেছিল?

সে শুরু করেছিল এবং সব বলেছিল—বলেছিল আগাগোড়া।

নানীর কথা—তার ভালবাসার কথা, তার মারের কথা, গালাগালির কথা, চুড়ি বিক্রির কথা, তার অসুখের কথা, অসুখের সময় তার নানার ভূতের ভয়ের কথা, তার কাছে শোয়ার কথা ; নানীর টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা। গণপৎ দবির তাকে পরোটা মাংস খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল—সে কথা। সে বলেছিল নানীর টাকা পেলে সে একলা খুব ভাল হোটেলে অনেক কিছু খাবে—সে কথা। তারপর নানীর প্রহারের কথা। সে পালিয়ে যাব বলে বেরিয়েছিল—গান শুনে দাঁড়িয়েছিল—হঠাৎ পল্টন তাকে রোশনিদের আড্ডায় ডেকে মাংস পরোটা খাইয়ে ছিল এবং নানীর টাকার কথা প্রতিশ্রুতির কথা জিজ্ঞাসা করেছিল সে কথা। রোশনি ইশারা করে বারণ করেছিল—সে কথা। পল্টন তাকে পালাতে দেয় নি—বলেছিল—শুধু পালাবি কেন, দেখ নজর করে দেখ, কোথায় টাকা রাখে নানী। তারপর একরোজ খানার সঙ্গে কি পানির সঙ্গে ওষুদ মিশিয়ে দিবি—বুড়ী খুব ঘুমিয়ে যাবে মুর্দার মত—তখন আমরা ভি যাব, তু দরজা খুলে দিবি, টাকা উকা সব উঠায়ে লিবি—হামাদিগে থোড়া কুছু দিবি, বাকী লিয়ে তু চলে যাবি বম্বই দিল্লী আজমেঢ়—যাঁহা মন।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। হঠাৎ রোশনির কথা মনে পড়েছিল। রোশনি তাকে কতবার বলেছে—বাচ্চি, বাঁশুরিয়া—পল্টনকে কখনও বলবি নে নানী কোথা টাকা রাখে সে কথা। খবরদার। টাকা উঠায়ে বিলকুল উ লিয়ে লেবে। তোকে ভাগিয়ে দেবে। গোল করলে উ তুকে জানে ভি খতম করে দিবে। উ দুশমন সব পারে। অবিশ্বাস করে নি বাচ্চি। কসাইয়ের ছেলে পল্টনের চোখের তারা দুটো কেমন দেখলে ভয় লাগে—কেমন একটা রঙের আংটি আছে তারার মধ্যে। তার মধ্যে যেন খুন নাচে।

দারোগা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাচ্চির চোখের

দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছিল—হঠাৎ সচেতন হয়ে ফিরেছিল দারোগার দিকে—বলে উঠেছিল পল্টন দবির গণপৎ—ওই ওরা—।

—বল।

—জরুর ওই লোক। সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল—তার আর কোন সন্দেহ ছিল না। পল্টন দবির গণপৎ রামেশ্বর। এরা—

—রোশনি বলেছিল হমাকে। উ লোক খুন ক'রে টাকা লিবে—হমাকে খুন ক'রে।

ফাদার বলেছিলেন—ভেবে বল জন। ভগবান তাকিয়ে আছেন তোমার দিকে।

মুহূর্তে তার উত্তেজনা কোথায় চলে গিয়েছিল—মনে হয়েছিল সে বুঝতে পারছে ভগবান তার দিকে তাকিয়ে আছেন; সে স্থির-দৃষ্টিতে ফাদারের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—হাঁ—উ লোক। ওই ওরা। হ্যাঁ!

পল্টনকে ভয় হয় নি, দারোগাকে ভয় হয় নি—সে বলেছিল সত্য কথা। এর চেয়ে সত্য আর হয় না। চোখে দেখার চেয়েও সত্য আছে—এ সেই সত্য।

দারোগা চলে গেলে সে শুয়ে শুয়ে নানীর জন্যে কেঁদেছিল। নানী—তার নানী। মাকড়সার জালের মত দাগের জালপড়া নানীর সেই মুখখানা বার বার তার মনে পড়েছিল। নানী, নানী, নানী!

ফাদার একসময় এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—ভগবান তোমাকে দয়া করেন জন, নইলে সেদিন তুমি ওই জল-ঝড়ের মধ্যে পালিয়ে এসে কবরখানায় লুকিয়ে থাকতে না। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হ'ত না। তুমি ওখানে থাকলে এ জালে তোমাকে ওরা টানতই। না হ'লে নানীর সঙ্গে তোমাকেও মেরে ফেলত।

গোমেশ এসে বলেছিল—নানীর জন্যে কাঁদছে ছেলেটা?

—হ্যাঁ।

গোমেশ তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল—ভগবান ওকে আপনার হাতে দিয়েছেন বাবাসাহেব। আ—হা—হা। কি হ'ত আজ আপনি না-থাকলে! কাঁদিস নে বাচ্চা, কাঁদিস নে।

চাচীও সেদিন এসে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে খাবার খাইয়ে সাহস দিয়েছিল—ভয় কি।

লনা জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিল দশ পনের দিন পর।

ঠিক পরের দিন পল্টন দবির গণপৎ রামেশ্বরকে বেঁধে নিয়ে এসেছিল পুলিস।

ওদের বাঁধা অবস্থায় দেখেও তার ভয়ের অন্ত ছিল না। বাঁধা অবস্থাতেও পল্টনের চোখে খুন নাচছিল। শুধু তাই নয়, সে সেই অবস্থাতেও শাসিয়ে বলেছিল—বেইমান হারামী—তু বলেছিস হমরা বুড়ীয়াকে খুন করেছি? ছাড়া পাব হমি, জরুর পাব। তুর জান হমি লিব।

পুলিস ধমক দিয়েও সহজে তাকে দমাতে পারে নি। দারোগা নিজে সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে থামিয়েছিলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এদের চেন?

—হাঁ। ওই গণপৎ—ওই রামেশ্বর। ওই পল্টন—ওই দবির।

পল্টন চীৎকার ক'রে উঠেছিল আবার—খুন তুই করিয়েছিস। তুই। উ হমাকে বলিয়েছিল নানীকে খুন ক'রে রূপেয়া লিয়ে ভাগবে। ওহি করিয়েছে খুন। পুলিস তাকে টেনেই নিয়ে গিয়েছিল।

*　　*　　*　　*

কেস হয়েছিল কিন্তু তাতে কিছু হয় নি পল্টনদের। আদালতে একা সাক্ষী বাচ্চি। পল্টনের বাপের টাকা ছিল। বড় উকীল দিয়েছিল। রোশনি আর বুড়োকে খুঁজে পুলিস পায় নি।

খালাস পেয়ে পল্টনেরা মধ্যে মধ্যে চীৎকার ক'রে যেত ফাদারের বাড়ির সামনে—জান লিব শালা—তুর জান হুমি লিব।

ভয়ে বাচ্চি আঁকড়ে ধরেছিল ফাদারকে—এই বাড়িকে। অনেক আরাম এ বাড়িতে। গান শেখায় আশ্চর্য আনন্দ, কিন্তু তবু তার মন অসুখ অনুভব করেছে, বুকের ভিতরটায় কান্না যেন ঠেলে ঠেলে উঠেছে।

গোমেশ আর সেই আগের রূঢ় বিরোধী ছিল না—সে স্নেহ করত। মিষ্ট কথা বলত, তবুও তার মধ্যে কাঁটা ছিল; একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস, গোপন অবজ্ঞা অনুভব করত তার সস্নেহ মিষ্ট কথা এবং আচরণের মধ্যে। চাচীও ভালবাসত। তারও ভালবাসার মধ্যে কিছু ছিল যাতে সে বুঝতে পারত যে, সে এবং লনা পৃথক। লনা জানালা খুলে এসে দাঁড়াত, তার স্বাভাবিক ক্ষীণ রেখায় যুঁইফুলের মত মিষ্ট হাসি সে হাসত, তার বাঁশি তারের যন্ত্রের বাজনার কথা বলত—গানের প্রশংসা করত—তাকে বলত—তুমি এমন ক'রে 'ঝোরণা' বল কেন? 'ঝরণা' বলতে পার না? আজ আলোকের এই ঝোরণাধারায় নয় ঝরণাধারায়। সে প্রথম ভাগ ফার্স্ট বুক নিয়ে পড়ত—সে বলে দিত—অ—চ—ল—'ওচল' নয় অচল। অ—ধ—ম—'ওধম' নয় অধম। লনার খোঁড়া কুকুর, ডানাভাঙা পা-কাটা পাখী, কানা বেড়াল আছে, সাদা পেখম তোলা পায়রা আছে, তার মধ্যে বেড়ালটা মধ্যে মধ্যে এসে তার বিছানার পাশে লেজ তুলে ঘুরে বেড়াত—খোঁড়া কুকুরটা লেংচে লেংচে ঘরে এসে দাঁড়াত, আদরই সে করত কিন্তু একটু বিরক্ত করলেই সে খেদিয়ে দিত—কোন কোন দিন মারত। লনা এসে চোখে তিরস্কার-ভরা দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়াত, বলত—মারলে কেন? কানা খোঁড়াকে মারে? সে যেন কত ছোট হয়ে যেত। ফাদার গায়ে হাত বুলোতেন—খুব ভালবাসতেন—আজও বাসেন—কত কত জিনিস এনে দিতেন। পড়াতেন। পড়তে তার ভাল লাগত না। তিনি তিরস্কার

করতেন না—বোঝাতেন—সুন্দর ক'রে বলতেন—সুন্দর কথা। কিন্তু তার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠত—তার দম যেন বন্ধ হয়ে যেত। বলতেন—জান জন—পৃথিবীতে মানুষের বন্ধু মানুষের পিতা ঈশ্বর আর মানুষের শত্রু শয়তান। ঈশ্বর ডাকেন—আলো জ্বেলে তিনি ডাকেন—এস, এই আলোর পথ ধরে আমার কাছে এস। আর শয়তান অন্ধকার দিয়ে আড়াল দিয়ে মানুষকে বলে—ঘুমিয়ে থাক ঘুমিয়ে থাক। এই অজ্ঞান—এই লেখাপড়া না-জানা সেই অন্ধকার। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে হিংসা রাগ লোভ—নানান পাপ। এই অজ্ঞান—এর অন্ধকারের সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের হিম। শয়তান এসে এই সুযোগে মানুষকে আশ্রয় দিতে চায়। বলে—এস—আশ্রয় দেব। দূরে ওই আলোর রেশ দেখছ—ওদিক থেকে পিছন ফের। তারপর তাদের গহ্বরের মধ্যে ফেলে দিয়ে পাথর চাপা দেয়। পাপের রাজ্যে চাপা পড়ে মানুষ। তবু আলোর জন্যে মানুষ তৃষ্ণা অনুভব করে, কিন্তু সে পাথর ঠেলে বার হওয়া তো সহজ নয়। তোমার পুণ্য আছে জন—এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর, সংগীতে এমন জন্মগত জ্ঞান—এর সঙ্গে যদি জ্ঞান-শিক্ষার প্রদীপ জ্বালতে পার তবে পারবে —ওই গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

শুনতে শুনতে তার মনে হ'ত সত্যই একটা গুহাতে সে যেন গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। তার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। শয়তান যেন তাকে পিছন থেকে টেনে নিয়ে যেত আর বলত—পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়। গুহাটার পাথরের ওপাশ থেকে ফাদারের ডাক যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলেও তার কানে আসত—জন—জন—জন। এদিকে এস।

এই শ্বাসরোধী অবস্থা কাটত ফাদার যখন গান শেখাতেন তখন। 'আজ আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও' গাইলেই মনে হ'ত গুহার পাথরটা স'রে আলো পাচ্ছে সে।

আবার গান থামলেই মনে হ'ত পাথরটা গুহার মুখ জুড়ে বসে

গেল। মনটা তখন পিছনের অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকাত। মনে হ'ত সেখানে এখান থেকে অনেক আনন্দ অনেক স্বস্তি। কিন্তু ভয় হ'ত পল্টন কোথায় লুকিয়ে আছে। তার চোখের তারার সেই ফিকে রঙের আংটিটা জ্বলছে আক্রোশে। রাত্রে যখন সে ঘরে শুয়ে জেগে থাকত আর গোমেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমোত তখনই এই কথাগুলো মনে হ'ত বেশী ক'রে। ফাদারের ঘরের দক্ষিণ দিকে ছোট বারান্দা ছিল একটা—সেইটেকে ঘিরে ফাদার তার ঘর ক'রে দিয়েছিলেন। রাত্রে গোমেশ শুতো তার ঘরে। তার ঘুম আসত না। মনে পড়ত বস্তির সেই হৈ হৈ হুল্লোড় দিল্লগী। দিনের বেলা ফাদারের ঘরের অ্যাসট্রে থেকে চুরি করা সিগারেটের টুকরোগুলি ছাদের এক কোণে ব'সে ধরিয়ে খেতো। ঘরে খেয়ে ধরা পড়েছে; আশ্চর্য—ঘুমের মধ্যেও গন্ধ পেয়ে জেগে উঠেছে লনা। হঠাৎ জানালাটি খুলে গেছে—সে চমকে উঠেছে। লনা বলেছে—সিগরেট খাচ্ছ? বলেই জানালাটি বন্ধ ক'রে দিয়েছে। একদিন কাশি উঠে ধরা পড়েছিল। ঘরের বাইরেই খাচ্ছিল—কাশির শব্দে সেদিন গোমেশ জেগে উঠেছিল।

শুধু ফাদারই বারণ করেন নি, ডাক্তারও তাকে বারণ করেছিল সিগারেট খেতে। নিউমোনিয়া কঠিন হয়েছিল—সিগারেট না-খাওয়াই ভাল। নজর রাখবেন। কতদিন এই আজকের মতনই মনে মনে ঠিক করেছে, নেমে যাবে পাইপ বেয়ে—রাস্তায় নেমে ছুটবে, একেবারে ময়দান, বস্তিতে না। রোশনিদের সঙ্গে দেখা হ'লে তাদের বলবে—চল—তোমাদের সঙ্গেই থাকব, ভিখ মেঙে খাব। গানা গাইব। কিন্তু এখানে না। চল দিল্লী বম্বই। কয়েক মাসেই তখন সে বেশ সেরে উঠেছিল, চেহারা হয়েছিল ভারী সুন্দর। বস্তির ময়লা ছিল না কোথাও, রোদে পোড়া ছাপ তাও উঠে গিয়েছিল। রঙ তার সুন্দর—মুখ চোখ সুন্দর, সে রঙ টকটকে হয়ে উঠেছিল—মুখে চোখে লাবণ্য ফুটেছিল—ভাল খেয়ে স্বাস্থ্য

হয়ে উঠেছিল নিটোল; ফাদার তাকে সুন্দর পোশাক কিনে দিয়েছিলেন—সেই পোশাক পরে আয়নার মধ্যে নিজের ছবি দেখে সে অবাক হয়ে যেত। সে ভাবত যাবার সময় ময়লা ছেঁড়া পাজামা আর ছেঁড়া কামিজটা পরবে—এগুলো সব ফেলে দিয়ে যাবে। ও দুটো সে সংগ্রহ ক'রে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল খাটের তোশকের নীচে। ভাবত—পালিয়ে যাবার সময় সে ময়দানের ধুলো দু'হাতে তুলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেখে নিয়ে এই টকটকে রঙ সুন্দর চেহারা ঢাকা দিয়ে রোশনিদের কাছে যাবে। সেই পুরনো কথা কইবে—সেই পুরনো গান গাইবে। বলবে—রোশনি, তু মুঝে ভুল গয়ি—হমি তুঝে নেহি ভুলা। হাঁ—হাঁ। বার বার মনে হয়েছে—এই বুলি এই কথা এর মধ্যে কি আশ্চর্য নেশা! সারারাত্রি পালাব-পালাব ভাবতে-ভাবতে কতদিন ছাদের আলসের কোণে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে। দু'দিন—হ্যাঁ দু'দিন পাইপ বেয়ে নামবার জন্য কার্নিসে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরে কিছুক্ষণ ভেবে ফিরে এসেছিল। একদিন রাস্তায় নেমেছিল; সেদিন কাটা ঘুড়ি উড়ে যাচ্ছিল—ছেলেরা ছুটছিল ঘুড়ি ধরবার জন্য—দেখে অকস্মাৎ একটা দমকা ঝড়ে বাঁধনছেঁড়া নৌকোর মত ছুটে গিয়ে নেমেছিল রাস্তায়। গোমেশ চীৎকার করেছিল—এই—এই—এই!

ফাদার, লনা তাকে জন বলে ডাকত—কিন্তু গোমেশ, চাচী তা পারত না। বাচ্চি বলতে বারণ ছিল ফাদারের। তারা এই তুমি বলেই ডাকার প্রয়োজন সারত। তখনও তাকে কৃশ্চানধর্মে দীক্ষা দেন নি ফাদার। মাস তিনেক পরই এ ঘটনাটা ঘটেছিল।

গোমেশের সে ডাক তার কানে পৌঁছলেও সে ফেরে নি। সে ছুটেছিল এলিয়ট রোড ধরে সার্কুলার রোডের দিকে।

হঠাৎ কপালে কেউ মেরেছিল প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি। কানে এসেছিল—আব শালা হারামী! পড়ে যেতে যেতেও সে চিনেছিল—সে গণপৎ। চীৎকার একটা করেছিল সে—ফাদার! তার

সুন্দর পোশাক তার সুন্দর চেহারা, তখন তার শরীর সেরেছে। রঙ অনেক পরিষ্কার হয়েছে। তার ফাদার বলে ডাক শুনে রাস্তার লোক এসে তাকে বাঁচিয়েছিল। তার পরেই এসেছিল গোমেশ। গণপৎ পালিয়েছিল। গোমেশ তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে। ঠোঁটে একটা কাটা দাগ রয়ে গেছে। আজও বোঝা যায়। পল্টন হলে হয়তো—

এর পর ফাদার তাকে লনাকে আর চাচীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সাঁওতাল পরগনা—বেনাগড়িয়ায়; তাঁর বন্ধু রেভারেণ্ড জনসন একটি ছোট বাড়ি ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন; কলকাতায় জীবন তখন প্রতি পদে অনিশ্চিত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পঁয়তাল্লিশ সালের শেষে রসিদ আলি ডে-তে ধর্মতলায় গুলি চলে গেল। মিলিটারী লরী পুড়ল। ধর্মতলার হাঙ্গামার জের তাদের বাড়ির দোর পর্যন্ত এসেছিল।

ওখানে গিয়েই ফাদার তাকে কৃশ্চানধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

সে দিনের সে ছবির কিছুই তার মনে নেই। একটা ভয়ে —না ঠিক ভয় নয় কেমন একটা কিছুতে যেন তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল। মনে আছে—তাও আবছা—সেখানকার রেভারেণ্ডকে, সেই অল্টারের উপর দাঁড়িয়ে—পিছনে ক্রাইষ্টের মূর্তি দেওয়ালে টাঙানো। আর কিছু মনে নেই। তারপর সারাটা দিন শরীর মন যেন কেমন হয়েছিল। ছুটতে পর্যন্ত ভয় হয়েছিল। কান্না পাচ্ছিল মধ্যে মধ্যে অকারণে। গলায় একটা ক্রুশ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা নেড়ে দেখেছিল আর মধ্যে মধ্যে তাকিয়ে থেকেছিল।

কবরখানায় বর্ষার রাত্রে বাচ্চি মরেছিল; অসুখের পর যেদিন তার জ্ঞান হয়েছিল সেদিন বাচ্চি নতুন ক'রে জন্মেছিল। এই দিন তার নাম হয়েছিল—জন। জন কল্যাণকাম বিশ্বাস। লনার নামও ছিল কল্যাণী। ফাদারের ছেলে মেয়েরও তাই নাম ছিল।

ওইখানেই রেভারেণ্ড জনসনের বাংলোয় একটা খাঁচায় ছিল একটা নেকড়ে বাঘ। দিনে সেটা কখনও কোণে ঘুমোত, জেগে থাকলে অনবরত এদিক থেকে ওদিক ঘুরত, ঘুরত আর ঘুরত। কিন্তু আওয়াজ কখনও দিত না। গভীর রাত্রে আওয়াজ দিত—ডাকত—আউ! আউ! আউ! সে উঠে গিয়েছিল দেখতে। দেখেছিল খাঁচার শিক কামড়াচ্ছে, নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে, কখনও সামনের পা দুটো শিকের উপর রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ডাকছে—আউ! আউ!

ফাদার ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন তার উঠে আসা। তিনি তার পিঠে হাত দিয়েছিলেন—সে চমকে উঠেছিল। ফাদার বলেছিলেন—মানুষের আনন্দ তার মনের মুক্তি দিনে—আলোতে; হিংস্র জন্তুর আনন্দ মুক্তি অন্ধকারে—রাত্রে। অন্ধকার ওকে ডাকছে। থেকো না এখানে—হয়তো ওর ডাকে বনের নেকড়ে এখানে আসতে পারে। বড় হিংস্র ওরা।

লনাও জেগে উঠেছিল—তার চোখে ভয় ফুটে উঠেছিল সেদিন।

॥ আট ॥

পরের দিন লনা তাকে তিরস্কার ক'রে বলেছিল—তোমার ভয় করল না?

সে খুব অহংকার ক'রেই বলেছিল—একটুও না।

লনা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—জান তোমাকে দেখেও ভয় করছে।

—কেন?

—জানি না।

ফাদার তাদের ওখানে রেখে কলকাতা ফিরে এসেছিলেন, তাঁর চাকরি ছিল। গ্রামোফোন কোম্পানির চাকরি—রেডিয়োর

কন্ট্রাক্ট। লনাকে পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন বাড়িতে। জনকে ভরতি ক'রে দিয়েছিলেন ওখানকার স্কুলে। চাচী আসবার সময় বলেছিল—ওকে আমি সামলাব কি ক'রে বাবাসাহেব? ও যদি রাত্রে উঠে নেকড়ে দেখতে যায় কি খাঁচায় হাত দেয়—

ফাদার তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ত—মনে হ'ত তার যেন অসুখ করছে। ভয় লাগত তার। এই ভয় লাগাটাই তাকে যেন ওই ক্রুশে গাঁথা ক্রাইষ্টের মত এখানে আটকে রেখেছে। ফাদার বলেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র—গভীর সম্ভ্রম এবং ভয়ের সঙ্গে সে কথাটা বিশ্বাস করত, আজও করে, তিনি হাসিমুখে অত্যাচারী মানুষের দেওয়া যন্ত্রণা সহ্য করেছেন—তাঁর মুখে ক্ষমাসুন্দর হাসি কিন্তু তার যন্ত্রণা মর্মান্তিক।

শিউরে উঠল জন। না—না। এ সত্য নয়—এ সত্য নয়। করুণাময় ক্রাইষ্ট—প্রভু—তুমি ক্ষমা কর আমাকে। তোমার সঙ্গে আমার তুলনা করার অপরাধকে তুমি ক্ষমা কর। আমি পাপী—আমার পাপকে তো আমি জানি—আমি স্বীকার করি। মনে মনে স্বীকার করি—সমাজের ভয়ে তাকে স্বীকার করতে লজ্জা পাই। কিন্তু এর উপর আমার যে হাত নেই, আমি অসহায়।

ফাদার—তুমিও আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ভালবাসার অপমান করেছি আমি। না—আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করার মত ভয়ের পেরেক ঠুকে রক্তাক্ত ক'রে বদ্ধ কর নি। না। তবে তুমি আমাকে বড় জোরে প্রচণ্ড শক্তিতে বুকে জড়িয়ে ধরে আটকে রেখেছিলে। ছোট ছেলেকে স্নেহের আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে মানুষ আপনার মধ্যে মিশিয়ে নিয়ে একান্ত আপনার করতে চায় যখন তখন শিশুর শ্বাস রোধ হয়—সে চীৎকার ক'রে ছাড়াতে চায়, বন্ধন ছিঁড়তে চায়।

তাই হয়েছিল।

ফাদার তাকে জড়িয়েই ধরেন নি শুধু—চুম্বনে চুম্বনে শ্বাস রোধ করার মত তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন—শ্বাসরোধী উপদেশ।

ওঃ, সে কি কল্পনা!

"দারিদ্র্যের অজ্ঞানের অন্ধকারে লোভ হিংসা মন্দ প্রকৃতির কালিমাময় শিখাওঠা মশাল হাতে শয়তান এসে দাঁড়ায়। বলে—আলো চাই? এই আলো। মানুষের আত্মাকে প্রতারিত করে—আলোর জগতের উলটো মুখে পথ ধরিয়ে দেয়। কবরের মত গহ্বর—সে গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে পাথর চাপা দেয়। বলেছি তো তোমাকে। কিন্তু মানুষের দিনের আলোর তৃষ্ণা যে জন্মগত—তার আত্মার তৃষ্ণা। সে তো যায় না। মধ্যে মধ্যে মশালের ওই কালিতে তার যখন ভিতরটা খাক্ হয়ে যায় সে মশাল ফেলে দেয়—জাগ্রত আত্মা এসে বুক দিয়ে ওই পাথর ঠেলে—খোলো খোলো খোলো। শয়তান নিষ্ঠুর আক্রোশে পাথরের উপর পা রেখে চেপে ধরে। বলে—মুখ ফেরাও—ফেরো অন্ধকারের পথে—দেখ ওখানে অনেক আনন্দ। নইলে তোমার বুকখানাকে এই পাথরের চাপে পিষে দেব।"

সত্যই তার আত্মার যেন শ্বাস রোধ হ'ত। মনে হ'ত তার আত্মার বুকে পাথর চাপা দিয়ে শয়তান পিষতে চাচ্ছে। নিদারুণ ভয়—সেই ভয়ে ফাদারের হাতখানা চেপে ধরে থেকে বলেছে—তোল তোল।

অবশ্য গান ছিল সত্যকারের আলোর স্পর্শ। ওতেই সে ফাদারের হাত কতবার ছেড়ে দিতে চেয়েও ছেড়ে দেয় নি।

আর লনা!

ওই এক বিচিত্র আকর্ষণ। তার উত্তাপ নেই, তার আহ্বান নেই—কাছে গেলে কেমন হয়ে যায় সে—তবু তার এক বিচিত্র

আকর্ষণ আছে। ওকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবলেই কেমন যেন হাহাকার ক'রে ওঠে মন।

সাঁওতাল পরগনার বেনাগড়িয়া থেকে সে স্পষ্ট ক'রে অনুভব করেছে এ সত্য।

ফাদার তাকে উপদেশ দিলেন - লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। চাচীকে বললেন - ভেবো না চাচী। জনের দীক্ষা হয়ে গেছে। ঈশ্বর তাকে করুণা করবেন—প্রভু ক্রাইষ্ট তাকে রক্ষা করবেন, লেখাপড়া শিখছে; ওকে আমি উপদেশ দিয়েছি।

কয়েক দিন বেশ কেটেছিল। সকালে ননার সঙ্গে প্রার্থনা—সন্ধ্যায় প্রার্থনা। পড়াশোনা। সাঁওতাল পরগনার লালমাটি আর শালবন মহুয়া পলাশের জঙ্গলের মধ্যে অবাধে বেড়িয়েছে। পল্টনের ভয় ছিল না। রেকর্ডে গান শুনত। নিজে গলা মেলাত, বাঁশি বাজাত, ওই তারের যন্ত্রটা বাজাত—বেশ কেটেছিল। মাস কয়েকের মধ্যেই প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ ইংরিজী ফার্স্ট বুক শেষ করেছিল। তারপর একদিন—সেটা চৈত্রের শেষ গরম পড়েছে তখন; হঠাৎ একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওই বন্দী নেকড়েটার বিচিত্র ডাক বিচিত্র স্বরে। হঠাৎ ভুল ভেঙেছিল—একটার ডাক তো নয়, এ যে দুটো! সে যেন দুটোতে কথা বলছিল। আজকে আর সেই বিলাপভরা উচ্চ আঁ—উ - আঁউ ডাক নয়।

বিস্মিত হয়ে শুনেছিল—উঃ—উঁ—উঁ—উঁ—

যেন কথা।

জানালা খুলে দেখেছিল প্রথম। হ্যাঁ, দুটো। শিকের ফাঁকে মুখ লাগিয়ে সেটা স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে আছে—বাইরেরটা বড়—সেটা বাইরে দাঁড়িয়ে তার মুখ চাটছে। জ্যোৎস্নার আলো ছিল। কয়েক মুহূর্ত পর সে দেখতে পেয়েছিল—দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে স্থির হয়ে, কিন্তু স্থির তারা নয়; ক্ষণে ক্ষণে তাদের দেহ শিউরে

শিউরে উঠছে—ঘাড়ের রোঁয়াগুলি ফুলে উঠেছে। হ্যাঁ—ভিতরেরটারও। আর কিছুক্ষণ পর দেখতে পেয়েছিল—ভিতরেরটা যেন থরথর ক'রে কাঁপছে।

আশ্চর্য—তার শরীরটা যেন শিউরে উঠেছিল। একটা দীর্ঘস্থায়ী শিহরন, রোমাঞ্চ নয়, রক্ত পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন ঘুরপাক খাচ্ছিল ওখানকারই ঝোরার জলের মত। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল কালো-রঙ, ক্ষয়া ক্ষয়া শরীর, ধারালো গড়ন একটি মেয়েকে ; বস্তির সেই ভাঙা কোঠায় বোশেখ মাসের দুপুরে সে আর রোশনি এমনি ক'রে মুখোমুখি হয়ে বসে ছিল।

প্রায় ভোরবেলা পর্যন্ত বাইরের আগন্তুক নেকড়েটা দাঁড়িয়েছিল—তারপর চলে গিয়েছিল। তখন এটার কি কান্নার মত ডাক! সে সারাক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল।

একদিন নয়। পর পর কয়েক দিন। সে কান পেতে থাকত। ঠিক আসত সেটা। সাড়া পেলেই সে উঠে জানালা খুলে দাঁড়াত। তারপর সাঁওতাল পরগনার অরণ্যের মধ্যে এই বিচিত্র আকর্ষণে সে প্রবেশ করেছিল। শুধু খুঁজে খুঁজে বেড়াত এই খেলা। শুধু অরণ্যে নয়—প্রান্তরে লোকালয়ে আদিবাসী মানুষের মধ্যেও এই খেলা দেখার নেশায় সে সব ভুলতে বসেছিল। মানুষগুলিও কোন গাছতলায় বসে অথবা কোন পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে জোট বেঁধে বেঁধে বসে থাকে, খিলখিল ক'রে হাসে। এ ওর হাত ধরে টানে—ও একে মারে, আঁচড়ে দেয়।

লেখাপড়া থেমে গিয়েছিল। মেজাজ রুক্ষ হয়েছিল। রাত্রে রোশনিকে কল্পনা করত। স্বপ্ন দেখত।

ফাদার জনসন ফাদারকে চিঠি লিখেছিলেন।

ফাদার পনের দিন অন্তর আসতেন। কয়েক দিন ক'রে থেকে যেতেন। এবার এলেন ছুটি নিয়ে। পুরো এক মাসের ছুটি। সঙ্গে নিয়ে এলেন অনেক বাজনা। গানের আসর পাতলেন।

তিরস্কার করলেন না, কিছু উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না। রাত্রে এসেছিলেন—সকালে উঠেই আসর পাতলেন গানের—নিজে বেহালা নিয়ে বসে বাজাতে শুরু করলেন—

আজ আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও! বললেন—গাও। লনা—তুমিও গাও।

মাসখানেক পরেই বেধেছিল ছেচল্লিশ সালের অগস্ট মাসে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। কলকাতায় নাকি রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছিল। ঘর পুড়েছিল বস্তি পুড়েছিল। বেনেপুকুর অঞ্চলটা মুসলমানদের ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল।

এই দাঙ্গায় পল্টনরা বেনেপুকুর থেকে পালিয়েছে। তার বাবাকে দাদাকে মেরেছিল পার্ক স্ট্রীটের পাড়ায় পার্ক সার্কাসে। গণপৎ মরেছে—মেরেছিল দবির। দবিরও মরেছে। কার হাতে, লোকে ঠিক জানে না, তবে বলে, মেরেছিল পল্টন। রামেশ্বরের খোঁজ নেই। রোশনির বুড়ো মরেছে। রোশনি হারিয়ে গেছে। এসব খবর সে পেয়েছিল স্বাধীনতার পর ফিরে এসে। সাতচল্লিশ সালের অক্টোবরে।

ফাদার এই এক বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই এখানে কাটিয়েছেন। আর তাকে গান শিখিয়েছেন। এরই মধ্যে সে পেলে আশ্চর্য মুক্তি! আশ্চর্য শক্তি!

শয়তানের পাথরটা সে বুক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এল আলোতে।

আলোর স্বাদ সে পেলে

কলকাতায় তাদের এবার ফিরিয়ে আনলেন ফাদার। কলকাতায় তখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ফাদার কৃশ্চান হলেও সেই সব কৃশ্চানদের একজন যারা এ স্বাধীনতায় এ দেশের সবার মত খুশী হয়েছিল। কলকাতাকে সে

নতুন চেহারায় দেখলে। ব্ল্যাক-আউট উঠে গেছে। রাত্রির কলকাতা ঝলমল করে আলোয়।

লনাকে ইস্কুলে ভরতি ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে ইস্কুলে দেন নি। সে তাতে অখুশী হয় নি, লেখাপড়ায় তার খুব ঝোঁক ছিল না। ফাদার তাকে নিজে পড়াতেন। আর কলকাতায় তিনি তার গান শেখার জন্য ওস্তাদ রেখে দিয়েছিলেন। ওস্তাদের টাকা তাঁর লাগত না, তিনি নিজেও গ্রামোফোন কোম্পানীতে গায়ক, ফাদার ন্যাথানিয়েল ওখানে ফাদার রমেশ বিশ্বাস—সকলের শ্রদ্ধার মানুষ, ভালবাসার মানুষ; ওস্তাদ বিশ্ববন্ধু রায় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সাধু মানুষ—মার্গসংগীতের সাধক।

জনকে দেখে তিনি বলেছিলেন—রমেশবাবু, এ যে ভাল আধার। হ্যাঁ এর হবে। হবে।

এক বছর তিনি তাকে শিখিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন—গোড়া বাঁধাই ছিল—সেটা আমি শক্ত ক'রে দিয়েছি বিশ্বাস সাহেব; কিন্তু এ ক্ল্যাসিক্যাল বোধহয় এর নয়—হয়তো পরে হবে—ওর ঝোঁক হবে। এখন অন্য কিছু শেখান। আমি আর কাল থেকে আসব না।

কারণ একটা ছিল। জন ঠিক বুঝতে পারে নি। হয়তো ব নিজের অজ্ঞাতসারেই তার প্রকৃতি বশ ক'রে ফেলেছিল।

কাছাকাছি পার্ক সার্কাসের মধ্যে একটি সংগীতের আসর ছিল সেখানে বিশ্ববন্ধু রায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন—তিনিই রমেশ বিশ্বাসকে বলে জনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফাদার তার জন্যে গরদের পাঞ্জাবি কাঁচিধুতি কিনে তাকে নিজে পরিয়ে দিয়েছিলেন। লন তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল—বলেছিল—কি সুন্দর তোমাকে লাগছে। আজ আর জন বলতে ইচ্ছে করছে না। আজ তুমি কল্যাণকাম। দাঁড়াও। তোমার রুমালখানা দাও সে সেণ্ট মাখিয়ে এনে দিয়েছিল। দরজায় ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে

ছিলেন তার গুরু ওস্তাদ রায়। ফাদার তাঁকে বলে দিয়েছিলেন—ওর জন নাম জানেন—ওর দেশী নাম কিন্তু কল্যাণ, কল্যাণকাম। সুযোগ হ'লে ওকেও একটু—। তখন বয়স তার পনের পার হচ্ছে; কৈশোরের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে সে সময়ের মন বিচিত্র। বহু নরনারীর সমাবেশ—অনেক আলো—অনেক সজ্জা-সমারোহ, শিল্পী অনেক। সে মোহবিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল—কানের পাশ ছুটো গরম হয়ে উঠেছিল।

তার গুরু তাকে সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। সে গান গেয়েছিল—কিন্তু তার পরই ওস্তাদ রায় তাঁর গানে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন আসরকে যে তার গানের কথা তারই মনে ছিল না—মনে ছিল না নয়, মনে হয়েছিল কেন সে গেয়েছিল! তার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ওস্তাদ রায় বিদায় নিচ্ছিলেন গানের পর, সে তাঁর পিছনে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিল—তখন আসরে একজন তরুণ গায়ক আধুনিক গান ধরেছে। ওস্তাদ রায়ের এমন ক্ল্যাসিক্যালের গম্ভীর আসরকে চঞ্চল চপলই ক'রে তোলে নি শুধু, তাতে আশ্চর্য উল্লাসের হিল্লোল তুলেছে। বাঁ পাশের মেয়েদের সারিতে তরুণী মেয়েদের চোখের দৃষ্টিতে কি সপ্রশংস ক্ষুধা জ্বলজ্বল ক'রে যেন জ্বলছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। স্থির হয়ে গেছে তারা। তার সময়ের মত কথা বলছে না—এদিক ওদিক তাকাচ্ছে না। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওই গায়কের দিকে। একটা জ্বালা যেন জ্বরোত্তাপে মনকে জর্জর ক'রে তুলেছিল। এমনই তার সে ক্ষোভমগ্নতা যে অন্য কোন দিকে তার খেয়ালও ছিল না। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল গুরুর ডাকে। তিনি ডেকেছিলেন—কল্যাণ! আর আগেও বোধহয় এস বলে ডেকেছিলেন—সে শোনে নি। কল্যাণ বলে ডেকে তিনি তার গায়ে হাত দিতে সে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়েছিল ওই ক্ষুব্ধ

আক্রোশভরা দৃষ্টিতে যা তার চোখে ছিল। গাড়িতে উঠেই সে বলেছিল—আমাকে কেন গাওয়ালেন আপনি?

—কেন? তুমি তো ভাল গেয়েছ কল্যাণ।

—না। রূঢ় কণ্ঠেই সে বলেছিল।—না।

হেসে গুরু বলেছিলেন—আরও কিছুদিন পর তুমি গাইলে আমার গান কেউ শুনবে না।

চুপ ক'রে ছিল সে। কিছুক্ষণ পর সে বলেছিল—আমাকে আধুনিক গাইতে দিলেন না কেন? রবীন্দ্র-সংগীত গাইলেও আমি ওর থেকে অনেক ভাল গাইতাম।

সারা রাস্তা সে আর কথা বলে নি—তার গুরুও বলেন নি। যাবার সময়ও নামেন নি। পরের দিন ফাদারকে কথাটা বলে বিদায় নিয়েছিলেন, ক্ল্যাসিক্যাল বোধহয় এর নয়। হলেও পরে হবে।

ফাদারও কারণ জিজ্ঞাসা করেন নি। তিনি নিজেই আবার তার ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু আর মন ঠিক তার এই আড়াই তিন বছরের মত বসে নি। একদিনেই আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ওই আসরের মেয়েগুলি মধ্যে মধ্যে সারি দিয়ে ভেসে উঠত। সেই তরুণ গায়কটির দিকে তাদের কি স্থির একাগ্র উজ্জ্বল দৃষ্টি! এরা তারও দিকে এমনি ক'রে তাকাতে পারত। তাকাবে! যৌবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এ কল্পনা রাত্রের আলোর মত তাকে যেন টানলে সেদিন।

নতুন ক'রে মনে পড়ল রোশনিকে।

আশ্চর্য—এই স্বচ্ছন্দ সচ্ছল পরিচ্ছন্ন জীবনেও তার কল্পনায় রোশনি মুছে গেল না। বরং নতুন ক'রে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল। রোশনিকে যদি তার মত সাজাতে পারে, পরিচ্ছন্ন করতে পারে তবে তার কেমন রূপ হয়?

তাও সে দেখলে। ওই সেই দিনের গানেই নামটা তার কিছু

লোক জেনেছিল। ওই পাড়াতেই একটি ছোট আসর পেতেছিল একটি ছোট দল—এবং সেটি বিশেষ ক'রে কৃশ্চানদের উদ্যোগেই হচ্ছিল। তারা ফাদারকেও ধরেছিল যাবার জন্য। সেখানে সেদিন সে রবীন্দ্র-সংগীত গেয়ে আসরে যেন হাজার বাতি জ্বেলে দিয়েছিল। গানের আসরে বসেই সে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটি মেয়ের পানে চেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আসরে লনাও গিয়েছিল। বিচিত্র লনা, আসরের মেয়েদের মধ্যে ইলেকট্রিক আলোর সারির মধ্যে বসে ছিল একটি সাদা মোমবাতির মত—পরনেও ছিল তার অতি প্রিয় সাদা পোশাক; সাদা ব্লাউস সাদা শাড়ি; আর এ মেয়েটি ছিল যেন কালো রংয়ের বাল্‌বের ইলেকট্রিক আলো। মেয়েটির রঙ মাজা কালো—পরনে ঘনকালো শাড়ি, তেমনি কালো ব্লাউস—মাথার ঘনকালো চুল পুরুষের লম্বা চুলের মত কাটা—তাও তার শৃঙ্খলা নেই, আঁচড়ানো নেই, কিছু কপালে পড়ে আছে কিছু উঠে আছে কিছু দু'পাশে বিন্যস্ত; তার উপর কালো শাড়ির আধঘোমটা। সারাটা দেহের মধ্যে কোথাও অন্য কোন বর্ণের ছটা নেই; হাতে অলংকার নেই; থাকবার মধ্যে শুধু দুটি সাদা চোখ—আর মধ্যে মধ্যে হাসিতে সাদা দাঁতের সারি ঝিলিক দিয়ে উঠছিল।

যেন মোহময়ী রাত্রি; মেঘে ঢাকা অমাবস্যা। কপালে একটি টিপ পর্যন্ত ছিল না—ঠোঁটে লিপস্টিকও না।

ক্ষয়া চেহারা—ধারালো নাক; মুহূর্তে রোশনিকে মনে পড়েছিল। তারই দিকে তাকিয়ে সে গান গেয়ে গিয়েছিল পর পর দুখানা। মেয়েটি প্রথম গানের পর রাত্রির আসরেও গগল্‌স বের ক'রে চোখে দিয়েছিল। তার দৃষ্টি সে সহ্য করতে পারে নি।

গানের শেষে মেয়েটি নিজেই এসে তার গানের তারিফ করেছিল। মেয়েটি এখানকার নয়—ঢাকার বাঙালী কৃশ্চান—এখানে এসেছিল কয়েক দিনের জন্য। হেসে বলেছিল—যেমন

সুন্দর গলা তেমনি সুন্দর চেহারা। এখনও তো নেহাত বাচ্চা পুরো জোয়ান হলে—কি বলব—? You will be a dangerous man! হেসে বলেছিল—আমার রঙ কালো—নাম কৃষ্ণা—আমি কষ্টিপাথর—আমার কষটা নির্ভুল।

মুখ চোখ তার লাল হয়ে উঠেছিল। শুধু লজ্জা নয় তার সঙ্গে তার মনের মধ্যে একটা কিছুর খোঁচা লেগে চমকে জেগে উঠেছিল।

সে হেসে বলেছিল—Good luck. বড় হয়ে নাম ক'রে ঢাকা আসবেন গান গাইতে। দেখা হবে। বেবী কৃষ্ণাকে সবাই জানে। আমি আর্টিস্ট—ছবি আঁকি—আমার স্বামী পুলিস সার্জেন্ট জোসেফ চৌধুরী।

ফাদার চুপ ক'রে বসে ছিলেন। কোন কথা বলেন নি। শুভ্র মোমবাতির মত লনার আলোর শিখাটি যেন নিভে গিয়েছিল।

বাড়ি ফেরার পথে সে চমকে উঠেছিল। পার্ক সার্কাসের সিনেমার বাইরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল রামেশ্বর। সে তাকে তার জোয়ানির প্রথম অবস্থাতেই দেখেছিল—এখন সে পুরো জোয়ান—গোঁফ জোড়াটায় মুখখানা রূঢ় নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, গালের অর্ধেক পর্যন্ত জুলফি—লম্বা চুলগুলো পিছনে ঠেলা। সিনেমার আলোয় তার হাতের সিগারেটের ধোঁয়ার শিখাটা নীলচে হয়ে এঁকে বেঁকে উঠছে তার মুখের সামনে। রামেশ্বর তাই দেখছিল। তার পরনে খাঁকী প্যাণ্ট বুশ সার্ট। বুকখানা মুহূর্তে ধড়াস ক'রে উঠেছিল। বাকী পথটুকু আসতে কতই বা সময় লেগেছিল—হয়তো দশ মিনিট। এই দশ মিনিটের মধ্যে কত যে আতঙ্কর কল্পনা—কল্পনা সে ছবি সমেত কল্পনা—তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

হয়তো রামেশ্বর দেখেছে, চিনেছে; হয়তো নয় নিশ্চয় চিনেছে। সে ছুটেছে পল্টনের খোঁজে। পল্টনকে বলছে—আ বে পল্টন—উ হারামী—।

যে ভাষা সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল বলেই তার মনে হ'ত, মনে মনে সেই ভাষা সে অনর্গল শুনে গিয়েছিল কল্পনার রামেশ্বর আর পল্টনের মুখে।

সে দেখেছিল তার সমৃদ্ধি তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা শুনে দাঁতে দাঁত ঘষে পল্টন বলছে—শালা হারামী, শালা কুত্তার বাচ্চা—আমীর বন গিয়া—আরামসে হ্যায়—হাঁ? শালা হমাদের খুনী বোলে ফাঁসী দিতে চেয়েছিল। শালার জান লিব বলেছি—হাঁ আব শালার জান লিব। জরুর লিব। চল্ আভি চল্।

ক্যা—ক্যা শব্দে সে গাড়ির ঘোড়াটাকে চাবুক মারছে। গাড়িটা ছুটছে।

পথে ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে সে চমকে উঠেছিল। বাড়িতে নেমে ছুটে উঠে গিয়েছিল উপরে। বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল ঘরের মধ্যে।

ফাদার এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন—জন!

সে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। ফাদার বলেছিলেন—জন—তুমি আমার ছেলে জনের মত—তোমার সঙ্গে তার পার্থক্য সত্ত্বেও তুমি আর সে আমার কাছে এক হয়ে গেছ। তার রঙ কালো ছিল। যে দিন তোমাকে কুড়িয়ে আনি জন—সেদিন তোমার উপর ময়লা পড়ে কালো দেখিয়েছিল। আজ মনে হয় জন বেঁচে থাকলে সেও তোমার মত সুন্দর হত, ফরসা হত। তোমার মধ্যে আমি সত্যই তাকে দেখতে পাই। পাই বলেই তোমাকে আমি ছাড়তে পারি নি—ছাড়বার কল্পনাও করতে পারি না।

তাঁর চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এসেছিল। সে শুষ্ককণ্ঠে সভয়ে শুধু বলেছিল—ফাদার! তার ভয় হয়েছিল ফাদার তাকে বোধ হয় এখুনি বের ক'রে দেবেন। তার অপরাধ সে জানে। লনার মুখ দেখে, ফাদারের চুপ ক'রে বসে থাকা দেখে, ওই বেবী

কৃষ্ণার কথা শুনে তার বুঝতে বাকী থাকে নি যে তার ভিতরটাকে সে ঢেকে রাখতে পারে নি। অপরাধও বোধ করেছে সে।

ফাদার কিন্তু শুধু বলেছিলেন—Be good my boy—only be good.

সে স্তব্ধ মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল। ফাদার চলে গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসে বলেছিলেন—Be good to me—be good to Luna—আমাদের ভালবাস; আমরা দুজনেই ঈশ্বরকে ভালবাসি—আমাদের জন্যে তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস—আমরা দুজনেই তোমাকে ভালবাসি—তুমি নিজেকে ভালবাস। Be good to God—be good to yourself.

আবার চলে গিয়েছিলেন। আবার এসেছিলেন। পাকে পাকে এসে কখনও বলেছিলেন—সংসার বড় পিচ্ছিল জন, আর বড় নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন—পড়ে যদি যাও তোমাকে মাড়িয়ে চলে যাবে। আর এই গানের পথ—একটা প্রান্ত চলে গেছে অন্ধকারে নরকে—অন্য পথ সোজা ঈশ্বরের পদপ্রান্তে শান্তিতে সুখে সান্ত্বনায়। আমার সাধ তোমাকে আমি দেখব পবিত্র সুখী সৎ। অনেক কল্পনা আমার। লনা পবিত্র মূর্তিমতী পবিত্রতা—সরল নিষ্পাপ কিন্তু দুর্বল অক্ষম—তোমার হাতে দিয়ে--

ফাদার চুপ ক'রে গিয়েছিলেন। চলে গিয়েছিলেন।

সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল—তারও সেদিন কান্না পেয়েছিল—কেঁদেছিল। কিন্তু কাঁদতেও ভাল করে পায় নি। যখনই পথে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ উঠেছে সে ভয়ে চমকে উঠেছে।

হঠাৎ একসময় অনুশোচনায় অধীর হয়ে সে ফাদারের কাছে গিয়ে বলেছিল—ফাদার।

—জন।

—আমাকে ক্ষমা করুন ফাদার।

মুহূর্তে তিনি উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। লনার

কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। মিটে গিয়েছিল। লনাও হেসেছিল—তার গানের প্রশংসা করেছিল।

একসময় সে বলেছিল—ফাদার!

—জন!

—রামেশ্বরকে দেখলাম। পল্টনের সঙ্গে যাকে পুলিস ধরেছিল নানীর খুনের জন্য।

—কোথায়?

সব শুনে ফাদার বলেছিলেন—তার জন্যে ভয় কি? তারা কখনও এ বাড়িতে ঢুকতে সাহস করবে না। আর তুমি তো রাস্তায় বের হও না। এবং এই জন্যেই তোমাকে বের হ'তে দিই নে—বারণ করি। ডোণ্ট ওরি। যাও, শুয়ে পড়, ঘুমোও। কোন ভয় নেই। Be good, be brave, Coward হবে কেন?

সে শুয়েছিল—ঘুমিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু সে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কখন—মনে হয়েছিল কালো শাড়ি ব্লাউস পরা কালো মেয়েটি তাকে বলছে, আমি রোশনি।

অন্ধকার ঘরে তার চোখের সামনে কত বিচিত্র কল্পনার ছবি ফুটে ফুটে উঠেছিল।

পল্টন রামেশ্বর বেবী কৃষ্ণার হাত চেপে ধরেছে—বলছে—তুই রোশনি।

সে চীৎকার করছে—জন!

জন ছুটে গিয়ে লাফিয়ে পড়েছে—হাতে তার একটা অস্ত্র।

কি অস্ত্র সেটা? তলোয়ার—

না। রিভলবার। সে রিভলবারের লাইসেন্স নিয়ে রিভলবার কিনবে। পাবে। নিশ্চয় পাবে। সেটা কোমরে বেঁধে ঘুরবে। সেটা বের করবে—খবরদার!

পিছিয়ে যাবে পল্টন রামেশ্বর। তাকে সেলাম ক'রে পিছিয়ে যাবে।

কল্পনার অসম্ভব সম্ভব নেই। কল্পনা করেছিল সে।

হঠাৎ ঘড়িতে সেদিন ঢং ঢং করে তিনটে বেজেছিল। তারপর ঘুম এসেছিল আবার। তার নতুন জন্মে—প্রতিরাত্রেই ঘড়ি বাজে। কোন দিন বারোটা, কোন দিন একটা—সেদিন তিনটে।

* * *

আজ তিনটে নয় চারটে বাজল। ঢং ঢং ঢং ঢং! জন বাইরের দিকে তাকালে। আকাশ ঘষা কাচের মত ফ্যাকাশে হয়ে আসছে; তারা নিভে যাচ্ছে। ওঃ!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে—ওঃ! সারাটা রাত্রি নিজের অতীত কথা। সব খতিয়ে খতিয়ে বিচার ক'রে এসেছে সে। আরও আছে। এই ক বছরের কথা। ফাদার—তোমার কাছে ঋণ তোমার যত্ন—এ সে শোধ করতে পারবে না। শতমুখে সে স্বীকার করবে। বলবে—যে ঈশ্বরের কথা তুমি বল—যার নাম তুমি নিত্য গানের মধ্য দিয়ে তার বুকে মনে গেঁথে দিয়েছ—যার মহিমার কথা মুখে বলেছ, বাইবেল থেকে শুনিয়েছ—মুখে বলিয়েছ—পড়িয়েছ; সে ঈশ্বরের চেয়েও তোমার কাছে আমার বেশী ঋণ। বিশ্বাস কর—তোমার জন্য, লনার জন্য তাঁকে সে চেয়েছে—তাঁকে পাবার জন্য যেমন পবিত্র হ'তে বলেছ তেমন হবার জন্য যে প্রাণপণ সাধনা, সাধনা যদি না-বল তবে চেষ্টা,—চেষ্টা সে করেছে। সে তোমাদের সুন্দর কথা শিখেছে। বস্তির কথা আচরণ সব কিছুকে সমাধি দিয়েছে—দিতে পেরেছে। এমন কি সে ঈশ্বরকে জানতে চাও বোঝাতে চাও, দিনের বেলা পরিপূর্ণ আলোর মধ্যে সত্যই সে তাকে মানে, তাকে অনুভব করে। ঘর থেকে তাকে বের হ'তে দাও না—ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে সে তাকায়—তরুণী যুবতীদের দেখে তার চিত্তে চাঞ্চল্য চমক দিয়ে জাগে—সে স্বীকার করে কিন্তু সে নিজের চোখ ফিরিয়ে নেয়

নিজেকে শাসন করে। সে জানে, ফাদার তুমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য কর; তবু সে বলবে—সন্দেহ তোমার সত্য হলেও মিথ্যা। রাত্রে, একা অন্ধকারে যখন থাকে সে তখন রোশনি এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়। তার সামনে হাসে, ইশারা ক'রে ডাকে।

হ্যাঁ, লনা, তোমার কথা সত্য—হ্যাঁ সে একটি মোহময়ী নারীর ছবি সংগ্রহ ক'রে রেখেছে। ডেভিডের বাড়ি থেকে ক্যালেণ্ডারের ছবি সংগ্রহ করে এনে কেটে—লুকিয়ে রেখেছে। রাত্রে সে-ছবি বের ক'রে সে দেখে। তাকে রোশনি, my darling বলে ডাকে। তার জ্বরের মত উত্তাপ হয়। সে উত্তাপে তুমি পীড়া অনুভব কর, তোমার ঠাণ্ডা হাত—তার স্পর্শেও তার যেন শীত ধরে।

তোমরা আমাকে মুক্তি দাও। মুক্তি দাও। তাকে এই পৃথিবীতে ক'রে খেতে দাও। সে গান শিখেছে। ভাল গাইতে পারে। বাজাতে পারে। তার নাম অনেকে জেনেছে। হারমোনিয়ম মেরামত ক'রে ডেভিড তাকে সুযোগ এনে দিয়েছে। সুন্দর সুযোগ। একটা অ্যামেচার থিয়েটারে বেহালা বাজাতে হবে —তার সঙ্গে এক সিনের একটা গানের পার্ট আছে। ডেভিড বলেছে—এ গান তুমি যেমন পারবে জন, কেউ তা পারবে না। তোমার গলায় একটা ঝ'ড়ো উল্লাস আছে। এটা একটা ভিক্ষুকের গান।

সে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

ডেভিড শুধু এইটুকুই বলে নি আরও বলেছে—বলেছে, জন, তুমি জান না তুমি কি করতে পার! ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে থেকে কি করছ, কি করবে তুমি জান আর ফাদার জানেন। ফাদার তোমাকে হয়তো বিখ্যাত ওস্তাদ ক'রে তুলতে চান। কিন্তু কি হবে তাতে তোমার? কি পাবে জীবনে? এদিকে তোমার সময় চলে যাচ্ছে। আজ যদি তুমি আসরে নাম—আমি ভবিষ্যদ্বাণী

করছি—তুমি তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশে হিরো হয়ে যাবে। টাকা তোমাকে খুঁজে বেড়াবে। তোমাকে টাকা খুঁজতে হবে না। লোকে তোমাকে দেখে পাগল হবে। তারপর যদি বম্বে যেতে পার—যাবে তুমি—আমি বলতে পারি তুমি যাবে।

সে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ডেভিডের মুখের দিকে।

অনেক কল্পনার ছবি ভেসে গিয়েছিল তার মনের মধ্যে। মস্ত বড় বাড়ি, সুন্দর গাড়ি—ফাদারকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে আলাদা। ফাদারকে আর কাজ করতে দেবে না। লনা—লনার জন্যে অনেক কিছু করেছিল মনে মনে। সুন্দর ক'রে সাজিয়েছিল।

বারেকের জন্য—না—বারকয়েক অকস্মাৎ উঁকি মেরেছিল একটি কালো মেয়ে। না—সে বেবী কৃষ্ণা নয়। তবে একটি কালো মেয়ে। তাকে সে চিনতে চায় নি। তাকে সরিয়ে দিয়েছে। তার মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।—না—তুমি না। তুমি না।

রামেশ্বর পল্টনও উঁকি মেরেছে। তারা তাকে সেলাম করেছে। বলেছে—একঠো ট্যাক্সির পারমিট ক'রে দাও জন সাব। বহুৎ ফরক হো গেয়েছে তব ভি পুরানি দোস্তির লিয়ে দেলায় দেও। তুমার ভালা হোগা ভাই।

সে হেসে বলছে—আচ্ছা। দেঙ্গে। পারমিট হো যায়গে।

তার দুনিয়া জয় হয়ে গেছে।

প্রথমবার অনুমতি দিয়েছিলেন ফাদার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিয়েছিলেন। পাড়ার অ্যামেচার থিয়েটার। বলে দিয়েছিলেন—অন্যায় করেছ জন—আমাকে জিজ্ঞাসা না-ক'রে তুমি কথা দিয়েছ। কিন্তু এই প্রথম এবং এই শেষ। তোমার এ পথ নয়। এ পথ তোমার পক্ষে বিপজ্জনক এবং শুধু তাই

নয় তোমাকে আমি একজন বড় সংগীতজ্ঞ করতে চাই। আমার অনেক স্বপ্ন জন।

সেবার জন অভিনয় করেছে, গানও গেয়েছে কিন্তু যা কল্পনা করেছিল তা হয় নি। কিন্তু যে স্বাদ সে পেয়েছে তা ভুলতে সে পারে নি। খ্যাতি সে বিশেষ পায় নি। অভিনয়ের মধ্যে সে চঞ্চল হয়েছিল। উৎসাহিত হবার মত কিছু ছিল না। প্রথমটায় নিরুৎসাহিতই হয়েছিল। বাড়িতে এসে ফাদারকে বলেছিল

ওতে আর যাব না ফাদার!

ফাদার সস্নেহে মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—I am glad. অত্যন্ত খুশী হয়েছি আমি। ও পথ তোমার নয়। আমি জানি।

লনা একটু তরল কৌতুকে চঞ্চল হয়ে বলেছিল—এত ভয় পেয়ে গেলে কেন? কাকে দেখে? গলা কাঁপছিল—হাত পা কাঁপছিল তাও বোঝা যাচ্ছিল।

সে হেসে বলতে চেয়েছিল—তোমাকে দেখে। কিন্তু তাও পারে নি। কারণ তার দৃষ্টি লনার উপর একবারের জন্যও আবদ্ধ হয় নি। ভয় সে পেয়েছিল। গানের আসরে সে গান গেয়েছে দুবার কিন্তু সে যেন আলাদা ব্যাপার; অনেকক্ষণ আসরে বসে থাকবার সুযোগের মধ্যে ভয় কেটে গিয়েছিল; তা ছাড়া প্রথমবার পাশে তানপুরা ধরে বসেছিলেন তার গুরু। দ্বিতীয়বার ছিলেন ফাদার। এবার সে একা। তা ছাড়া শুধু গান নয়, তার সঙ্গে অভিনয়। আরও ওই ভয়ের সঙ্গে একটি অতি গোপন কথা ছিল—ওই অল্প সময়ের মধ্যে খুঁজেছিল সব থেকে মোহময়ী কোন একটি মুগ্ধ মুখ। গান শেষ ক'রে ফিরে গিয়ে সে নিরুৎসাহিত হয়ে বসে ছিল; ডেভিড প্রশ্ন করেছিল— নার্ভাস হলে কেন?

সে উত্তর দেয় নি। অভিনয় করছিল তিনটি মেয়ে—তারা হাসাহাসি করেছিল। বাড়ি ফিরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্থির করেছিল—না। ও আর নয়।

শুধু তাই নয়, সে দিন রাত্রে অন্ধকার ঘরে কল্পনা ছুটেছিল তার বিচিত্র পথে। রোশনি বেবী কৃষ্ণা মিশে সেই মেয়েটি এসে দাঁড়ালে সে মুখ ফিরিয়েছিল। কল্পনা করেছিল সে, ফাদার যা বলেছেন তাই করবে। সে গান শিখবে—সেই ফাদারের গল্পের গানের মত গান।

ফাদার বলেছিলেন—দু' তিনবার বলেছেন কাহিনীটা। "তখন গানের জন্য একটা পিপাসা নেশার মত ধরেছে। স্ত্রী চলে গেলেন —ডাইভোর্স হয়ে গেল। আমার ধর্মযাজকত্বের পদ ছাড়তে হ'ল, তবু এ নেশা গেল না। গান শুনে বেড়াই নানান আসরে। সেটা তখন বড় বড় ধনীর বাগানে আসরের যুগ। বড় বড় গাইয়ে আসেন—ওস্তাদ—বাঈ—তাদের নিয়ে আসর বসে। সম্ভ্রমের আসর। আশ্চর্য উপভোগ্য শিল্পের আসর। শিল্পের সে কারিগরি, সে চাতুর্য দুর্লভ হীরে জহরতের গায়ে থেকে ঠিক্‌রে-পড়া আলোর ছটার মত ছড়িয়ে পড়ে। তার সঙ্গে হাস্যরসিকতার বিলাস, গায়কের সঙ্গে বাদকের আড়ি প্রতিযোগিতা। সে এক অদৃশ্য তলোয়ার খেলা। মন ভরে নিয়ে ফিরে আসি—কিন্তু এসে হয়তো সকাল হ'তে হ'তে ভরা মন খালি হয়ে যায়।

এইখানে প্রতিবারই ফাদার হেসে বলেছেন—সেই—যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে—কিন্তু রাত্রিশেষে ঘুম ভেঙে দেখি—ধুলো!

তারপর ঘটল দারুণ বিপর্যয়। এক রাত্রে—। মহা দুর্যোগে —সেই দুর্যোগে সব হারিয়ে গেল। তবু গান ছাড়তে পারলাম না। শুনে বেড়াতাম। বেশী ক'রে শুনে বেড়াতাম। কিন্তু অতৃপ্তি অশান্তি কিছুতেই ঘুচল না। এই সময় একদিন আমার এক অধ্যাপক বন্ধু এসে বললেন—এক বড় সন্ন্যাসী গায়ক এসেছেন —গঙ্গার ধারে এক শেঠজির বাড়ির ঘাটের পাশে আছেন। তিনি কোন মজলিসে গান করেন না। তবে সময় আছে—সেই সময়ে

নিজে গেয়ে থাকেন। যারা যায় শুনতে পায়। যাবে? সব থেকে ভাল সময় খুব ভোরবেলা, তখন ভিড় থাকে কম।

খুব ভোরবেলা গেলাম। একটু দূর থেকেই তানপুরার ধ্বনি আর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। দেখলাম এক বিখ্যাত বাঈজী হাত জোড় ক'রে বসে। আর দু'তিনজন কলকাতার বড় ওস্তাদ বসে। স্তব্ধ স্থির; শুধু তাই নয়—মনে হ'ল সব বাতাস পর্যন্ত স্থির। সব ভরে গেছে তানপুরা আর তাঁর সুরের ঝংকারে। শুধু একটি শব্দ—রাম—রাম—রাম—রাম—রাম—রাম। শিল্পের খেলার চমক নেই কিন্তু সব আছে। চোখ বন্ধ ক'রে গাইছিলেন—দেখতে দেখতে দুটি জলের ধারা নেমে এল। আমার চোখেও এল। তিনি গান শেষ ক'রে তানপুরা রাখলেন, দেখলাম সবাই চোখ মুছছেন। ভৈরবীর আমেজ যেন গন্ধের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল চারিপাশে। তিনি হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলেন—সকলেই করল—বন্ধুও করলেন। তারপর মৃদুস্বরে পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—গানের আলাপ কখন করেন?

পাশের ব্যক্তিটি বলতে গেলেন কিছু কিন্তু তার পূর্বেই সন্ন্যাসী হেসে বললেন—আলাপ? আলাপ কার সঙ্গে? রামজীর সঙ্গে আলাপ তো হয়ে গেল বাবা। রাজা বাদশার দরবারে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ভারী ভারী বাত বলতে হয়—দুনিয়ার বাদশা সাহানশাহ অনেক অনেক অনেক। ইনি তো তাদেরও মালিক। এর সম্বন্ধে কিছু বলতে হয় না—শুধু নাম। রাম—রাম—রাম—রাম। ব্যাস!

মন আমার ভরে গেল জন। সে মন সারাদিন সারারাত্রি গেল, খালি হ'ল না। এ গান যে গাইতে পারে তার সব ভরপুর! এই হ'ল গান।"

এ গল্প শুনে তার বিশ্বাস কোনদিন হয় নি, ফাদারের গল্পে অবিশ্বাস নয় তাঁর ব্যাখ্যায় বিশ্বাস সে কোনদিন করে নি।

প্রকাশ্যে সে-কথা বলতে পারে নি কিন্তু মনে মনে অবজ্ঞা করেছে।

সেদিন রাত্রে কিন্তু কল্পনা করেছে—এই গান—এই গানে সে সিদ্ধ হবে। যে সব মেয়েরা আজ হেসেছে, ঠোঁট বেঁকিয়েছে তারা প্রশংসা শুনে শুনতে আসবে—ওই কালো মেয়ে সেও বাঁকা হাসি হাসতে হাসতে আসবে—মনে মনে বলবে—ভাল—দেখি তো কেমন গান গাইছে সেই ভিখমাঙা বাচ্চি—সেই ফাদারের বাচ্চা জন যার চোখের চাউনি নাকি জিভের মত! তারা সবাই এসে স্তব্ধ হয়ে যাবে—চোখ দিয়ে জল পড়বে। চোখ মুছে প্রণাম ক'রে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে উদাস মন নিয়ে ফিরে যাবে। সেও উদাসভাবে চেয়ে থাকবে।

লনা এসে তানপুরা উঠিয়ে রাখবার সময় বলবে—একবার তাকাও আমার দিকে। খাও কিছু।

পরের দিন সকালে উঠে নিজেই তানপুরা নিয়ে বসেছিল। পরপর দু' তিন দিন। তারপর আর ভাল লাগে নি। আরও কয়েকদিনের মধ্যে মন আবার চঞ্চল হয়েছিল—অস্থির হয়েছিল। মনে সংশয় উঠছিল—প্রশ্ন করেছিল নিজেই নিজেকে—কেন পারবে না? একবার সে স্টেজে নার্ভাস হয়েছিল বলে কি বার বার হবে! মন আবার ছুটেছিল নতুন কল্পনায়। পারবে। এবার সে পারবে। চোখের সামনে সে দিনের বেলাতেই হাজার মুগ্ধা রূপসীর মুখ ভেসে উঠেছিল। নিষ্পলক উজ্জ্বল মুখ। কালো রঙের মধ্যে ঝিকিমিকিতে জ্বলজ্বল করছে টানা লম্বা চোখ দুটি। ওদের পেছনে হর্ন বাজছে মোটরের। সরে যায় ওরা। এসে দাঁড়ায় ঝকঝকে গাড়ি। ড্রাইভার সেলাম করে। ড্রাইভার কে? ড্রাইভার-ক্যাপে চেহারাটা বদলালেও চেনা যাচ্ছে। রামেশ্বর। গাড়িতে চাপলেই গাড়ি চলে। মস্ত বাড়িতে এসে থামে। দেখতে

দেখতে বাড়ি গাড়ি কালো মেয়ের মুখ—সারি সারি মুখ—সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সে এবং একসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডেভিডের বাড়ি চলে গিয়েছিল। এখন সে দিনের বেলা বের হয়। সে ভয় তার অনেক কেটেছে। বালক নয় সে—জোয়ান এখন। ফাদারও বাধা দেন না। তবে সন্ধ্যার আগে ফেরে—নিজেই ফেরে।

ডেভিডকে গিয়ে বলেছিল—ডেভিড আর একবার চান্স ক'রে দাও তুমি। এবার আমি ঠিক পারব।

ডেভিড তাকে ভালবাসে। ফাদারের দ্বারা ডেভিড উপকৃত। সে বাজনা মেরামত করে—ফাদার তাকে অনেক জায়গায় কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়াও জনকে তার ভাল লাগে। সে বলেছিল—আমিও ভেবেছি জন। তুমি যতটা ভাল হয় নি মনে করেছ তা ঠিক নয়। আর দু'একটা অ্যামেচার ক্লাব আমাকে বলছে। কিন্তু যে-সে অ্যামেচারে প্লে করলেই এমনি হবে। তোমার পার্টের কথা ভাবছ তুমি কিন্তু ওদের গোটা প্লেটা কি হয়েছে? একেবারে ফেলিওর! ওরা যদি জমাতে পারত দেখতে তোমার অংশটাও জমে যেত। প্লে করতে হলে ভাল অ্যামেচার দেখে নামতে হবে। সে আমি দেখছি। দাঁড়াও না। কিন্তু famous হয়ে আমাকে ভুলবে না তো?

সে বলেছে—নেভার। ঈশ্বর—

—এই দেখ! ঈশ্বর কেন এর মধ্যে? আমি বিশ্বাস করছি।

পরশু বিকেলে ডেভিড খবর এনেছে। একটু দূরেই ডেভিডের বাসা—ওদের জানালায় দাঁড়ালে কথা শোনা যায় না, দেখা যায়। সে হাত নেড়ে ডেকেছিল। ডেভিড বলেছিল—পেয়ে গেছি। ভাল অ্যামেচার ক্লাব। মতিমহলে আমি অর্গ্যান টিউনিং করছিলাম—ওখানে আমার পরিচিত—মন্টু মিত্তির—খুব নামকরা অ্যামেচার

প্লেয়ার ডিরেক্টারের সঙ্গে দেখা হ'ল। নতুন দল করেছে—'স্বপ্নলোক'। স্টেজ ভাড়ার জন্যে এসেছিল—নতুন বই নামাবে। আমি বললাম তোমার কথা। সে নিজেই বললে—মিস্টার ডেভিড, এমনি ছেলে তো অনেক পাই—আমার দরকার গান গাইতে পারে এমন ছেলে। আমি বললাম—ঈশ্বর তোমার জন্যে এ ছেলে তৈরি ক'রে রেখেছে এবং আমি তার দূত। বলেছে—এক্ষুনি নেব। তুমি নিয়ে এস। অবশ্য পছন্দ হওয়া চাই। আমি বলেছি—পছন্দর গ্যারান্টি দিচ্ছি বা বাজি রাখছি। বলেছে—ঠিক আছে। পছন্দ হলে নেব এবং এমনি নেব না, টাকা দেব। ভাল, ঠিক মনের মত হ'লে প্লের রাত্রে তিরিশ আর রিহারস্যালে যাওয়া আসার জন্যে একটা টাকা।

গিয়েছিল সে কাল। মণ্টু মিত্তির তাকে দেখেই মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছে—করেছ কি মিস্টার ডেভিড, এই ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছ এতদিন? চেহারাতেই মাত করবে যে!

গান শুনে আরও খুশী হয়েছে। বলেছে—যা চাচ্ছিলাম—যা খুঁজছিলাম। ফাইন্যাল।

ডেভিড বলেছিল—আরও আছে স্যার মন্টি। মণ্টু মিত্তিরকে দলের লোক বলে স্যার মন্টি।

মণ্টু প্রশ্ন করেছে—সেটা কি? ম্যাজিক কিংবা ফিজিক্যাল ফিটস? অর ভেন্ট্রিলুকেইজিম? ও তিনটেতেই আমার অরুচি। আমার দলে চলবে না। আমি ভাদুড়ী দি গ্রেটের ছাত্র; স্যাটু সেনই প্যাঁচ কি ওই আলোকসম্পাত পর্যন্ত ভালবাসি না।

—না—না। ম্যাজিক না—প্যাঁচ না—খাঁটি আর্ট—মিউজিক। খুব ভালো বেহালা বাজায়।

তার হাতখানা চেপে ধ'রে মিত্তির বলেছে—তুমি যে রত্ন হে! কাল থেকে এস। বেহালা নিয়ে এস—শুনব। ভাল হলে আমাদের অর্কেস্ট্রাতেও নিয়ে নেব। Tomorrow।

—আসব।

—ঠিক তো?

—ঠিক্।

—আমাদের শো একটি হবে না। অনেকগুলো শো হবে। এবং মন্টি মিত্তিরের ক্লায়াণ্ট শহরের সব এলিট। বুঝেছ। এখানে সাকসেস্ মানে এ গ্রেট থিং। রিহারস্যাল রোজ। প্রতিদিন আসতে হবে। চারটে শার্প। ডিসিপ্লিন স্ট্রিক্ট। রিহারস্যাল এই ঠিকানায়। পঞ্চাশ টাকা দেব আমি। এবং রিহারস্যালে আসা যাওয়া খরচা, বাই ট্রাম অর বাস্।

খুব খুশী হয়েছিল জন। সন্ধ্যায় ফাদারকে বলেছিল—আর একটা চান্স আমি পেয়েছি ফাদার!

—চান্স? কিসের?

—ভাল থিয়েটার পার্টি এরা। অনেক নাম এদের।

—কিন্তু—তুমি তো—

অসহিষ্ণুভাবে মাঝখানে বাধা দিয়ে জন বলেছিল—বলেছিলাম। কিন্তু সে আমি ঠিক বুঝি নি।

—ঠিক বুঝেছিলে জন। এটাই তুমি ভুল বুঝেছ।

—ফাদার! এবার যদি না পারি—ফেল করি তবে আর কখনও বলব না।

—ফেল করার কথা নয় জন। পারতে হয়তো পার তুমি। কিন্তু—

—কিন্তু কি ফাদার?

সে অকস্মাৎ শক্ত হয়ে উঠেছিল। একটা নিষ্ঠুর আঘাত যেন অতর্কিতে তাকে এসে লেগেছিল। তার কথায় যা প্রকাশ পায় নি তা তার দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছিল। রূঢ় হয়েছিল দৃষ্টি—শরীর স্থির শক্ত হয়ে উঠেছিল। ফাদারও স্থির হয়ে গিয়েছিলেন—বলেছিলেন—জন!

—What do you mean Sir ?

—I mean nothing wrong my boy.

—তা হ'লে কেন যাব না আমি ?

—যাবে না জন, কারণ এ পথে তুমি খুব বড় হ'তে পারবে না।

—খুব বড় হ'তে আমি চাই না ফাদার।

—জন !

জন বলেই গিয়েছিল—কি ছিলাম আমি জানি। খুব বড় হওয়া আমার ভাগ্য নয়। আমি আর দশজনের মতই খেটে খাব। তাতে আমার দুঃখ থাকবে না।

—জন !

—আমি বন্দী হয়ে রয়েছি। আমি বড় হয়েছি—উপার্জন করতে পারি—আপনি আমাকে দেবেন না উপার্জন করতে। না ফাদার, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

ফাদার এবার বলেছিলেন—তুমি উত্তেজিত হয়েছ জন। এখন এ সব কথা থাক।

—না। থাকবে না। আমি তাদের কথা দিয়েছি।

—আমি নিজে গিয়ে কথা ফিরিয়ে আনব।

—না।

—না নয় জন। হ্যাঁ। তোমাকে তুমি জান না। আমি জানি। গানের পথ—অভিনয়ের পথ বড় পেছল জন। তোমার মধ্যে—। থাক সে সব কথা জন।

—না ফাদার, থাকবে না। আপনার সন্দেহের কথা আমি জানি। আপনারা আমাকে সন্দেহ করেন। আপনি করেন, লনা করে। এভরিবডি। কেন সন্দেহ করেন আমি জানি না। আমি অসৎ নই। সৎ হ'তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। তবুও যদি না পেরেছি তবে আর আমি পারব না। আপনাদের এই

শুচিবাই, পবিত্রতার বাতিক—ঈশ্বর ঈশ্বর ব্যাধি—এ আমার সয় না—সহ্য হয় না। আমি পাপী। আমি মানুষ।

লনা চাচী স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল। তাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কাকে কি বলছে জন! এই কথার পর চাচী চীৎকার ক'রে উঠেছিল—না—তুই মানুষ নস জন। তুই অমানুষ। তুই অকৃতজ্ঞ।

গোমেশ নেই। সে অসুস্থ হয়ে চলে গেছে বেনাগড়িয়া। সে থাকলে গর্জন ক'রে উঠত হয়তো। কিন্তু জন সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল—তার সকল সঞ্চিত ক্ষোভ আজ বেরিয়ে এসেছিল বাঁধভাঙা জলের স্রোতের মত। সে চাচীর কথার উত্তর দেয় নি ; সে রূঢ়ভাবে ফাদারকেই বলেছিল—আমাকে ছেড়ে দিন, আপনাদের মনোমত পবিত্র হবার মত শক্তি আমার নেই। সাধ্য আমার নেই। আপনারা আমাকে করুণা করেন—তার সঙ্গে ঘৃণা করেন। আমি প্রতিমুহূর্তে অনুভব করি। আমার তা অসহ্য। দয়া ক'রে আমাকে মুক্তি দিন।

কথা বলতে বলতে তার উত্তাপ যেন আগুনের শিখা হয়ে জ্বলে উঠেছিল—সে বলে বসেছিল—ভেবে দেখেছেন আমাকে কি করেছেন ?

চমকে উঠেছিলেন ফাদার—প্রশ্ন করেছিলেন—কি বলছ—কি করেছি জন ?

—ঠিক বলছি। আমাকে পরাধীন অন্নদাস করেছেন। কি আমি ? অনুগ্রহজীবী ভিক্ষুক। উপার্জন করতে চাইলেও দেবেন না।

—তুমি কি আমার স্নেহে বিশ্বাস কর না জন ? অনুভব করতে পার না ? রাত্রে শীতের দিনে উঠে তোমার কম্বল সরে গিয়েছে কি না দেখি—গ্রীষ্মের দিনে—

বাধা দিয়ে জন বলেছিল—না—গোয়েন্দাগিরি করেন। আমি

বিছানায় আছি কি না দেখেন। আপনারা ভুলতে পারেন না আমি একদিন ছিলাম বাচ্চি—পথের ভিক্ষুক ছেলে, বস্তির অভ্যাস—। আমাকে সন্দেহ করেন, ঘৃণা করেন। শুনুন—আমিও আপনাদের ঘৃণা করি।

লনা চীৎকার ক'রে উঠেছিল—জন!

সে বুঝতে পেরেছিল কত বড় অন্যায় কথা বলেছে। সে হাত জোড় ক'রে বলেছে—আমি হাত জোড় ক'রে মাপ চাচ্ছি—আমাকে ছেড়ে দিন—মুক্তি দিন। আমার ভাগ্য মত উপার্জন ক'রে খেতে দিন।

ফাদার তবু বিচলিত হঁন নি—বলেছেন—এখনও সময় হয় নি জন। আমি নিজে থেকে যেতে দিতে পারব না। বলে চলে গিয়েছিলেন নিজের ঘরে।

চাচী তাকে নিষ্ঠুর তিরস্কার ক'রে লনার হাত ধরে ও ঘরে চলে গেছে। সে সেই সারাটা রাত্রি ভেবেছে—হিসেব করেছে—নিকেশ করেছে—কয়েকবার চলে যাবার জন্য উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আলসের পাশে; পাইপ বেয়ে নেমে যাবে। তারপর রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে নির্জন কলকাতার পথে পথে নিজেকে হারিয়ে দেবে এদের কাছ থেকে। তারপর—? জানে না সে তারপর। কিন্তু আশ্চর্য কথা—পারে নি। পারলে না।

ঢং ঢং ক'রে চারটে বেজে গেল। জন উঠে এসে দাঁড়াল ছাদের আলসের ধারে। পুবের আকাশ মুহূর্তে মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে আসছে, না, আর ফ্যাকাশে নেই—আলো ফুটছে। ভারী মিষ্টি বাতাস বইছে। তার রাত্রিজাগরণক্লান্ত চিন্তাতপ্ত কপালে মাথায় স্নিগ্ধতার স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে আর পারছে না। আর পারছে না।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ উঠল। চাচী উঠেছে। মুখরা চাচী আবার তাকে এই সকালেই নিষ্ঠুর কথা বলবে। গ্রাম্য চাচী

তারই মত ফাদারের ভাষা শিখছে। সেই ভাষায় বলবে—অকৃতজ্ঞ—নিষ্ঠুর—হৃদয়হীন—। সে প্রতীক্ষা ক'রে রইল। কিন্তু না—চাচী কোন কথা বললে না। মুখ তুলে সে ফিরে তাকালে পিছনের দিকে। না, চাচী নয়—লনা। লনা উঠে ও প্রান্তে বারান্দার কাঠের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় শুভ্র চোখ দুটিতে তার সেই চিরকালের বিষণ্ণ দৃষ্টি। আজ যেন আরও বিষণ্ণ। সন্দেহ হ'ল লনা কি রাত্রে ঘুমোয় নি? সেই মুহূর্তে ফাদারের দরজা খুলে বের হলেন ফাদার। ধীরপদে এগিয়ে এসে তিনি তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—জন!

সে মুখ তুলে তাকালে।

—জন, কাল তুমি ঘুমোও নি। আমিও ঘুমুতে পারি নি। অস্থিরভাবে পায়চারি করেছ শুনেছি আমি। হয়তো শুনেছি। আমি ভেবেছি। তোমার অন্তর্যাতনা বুঝি জন।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—বেশ, তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না। তুমি অভিনয় করবে বলে কথা দিয়েছ, যাও। অভিনয় কর। দেখ—ভাল ক'রে আস্বাদন ক'রে দেখ। শুধু একটি কথা দাও—

—ফাদার!

—বিশ্বাসঘাতকতা ক'র না, আমার কাছে নয়, লনার কাছে। যদি কর তবে ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তুমি। তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে তাঁর মুখের দিকে।

ফাদার বললেন—তুমি জান না, আমি জানি—আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছি। She loves you. সে দিন বেবী কৃষ্ণা সেই কালো মেয়েটির দিকে তুমি—। থেমে গিয়ে বাকীটা আর বললেন না। তারপর আবার বললেন—সে দিন রাত্রে—গভীর রাত্রি তখন—আমি কান্নার শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখেছিলাম লনা

কাঁদছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সে আমার কোলে মুখ লুকিয়ে বলেছিল—ফাদার, I love him। I love him।

নিজের কানকে জন বিশ্বাস করতে পারছিল না। বুকের ভিতরটা তার মুহূর্তে উথলে উঠল। সে যেন এক প্রবল উচ্ছ্বাস। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল—সে ছোট ছেলের মত ফাদারকে জড়িয়ে ধরে বললে—ফাদার!

মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ফাদার বললেন—জন!

—তা হ'লে যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়।

ফাদার চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—আমারও ভুল হচ্ছিল জন। তোমারও ঠিক দোষ নেই। সন্দেহ ঠিক করি নি জন তোমাকে—ভয়—ভয় হয় কোথায় কোন্ মুহূর্তে শয়তান—না—থাক। তোমার ভুল হয়ে যাবে। জীবনে বড় দুঃখ পেয়েছ জন। আমি নিমিত্ত হয়ে তোমাকে রক্ষা করেছি। কিন্তু তুমি তো জান না, তুমি আমার কি? তোমার সব ইতিহাস জেনেও যে আমি বিশ্বাস করি তুমি আমার মৃত ছেলে জন। আজ তোমায় খুলে বলি। মনে হয় তুমি সেই কবরে শুয়েছিলে—সে সময় তোমার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল—তাতে প্রবেশ করেছিল কবর থেকে জনের আত্মা। না-হলে তুমি গান শুনে ছুটে অন্যদিকে পালাতে। আমার দিকে ছুটে এলে কেন? জানি অসার যুক্তি। তবু বিশ্বাস—বিচিত্র বিশ্বাস। তেমনি চেহারা, তেমনি বয়স পেয়ে আমার জনের আত্মা তোমার মধ্যে এসেছে। মিথ্যে মিথ্যে বলেও মিথ্যে হয় নি আমার কাছে।

জন যেন গ'লে যাচ্ছিল। সে কাঁদছিল। কান্নায় ভেঙে পড়া গলায় সে বলে উঠল—ফাদার! আমাকে ক্ষমা করুন। ফাদার!

—ক্ষমা নয় জন, শুধু প্রতিশ্রুতি দাও। আর কিছু না। এ পথ ছাড়া পথ নেই। তোমার ভাগ্য তোমাকে টানছে। আমি রাখতে পারব কেন? তা ছাড়াও এইটেই বাস্তব পথ। জীবনে

পথ ক'রে নিতে হয় নিজে। সময় হয়েছে—ভাগ্য টেনেছে—যাও। শুধু বল—প্রতিশ্রুতি দাও, লনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না আর আমাকে ছেড়ে যাবে না। আমি বিশ্বাস করি তুমিই আমার মরা ছেলে জন কবর থেকে ফিরে এসেছ।

একটি মিষ্ট গন্ধ এসে জনের নাকে ঢুকল। সে বুঝতে পারলে লনা এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। সে ফাদারের কাঁধ থেকে মুখ সরিয়ে তার দিকে তাকালে—বললে—লনা—forgive me—please!

লনা মৃদুস্বরে বললে—জন!

ফাদার নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে চলে গেলেন।

জন লনার হাত ধ'রে বললে—আমাকে ক্ষমা করবে না?

লনা বললে—আমি তোমার যোগ্য নই জন, তবুও তোমাকে ভালবাসি। জন—I love you.

ফাদার ভিতর থেকে ডাকলেন—ভিতরে এস—প্রেয়ার কর।

॥ নয় ॥

মণ্টু মিত্তিরের রিহারস্যাল রুম ছোট একটা ঘর নয়—সুন্দর একটি ছোট স্টেজ সেট করা মাঝারি সাইজের হল। মণ্টুর পেট্রন আছেন কলকাতার কয়েকজন বড় বড় বাড়ির ছেলে, যাঁদের পিতা পিতামহেরা একদিন কলকাতার শিল্প-সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্তমান কালে রকমফের হয়েছে। নানান সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক রূপান্তরের ফলে সেকালের সেই বিশিষ্ট অতিথিদের নিয়ে বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের আসর আর বসে না; সেগুলি প্রকাশ্য থিয়েটার সিনেমা হলে বা প্যাণ্ডেল বেঁধে টিকিট বিক্রি ক'রে সম্মেলন নাম নিয়ে বসছে; সেখানে নগদ মূল্যে সবারই প্রবেশাধিকার। তাও এ সব সম্মেলন বছরে একটা

করেই বসে। ফলে এই সব বড় বড় বাড়ির হলগুলি পড়ে আছে ; এবং বাড়ির মালিকদেরও সমাজে সে খ্যাতি নেই। অন্য-দিকে দেশে নাটকের একটা পিপাসা বেড়েছে ; আন্দোলনও হচ্ছে। এর সঙ্গে এঁরা এবং কিছু কিছু নতুন কালের ধনীরাও জড়িয়েছেন নিজেদের। সেকালে এঁরা অধিকাংশই যেমন গানবাজনা বুঝতেন তেমনি একালে তাঁদের সন্তানসন্ততিরা অভিনয় এবং নাটকও বোঝেন। কেউ কেউ ভাল অভিনয়ও করেন। এমন ভাল যে সহজেই তাঁরা পেশাদার মঞ্চে স্থান পেতে পারেন কিন্তু সেটা মর্যাদায় বাধে এবং এমন নাটকে অভিনয় করতে হয় যে নাটকের নাটকত্ব জনরঞ্জনের চাহিদায় ক্ষুণ্ণ হয়। মণ্টু মিত্তিরের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রধান অভিনেতা এমনি একজন ধনীজন—অবশ্য তরুণ এবং আধুনিক কালের ধনীর ছেলে। স্বপ্নলোক-এর মাথা মণ্টু মিত্তির, কিন্তু মেরুদণ্ড ইনি। আগে মণ্টু মিত্তিরদের প্রতিষ্ঠান ছিল 'বাস্তবিকা' ; তার মেরুদণ্ড ছিলেন এক বনেদী বাড়ির ছেলে ; তিনজনেই বন্ধু। নবীন ধনীর ছেলে সুজিত সেখানে ছিল পাঁজরা। বাস্তবিকার নাটকগুলি হত রূঢ় বাস্তবানুগ। নাট্যকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ওই বনেদী ঘরের ছেলে। নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এদের নামও হয়েছিল খুব। অকস্মাৎ বিরোধের ফলে সে দল ভেঙে নতুন দলের সৃষ্টি।

মণ্টু এবং সুজিত বলে—অসহ্য। নাটকে ওর মতবাদের উগ্রতা অসহ্য। ডিক্টেটারি শুরু করেছেন। যা বলবেন তাই মানতে হবে। ভাল টিমওয়ার্কে বই ওতরায় কোন রকমে, কিন্তু আসল কথা আমরা জানি। এ মানতে পারব না।

বনেদী বাড়ির ছেলেটি ইংরেজী সাহিত্যের এম-এ। তিনি বলেন—নাটক আমাকে মণ্টুর কাছে শিখতে হবে না। ক-অক্ষর গোমাংস। আসল ব্যাপারটা ওদের রাবিশ লেখা অভিনয় করতে হবে। রাবিশ—রোমান্সের শ্রাদ্ধ।

—ভাল, দেখিয়ে দেব। তাই দেখিয়ে দিতেই স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়েছে।

নতুন ধনী সুজিতের বাড়িতে বড় হল ছিল না কিন্তু টালিগঞ্জে একটা লিজ নেওয়া বাগানে টিনের শেডে যুদ্ধের ভাঙাচোরা লোহা এবং যন্ত্রপাতির গুদোম ছিল, করেছিলেন তার বাপ। বাপ নেই, লোহালক্কড় যন্ত্রপাতিও প্রায়ই সব বিক্রী হয়ে গেছে। বাগান শেড সব পড়েই ছিল। সেই শেডে ছোট একটা প্রিসিনিয়াম খাটিয়ে চারিপাশগুলি পুরনো অবিক্রী টিন দিয়ে ঘিরে নিয়ে প্রবল উদ্যমে রিহারস্যালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন নাটকের গল্প সুজিতের—নাট্যরূপ দিয়েছে মন্টু মিত্তির। নতুন পরীক্ষা। অপেরার স্বাদ, কিন্তু পটভূমি হবে বাস্তব। গল্প বেদেদের জীবন নিয়ে। বেদেরা আসে, গ্রামের পাশে তাঁবু ফেলে; গান গায়, বাজি দেখায়—আবার চলে যায়। গ্রামে চুরি হয়। কখনও কখনও ছেলে মেয়েও চুরি ক'রে পালায়। এমনি একটি চুরি-করা ছেলে তার নায়ক। চুরি-করা ছেলে মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখে গাঁয়ের। নায়িকা দলের সর্দারের মেয়ে। তারা গান গায়, কলহ করে—মান অভিমান। এরই মধ্যে তারা ঘুরে ঘুরে অনেক কাল পরে এল সেই গ্রামে, যে গ্রামে ছেলেটির বাড়ি ছিল। ছেলেটির একমাত্র বিধবা বোন ছিল বেঁচে। সে ভাইকে চিনল তার একটা বিশেষ চিহ্ন দেখে। ছেলেটিও চিনতে পারল—মনে পড়ল ধীরে ধীরে। তারপর সংঘর্ষ। ছেলেটি পালিয়ে এল। কিন্তু বাড়িতে এসেও থাকতে পারল না। ওদিক থেকে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ছুরি হাতে ছুটে এসেছে তার যাযাবরী প্রিয়া। কিন্তু মারতে এসে পারল না, ভেঙে পড়ল কেঁদে। বোন দিল মুক্তি। তোরা যা। শুধু বছরে একবার ক'রে এসে দেখা দিয়ে যাস। ওদিকে তখন বেদেদের তাঁবুতে সাড়া পড়েছে—চলো মুসাফের বাঁধো গাঠেরী—।

এ অভিনয়কে সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থক ক'রে তুলবেই মণ্টু মিত্তির এবং সুজিত—তার জন্য যা সাধ্য করবেই।

মণ্টু মিত্তির শূন্য কলসী নয়। সে কাজের লোক এবং শক্তিশালী; কাজের প্রণালীতেও তার শৃঙ্খলা ব্যবস্থা—চমৎকার। ডিরেক্টার'স অফিস লেখা কাগজের বোর্ড মারা ছোট একটা কুঠরি থেকে আরম্ভ ক'রে বন্দোবস্তের ত্রুটি রাখে নি। সাইলেন্স লেখা একটা বাক্স—বাল্‌ব্‌ ফিট করে আলো জ্বেলে দেওয়া পর্যন্ত।

জন এসেছিল সকলের আগে। চুপ ক'রে বসেছিল একটা গাছতলায় একটা ভাঙা পুরনো যন্ত্রের উপর রুমাল পেতে। আজকের দিনটির মত এমন পরিপূর্ণ আনন্দের দিন তার জীবনে বোধ হয় আসে নি কখনও।

ফাদার আজ নিজে হাতে তার টাই বেঁধে দিয়েছেন। এখানে সে সুট পরেই এসেছে। লনা তার রুমালে সেণ্ট দিয়ে পকেটে গুঁজে দিয়েছে। এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছে হাসিমুখে। শুধু বলেছে—রিহারস্যাল শেষ হলেই কিন্তু চলে এসো। একলা তো থাকি নে সন্ধ্যেবেলা।

ফাদার বলেছেন—আমার কথা মনে রেখো।

জন দৃঢ়চিত্তে বলেছে—আমি শপথ করেছি ফাদার।

বেরিয়েছিল সে অনেক আগে। ছুটোর সময়। পথে সে নেমে পড়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওখানে। খোলা মাঠে বেড়িয়ে তার ভারী ভাল লেগেছে। একলা খানিকটা গুনগুন ক'রে গান গেয়েছে—খানিকটা দৌড়েছে। গাছতলায় বসে হেসেছে অকারণে। আশ্চর্য সুন্দর উত্তপ্ত উজ্জ্বল ছুপুর। এমন ছুপুর সে জীবনে দেখে নি। একটি সুন্দর ধবধবে সাদা গাই গা চাটছে তার বাচ্চার। দূরে একটা ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে ডাক ছাড়ছে। ছুটো কুকুর মাঠটাময় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

একটা গাছতলায় একটি তরুণ একটি তরুণী বসে আছে। মাথার উপর অকৃপণ উদার সূর্য। উদার পৃথিবী।

ওখান থেকে এসে বসেছে এই বাগানের গাছতলায়। চোখের উপর ভাসছিল পথে-দেখে-আসা দোকানের শোভা, রাস্তার ভিড়, পথে দাঁড়িয়ে-থাকা তরুণীর মুখ। সুন্দর চোখ—একটু খ্যাঁদা নাক—একরাশ চুল—তাতে রিবন বাঁধা। খুব সাজসজ্জা করা একটি চঞ্চলা মেয়ে বাসে উঠেছিল ভবানীপুরের উত্তর মোড়ে —কালীঘাট ট্রাম ডিপোর ওখানে নেমে গেল।

মোটরের হর্নে তার স্বপ্ন ভাঙল। মণ্টু মিত্তির আর সুজিত চক্রবর্তী এসেছেন। চোখে চশমা—লম্বা পাঞ্জাবি—পায়ের পাতা ঢাকা কাপড়, লম্বা পাতলা চেহারা মণ্টু মিত্তিরের চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। সুজিতের পরনে স্যুট। জনকে দেখেই মণ্টু মিত্তির বললেন—আফ্‌টারনুন জন সাহেব। সব থেকে আগে এসেছ! বহুৎ আচ্ছা। ইনি সুজিত চক্রবর্তী। মস্ত ব্যবসাদার, নাটকের গল্প এঁর। হিরো ইনি—life and soul of our স্বপ্নলোক। আমি স্বপ্ন উনি লোক। উনি গান পারেন না। ওঁর গান বাদ দিতে হওয়াতেই তোমার পার্ট। এস, চা খাবে এস।

দেখতে দেখতে ভরে উঠেছিল রিহারস্যাল হল। বিচিত্র ধরনের মানুষ। তারও মধ্যে বিচিত্র মেয়ে ক'টি। একটি চঞ্চলা। নাম পুতুল। পুতুলনাচের পুতুলের মত হালকা। দুজনে গম্ভীর। একজনের ববছাঁটা চুল। একজনের প্রচুর এলোচুল। রিবন দিয়ে বাঁধা। দুজনের চোখেই গগল্‌স। আরও পাঁচটি মেয়ে—তাদের যেন কদর কম। এক জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বসে আছে। পুরুষমহল ভারী। বৈচিত্র্য সেখানে অনেক। পোশাকে নয়, চলাফেরার রকমে। সবচেয়ে বিচিত্র এক বেঁটে ভদ্রলোক। সিগারেটের পর সিগারেট খান। কথা বলেই চলেছেন—চলেছেন। তার সঙ্গে হাসি। অফুরন্ত হাসি।

উনি দলের লোক নন। আবার বাইরেরও নন। সকল দলের লোক। দেখে বেড়ান—আর্টিস্ট এনে দেন, আবার এখানে নতুন পাকড়াও ক'রে অপর দলে হাজির ক'রে দেন। অপর দলের পরিধি বহুবিস্তৃত—অ্যামেচার থিয়েটার থেকে পেশাদার—তারও পরে ফিল্ম পর্যন্ত।

বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বা পরিবেশের বৈচিত্র্যের ভিতরে সবিস্ময় ভাল-লাগার মধ্যে জন কখন যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল সে তার খেয়াল ছিল না। জীবনে এমন স্বাদ কখনও পায় নি—এমন আনন্দ চাঞ্চল্য কখনও অনুভব করে নি। এই মাটির পৃথিবীতে পাপ পুণ্য বিধি নিষেধ ভয় সংকোচ সব কিছুকে পার হয়ে হঠাৎ আজ এ কোন্ অসংকোচ অবাধ উল্লাসলোকের মধ্যে প্রবেশ করলে সে। আছে—একটি জিনিস আছে—সেটা হিন্দুদের হোলির পিচকারির রঙের আচমকা স্পর্শের মত। চমকে উঠতে হয়, কিন্তু ভালই লাগে। সেটা পরিহাসের অতর্কিত রঙের ঝাপটানি।

সিগারেটের ধোঁয়া—মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ—সেন্ট—মাথার তেল—স্নো পাউডারের বিবিধ বিচিত্র গন্ধ মিশে যেন নেশা লাগছে নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

সাইলেন্স! অ্যাটেনশন প্লিজ! হাঁক উঠল। মন্টু মিত্তিরের মোটা গলা।—এবার কাজ আরম্ভ হবে। বসুন সব স্টেজের উপর। আজ প্রথম বই পড়া হবে। আমি রিডিং দেব। তারপর কার কি পার্ট বলে দেব। আসুন, বসে যান। ওদিকে সাইলেন্স লেখা বাক্সটার ভিতর আলো জ্বলে উঠল।

মন্টু মিত্তিরের সত্যিই ব্যক্তিত্ব আছে। এক ডাকেই সব এসে বসে গেল। সুজিত বললে—যাত্রা হল শুরু গান দিয়ে আরম্ভ হোক স্যার মন্টি?

—ও, কে!

—দাঁড়ান স্যার মন্টি, পুতুলের কাছে পানটা আদায় করে নি।

মাঝপথে পান ছোঁড়াছুঁড়ি তো আপনার আণ্ডারে চলবে না। বললেন বেঁটে লোকটি।

নাটক পড়া শেষ হ'ল। খুব ভাল লাগল জনের। এত ভাল লাগল যে শরীর মন মাতাল হয়ে গেল। সে মনের মধ্যে সেই সাঁওতাল পরগনার প্রান্তরে বেদেদের তাঁবু দেখতে পেলে, তাঁবুর সারি দিয়ে ঘেরা খোলা জায়গার মধ্যে ডবল বেণী ঝোলালো ইরানী বেদের মেয়ে আর ইরানী বেদে নাচলে গাইলে; গ্রামের পথে পথে ছুরি চাকু কাঁইচি ক্ষুর ফেরি ক'রে বেড়ালে।

—চাক্কু চাই। ক্ষুর (খুর) চাই। লিবে? বাবু, লিবে? বয়ুত্ বালা। আচ্ছা ছুরি—।

মেয়েদের ঘাগরা নাচের ঘূর্ণিতে তার গায়ে বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। সারা শরীরে রক্তস্রোত সনসন ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছিল— সে তা অনুভব করলে।

মণ্টু মিত্তির বললে—কেমন লাগল?

—খুব ভাল। ওয়াণ্ডারফুল। অদ্ভুত। নতুন জিনিস। নানান সাধুবাদ উঠল। শুধু সেই বেঁটে লোকটি বললে—স্যার মণ্টি, একটা কথা বলব?

—বল।

—বলব?

—তুমি বলবে না তো কে বলবে স্যার বহুরূপী?

—নতুন নামের জন্য থ্যাঙ্কস! কত নামই আর দেবে?

—Last name. তোমার বহু রূপ—সুতরাং এ নামটার পর আর দরকার হবে না। বল এখন।

—নাটক জমেছে। সিওর। কিন্তু ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ও-মাথা থেকে একদম এ-মাথায় এসে গেলেন স্যার?

—বাস্তবিকা থেকে স্বপ্নলোক তাই বটে স্যার বহুরূপী।

—ব্যাস, আর বলবার কিছু নেই। এবার আর একটা কথা। এ সব পার্ট করবে কে? বাবুরা এরা? তার থেকে চল ময়দান খুঁজে দু'চার জন ইরানী বেদে ধরে আনি।

—দেখ না মন্টি মিস্তিরের তৈরি করার কায়দাটা।

—বেশ। হ্যাট্স অফ। উইশ ইউ সাক্সেস। শুধু একটা কথা বলি—পুতুল তো ওই গানগুলো গাইবে—ওকে বলুন আমার সঙ্গে ঘুরতে দিন কয়েক; আমি ওকে বেদেদের তাঁবু দেখিয়ে ওদের ঢংঢাংটা শিখিয়ে দি।

—ওল্ড বেবী রে! মরণদশা আমার! পুতুল কথাটা এমনভাবে বললে যে হাসির একটা হুল্লোড় পড়ে গেল।

—নাও—আমার সংগ্রহ নিউ ট্যালেন্ট হাজির করব সকলের কাছে। জনি সাহেব! মিস্টার জনি!

—মি? বুকে আঙুল দিয়ে বলে উঠল স্যার বহুরূপী। কিন্তু আমি যে এম্‌টি বটল—স্যার মন্টি। জনি ওয়াকারের বোতল খালি!

—না হে, না। জনি ওয়াকারের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ। জন কল্যাণকাম বিশ্বাস। এস জন সাহেব। একখানা গান শুনিয়ে দাও তো।

কেমন হয়ে গেল জন মুহূর্তের জন্য—কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্য—তারপরই সে নিজেকে শক্ত ক'রে নিয়ে এসে বসেছিল হারমোনিয়মের পাশে।

রবীন্দ্র-সংগীতই গেয়েছিল সে। এবং ওই যাত্রা হ'ল শুরু গানটাই ধরেছিল। গেয়েছিল ভালই।

মিউজিক ডিরেক্টার হারমোনিয়মটা নিয়ে আঙুল চালিয়ে বলেছিলেন—কই, এই গানটা আমার সঙ্গে গান তো। বইয়ের গান। কথা আধা হিন্দী। সুরও তাই। তার বস্তিতে শেখা আধা হিন্দীর টানগুলি একটুও ভোলে নি সে। গানের শেষে

মিউজিক ডিরেক্টার বলেছিলেন—আপনি তো টপ্পাও গাইতে পারেন দেখছি। সুর মেলাতে একটু কষ্ট হ'ল না। হিন্দী উচ্চারণও চমৎকার। গান না একখানা হিন্দী গান।

উৎসাহে তার সব সংকোচ সব আড়ষ্টতা কেটে গেল—সে হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে আবার বসে গেল।

গানের শেষে বেঁটে ভদ্রলোক বললে—বহুৎ আচ্ছা স্যার জন। আমি তোমাকে স্যার উপাধি দিলাম।

পুতুল এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—মাই ডিয়ার! তুমি এমন! তা হ'লে তো নাচে গানে তুমিই আমার পার্টনার হবে। খুব জমবে। নামটিও খুব মিষ্টি—জন কল্যাণকাম! আমি পুতুল। সে তুমি নিশ্চয় শুনেছ।

—পুতুল, ওকে ছাড় এখন। মিস্টার জন, তুমি ভাই একবার আপিসে এস।

মণ্টু মিত্তির বললেন, তারপর ঘোষণা করলেন—ফোর পি এম শার্প টুমরো। অবশ্য মেন পার্ট যাদের। অন্যেরা ছুটায়।

মিত্তির জনকে তিরিশটা টাকা দিয়ে বলেছিলেন—এক মাসের ট্রাম বাস ভাড়ার জন্যে দিলাম। তুমি কামাই করো না জন। আরও একটা কথা বলি, যদি বইখানা স্টেজে হিট হয় তবে ফিল্ম হবেই। সুজিতকেই নামাবো। আমি ডিরেক্ট করব। তুমি চান্স পাবে। হয়তো হিরোর। কারণ তখন হিরোর পার্ট আর তোমার পার্ট মিশে যাবে। আর সুজিত ফিল্মে নামবে না। বুঝেছ? চান্স তোমার। শুধু একটা কথা বলে দি। Beware of that Putul। পুতুলকে প্রশ্রয় দিয়ো না। বাড়ি যাবে তো? চল, এসপ্লানেডে তোমাকে নামিয়ে দেব।

আজকের দিনটি অদ্ভুত। এ এক আশ্চর্য আবিষ্কারের দিন। পৃথিবীকে আবিষ্কারের দিন। আনন্দ উল্লাস নিঃশঙ্ক উদারতায় সমুজ্জ্বল পৃথিবী। আশ্চর্য স্বাধীন অবাধ পৃথিবী।

পথে লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে সে বলেছিল—এখানেই নামিয়ে দেবেন আমাকে।

—এখানে ?

একবার মার্কেটে যাব।

মার্কেটে সে ফুল কিনেছিল টকটকে রাঙা গোলাপ ফুল, লনার জন্য। আর এক শিশি সেণ্ট। ফাদারের জন্য কি কিনবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা দোকানে বেডরুম স্লিপার দেখে তাই কিনেছিল। চাচীর জন্য কিনেছিল—অনেক ঘুরে—সুতী স্কার্ফ—সস্তা অথচ বেশ সুন্দর। রাস্তায় বেরিয়ে হনহন ক'রে এসেছিল এসপ্ল্যানেড। কিন্তু কিছুক্ষণ না-দাঁড়িয়ে পারে নি। কি সুন্দর মানুষের মেলা! মেলা নয়, স্রোত। স্রোতের মত চলছে। অবিরাম অবাধ; মধ্যে মধ্যে জটলাগুলি যেন ঘূর্ণি। জনের মনে হ'ল—এদের কারও মনে কোথাও এতটুকু বেদনা নেই, ক্ষোভ নেই, আনন্দে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত। আর আশ্চর্য সুন্দর! মেয়েগুলি কি সুন্দর! কি প্রাণবতী! দাঁড়িয়েছিল সে মেট্রোর সামনে চৌরিঙ্গীর পশ্চিম দিকে। পথের উপর গাড়ি চলছে অবিরাম। বন্যার মত। এ এক অনাবিষ্কৃত পৃথিবী আজ সে আবিষ্কার করেছে।

ফাদার লনা যেন সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ের মাথায় খোঁড়া কূয়োর জল। নির্মল স্বাস্থ্যকর, কিন্তু বেগহীন স্রোতহীন—আর এতটুকু ছোঁয়াচে অশুদ্ধ দূষিত হয়ে যায়।

চল—ফিরে চল। দেরি হয়ে গেছে। লনার কাছে গিয়ে বলবে—আমার হাত ধর লনা। আমি পবিত্র। একমুহূর্ত তোমাকে ভুলি নি। নাও—ফুল নাও, আর এই সেণ্ট। আমার প্রথম উপার্জন থেকে কিনে এনেছি। আরও অনেক আনব। অনেক—অনেক—অনেক।

বাড়ি গাড়ি আলো আসবাব ফুল বাগান পোশাক—অনেক

কিছু—অনেক কিছু—একটা বড় রিভলভিং শোকেসের মধ্যে যেন চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। বাড়িতে এসে উল্লসিত পদক্ষেপে টপকে টপকে সিঁড়ি পার হয়ে উপরে উঠে এল জন—উল্লসিত কণ্ঠে ডাকলে—লনা!

লনা বেরিয়ে এল—জন হাসিমুখে লাল গোলাপের গুচ্ছ তার সামনে ধরে বললে—নাও।

—ফুল। কি সুন্দর লাল। কি মিষ্টি!

—ফুল নয় আমার হৃদয়! আর এই আমার আজকের প্রশংসা—। সেন্ট। ঠিক এমনি গন্ধ।

গাঢ় রক্তিম মুখে লনা তার দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

জন বললে—এই এনেছি ফাদারের জন্যে। স্লিপার। সুন্দর নয়?

—খুব সুন্দর। ফাদার খুব খুশী হবেন। রেখে দেব ওঁর খাটের সামনে। উনি ফিরে এসে অবাক হয়ে যাবেন।

—আর এটা চাচীর জন্যে।

—চাচী—চাচী! জন তোমার জন্যে কী এনেছে দেখ।

চাচীও খুব খুশী হল। তবুও সে বললে—খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু ওই সব কি গায়ে দিয়ে আমি বিবি সাজতে পারি? না না, আর আমার জন্যে ও সব এনো না। লনার জন্যে এনো। বসো, মুখ হাত ধোও; কিছু খাও। এতক্ষণ যা গেল!

লনা ভেবে সারা। খোঁড়া মানুষ—সারাক্ষণ ঠেঙো খটখট ক'রে ছাদের এ কোণ আর ও কোণ!

—তুমি আমার জন্যে ভাবছিলে লনা?

লনা চুপ করে রইল। চাচী বললে—ভাববে না? কখন সন্ধ্যে হয়েছে—ছেলে আসেই না—আসেই না।

—আমাকে কি বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পার না লনা?

—জন।

—আমাকে বিশ্বাস কর লনা।

—করতে চাই। কিন্তু কত আশঙ্কা যে মনের মধ্যে জাগে জন!

—I shall prove myself Luna, I shall prove myself.

জনের মনে মনে করুণা হয়েছিল, হৃদয়ভীরু অহেতুক সন্দিগ্ধ লনা! দুর্বল—বড় দুর্ব্বল তুমি। I pity you—তুমি দুর্ভাগিনী। মনে মনে বলতে বলতেই সে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল।

I pity you launa, I pity you.

॥ দশ ॥

লনা দুর্ভাগিনীই বটে।

নইলে এত সুন্দর পৃথিবী; রূপে উজ্জ্বল—রসে টলমল—হাজার রঙে রঙীন—কত গানে ঝঙ্কৃত পৃথিবী—সেই পৃথিবীকে ছেড়ে এক কল্পনার সাদা পৃথিবী, শুধু নির্মল জলে আর শান্ত একটি সুরে ভরা পৃথিবী গ'ড়ে তার মধ্যে স্বর্গের স্বপ্ন দেখে।

শুধু লনাই বা কেন? ফাদারও তাই।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে অসংখ্য নরনারীর মেলা। সে মেলা রঙীন প্রজাপতির মেলার মতই সুন্দর বর্ণাঢ্য আর চঞ্চল; তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্বকোণের চার্চটার দিকে তাকিয়ে জনের মনে পড়ল ফাদারকে এবং লনাকে। নির্জন শান্ত নিস্তব্ধ চার্চটা প্রাণচঞ্চল কর্মচঞ্চল কলকাতার মধ্যে অকারণ এতটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে। মনে হল অকারণ বিমর্ষ, অকারণ স্তব্ধ; তরঙ্গচঞ্চল সমুদ্রের মধ্যে মরা প্রবালকীটের দেহ দিয়ে গড়া প্রাণহীন একটা দ্বীপ। ধ্যান আর পবিত্রতার মোহে গড়া বহু অপব্যয়ে ও উপকরণে গড়ে তোলা একটা ব্যর্থ অথবা নিরর্থক একটা ইটকাঠের স্তূপ। চার্চের কম্পাউণ্ডে কত ফুল, কত

প্রজাপতি—গাছে পাখী—মৌমাছি—কীট—পতঙ্গ—তারা আপন খেলা খেলে চলেছে—কিন্তু মানুষের জন্য তৈরী মানুষের কত পবিত্র কল্পনায় গড়া এই সুন্দর মন্দির—সেখানে মানুষ নেই। সেই সপ্তাহে একদিন সার্ভিসের সময় তারা আসে—তারপর চলে যায়। রাস্তায় নেমে পাল্টায় হাসে—উল্লাস করে সহজ হয়। এখানে এলেই কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

ফাদার—লনা—ঠিক এমনি।

রিহারস্যালের পাঁচ দিন পর জন রিহারস্যালে যাবার পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চারিপাশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিল কথাটা।

সুন্দর স্বপ্নের মতই কাটছে তার দিন কয়েকটা। আশ্চর্য সুন্দর। সহজ, অবাধ; স্বচ্ছন্দের চেয়েও কিছু বেশী; ছন্দ একটু দ্রুত। হেঁটে চলার ছন্দ নয়—নেচে চলার ছন্দের মত ছন্দ। কি আশ্চর্য! এই জনস্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে সে। পল্টনের ভয় রামেশ্বরের ভয় কমে এসেছে। নেই। হ্যাঁ, সে ভয় আর তার লাগে না। রাত্রে ফিরবার সময়—। সে কয়েক দিন ফিরেছে মন্টি মিস্ত্রিরের সঙ্গে—তারপর থেকে বাসে বা ট্রামে। পথে হঠাৎ ফিটনের শব্দ পেলে বারেকের জন্য চমকে উঠেছে, সেও নিজের অজ্ঞাতসারে—তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু আতঙ্কের উৎকণ্ঠায় পথে কোথায় ফিটন আসছে তা সে খোঁজে নি। রাত্রের কলকাতা বিচিত্র। এ বিচিত্র কলকাতার সন্ধান—না সন্ধান ঠিক নয় আভাস—আভাস সে পেয়েছিল তার বাচ্চি-জীবনে—কিন্তু তার রূপ এমন স্পষ্ট এবং বিচিত্র ভাবে কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে নি তখন। সেই দেখতে দেখতেই রাস্তাটা ফুরিয়ে যায়। এসে নামে এসপ্ল্যানেডে—তারপর ধরে এলিয়ট রোডের ট্রাম্। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে সে এই রাস্তায় দেখা ছবিগুলিকে মনে মনে ঘৃণা করতে করতে

ফিরে আসে। বাড়িতে যখন ঢোকে তখন অহঙ্কৃত চিত্তে—নিরপরাধের দৃঢ় পদক্ষেপে বাড়ি ঢোকে।

রিহারস্যালে সে চুপচাপই থাকতে চায় এবং থাকেও। অবশ্য চোখে তার পড়ে অনেক কিছু, কানেও আসে অনেক কথা। জীবন চঞ্চল-করা কথা। রক্ত চঞ্চল-করা ছবি। কিন্তু সে নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখে। মনে মনে উচ্চারণ করে দুটি কথা। ফাদার, লনা। তারা যেন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে তার মনের ভিতর। কখনও কখনও তাদের চোখ যেন ছলছল করে।

চঞ্চল করতে চায় তাকে পুতুল। মেয়েটা চঞ্চলা। ওর স্বভাবই ওই। আলাপের জন্য ছুঁতো ওকে খুঁজতে হয় না। গায়ে পড়ে এসে আলাপ করে না। আলাপ যেন ওর জন্ম-জন্মান্তরের, চেনাশোনা হয়েই আছে; সেই ভাবেই এসে ডিবে থেকে পান বের ক'রে বাড়িয়ে ধরে বলে—নিন। আছেন কেমন?

আবার বেশী চেনা কেউ এসে হাত পাতলে বলে—একটি পয়সা দিচ্ছি, বাইরে থেকে কিনে এনে খাও। তোমাকে দেবার মত পান নেই। ফুরিয়েছে।

আর মেয়েদের মধ্যে দুজন প্রধান। সুমি সেন গম্ভীর, সারাক্ষণ গগলস পরে বসে থাকে গম্ভীর মুখে। কেউ বলে—বি-এ পাশ, কেউ বলে বি-এ ফেল। রোগা লম্বা মেয়ে—শ্যামলা রঙ কিন্তু উজ্জ্বল, মাথার চুল ববছাঁটা শ্যাম্পু করা। চোখের গগলস খুললে বড় বড় দুটো চোখ জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে। আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়। প্রথম দিন বুকটা ধ্বক করে উঠেছিল। সুমি সেনই নায়িকা। নাটকে ওর নাম বুলবুল। জনের নাটকে নাম ঝুনঝুন। বেদের ছেলে ঝুনঝুন বুলবুলকে ভালবাসে। ওর বউ কোয়েলা সে পুতুল—সে সারাক্ষণ তার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করে।

বুলবুল ঝুনঝুনকে ভালবাসে না কিন্তু কৌতুক ক'রে তাকে নাচায়। ঝুনঝুনের গলা শুকোয়, সে বলতে পারে না বুলবুলকে তার মনের কথা; যেন অপ্রতিভ হয়ে যায়। এটাকে পার্টির লোকে মনে করে তার অভিনয় কৃতিত্ব; কারণ ঝুনঝুনের চরিত্রের রঙটাই ওই। সকলে খুব তারিফ করে। মিত্তির বলে—very good. এ ছেলে রকেট হে! সাঁ ক'রে বেরিয়ে যাবে।

বেঁটে ভদ্রলোক বলেন—পাকা মাল! এ আঁটি যেখানে পুঁতবে শা—বিশাল শাল্মলীতরু হয়ে বেরুবে।

তরুণেরা কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে ঈর্ষা করছে। সব থেকে বেশী তারিফ পেয়েছে সে সুমি সেনের কাছে। গম্ভীর সুমি সেন বসে থাকে গগলস পরে—মাথার ববছাঁটা শ্যাম্পু-করা চুলের রাশি ফুলে ফেঁপে তার সে গাম্ভীর্যে একটি আশ্চর্য আভিজাত্য যোগ করে দেয়, সকলে সম্ভ্রম করে; মধ্যে মধ্যে সে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে সিগারেট কেস বের ক'রে সিগারেট ধরায়। এমন যে সুমি সেন সে তার সঙ্গে পার্ট করতে গিয়ে তার রকমসকম দেখে হেসে ফেলে। ঘটনাসংস্থানটাই হাস্যকর। নায়িকা বুলবুল বসে আছে নায়কের অপেক্ষা করে—নায়ক সুজিতবাবু। এমন সময় আসবে ঝুনঝুন অর্থাৎ জন। সে বলতে আসবে বুলবুল হমি তুকে পিয়ার করি—একদম দিলসে পিয়ার করি। বুলবুল রেগে উঠে তাকাবে—ঝুনঝুনের কথা বন্ধ হয়ে যাবে—মুখ শুকিয়ে যাবে—গলা শুকিয়ে যাবে। বুলবুল বলবে—কি দরকার হিঁয়া?

ঝুনঝুন বলবে—পানি।

সুমি সেন তার দিকে তাকালেই এই অবস্থা তার যেন আপনা-আপনি হয়ে যায়। বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সুমি সেন হেসে ফেলে।

কাল সুমি সেন একটু ক্রুদ্ধ হয়েই বলেছে ওরকম ক'রে হাসাবেন না আপনি। Overacting হচ্ছে আপনার।

মন্টি মিত্তির বলেছে—তা হোক একটু মিস সেন। Overacting হলেও খুব natural হচ্ছে। Forced নয়। বরং পরের অংশটা তোমার ঠিক হচ্ছে না জন। পুতুল এলে তুমি stiff হচ্ছ বেশী—কিন্তু ঠিক যতখানি হাসি পাওয়া উচিত তা হচ্ছে না। পুতুল মেয়েটি রঙ্গময়ীই শুধু নয়, অত্যন্ত প্রখরা। সে বলেছিল—মিস সেন সোনার কাঠি মন্টিবাবু—আমি রূপোর কাঠিও নই—লোহার বাঁটুল—জন সাহেব আমার ছোঁয়ায় পাথর নয়, কাঠ হয়ে যায় না—এই আপনার ভাগ্যি।

সুমি সেন বলেছিল—এই ধরনের ভাল্‌গার রিমার্ক আমি ঠিক পছন্দ করি নে পুতুল। কেন এ সব বল তুমি?

পুতুল মুখ মুচকে বলে উঠেছিল—বাপ্ রে! এই ভাল্‌গার হল? সোনার কাঠি লোহার বাঁটুল ভাল্‌গার? তোমার রাগ করবার কিছু নেই—রাগ করতে পারে জন সাহেব। মানে ওকে তা হ'লে রাজকন্যে হতে হয়। মানে পুরুষ থেকে নারী। তা—জন সাহেব কিছু মনে করবে না। নাও, এস—। এত কাঠ হয় না। কাঠ হলেও—জ্যান্ত কাঠ—মানে সজীব গাছ হত না। একটু সরস—একটু সবুজ—একটু নরম! নাও—এস। মিস সেন, আর একবার এস না ভাই। শেষটুকু বলে যাও—যে ক্যাচ ধরে আমি ঢুকব। বল না—দেখ্ ঝুনঝুন, ফিন দিক করবি তো হমি উসকে পুকারবে। এস। এস মিস সেন!

—দেখ ঝুনঝুন, ফিন দিক করবি তো হমি উসকো পুকারবে

—পুকার—হমি উকে ডর করে না। হাঁ।

—কো-য়-লা!

—উসকে দাঁত হমি তোড় দেবে বুল—বুল।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কোয়লা এসে আচমকা তার মাথার চুল চেপে ধরে। ঝুনঝুনরূপী জন কঠিন ক্রোধে বলে—ছোড় দে টুন্‌টুন—হম—। বলেই ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা ছাড়িয়ে ফিরে তাকিয়ে হাঁ হয়ে যায়—! টুনটুন নয়, এ যে কোয়লা।

বুলবুল এসে দুই গালে ঠোকনা দিয়ে যায়—বড়া বদমাশ—ই বড়া বদমাশ।

জন এইখানে এমন পাংশু বিবর্ণ হয় যে—অতি গম্ভীব মানুষও না হেসে পারে না।

বুলবুল চলে যায়—কোয়লার কাছে, তখন তোশামদ শুরু করে ঝুনঝুন। সে তোশামদ অতি হাস্যকর। তবু কোয়লা হাসে না। সে বলে যায়—তু বেদিয়া জোয়ান—হামি বেদিয়া জোয়ানী। যিসকে জান দিলম—জোয়ানী দিলম—উসকে জান লিতে ভি জানি। হাঁ। তুহার জান লিব হমি—তুকে দিব না।

বলে কোয়লাও চলে যায়।

ঝুনঝুন তাকে জিভ কেটে ভেঙায়; দুহাত নেড়ে তার প্রতি হাস্যকর ভঙ্গি করে। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় এবং নিজের ছুরিটা বের ক'রে শানাতে বসে।

মিঃ বহুরূপী বললে—নাঃ, এও ঠিক হল না—স্যার মন্টি! আর একবার হোক।

মন্টি মিস্তির বললে—তা হয় নি—তবে একদিনেই হবে না। হবে। এখন এগিয়ে চলুক।

পুতুল জনকে ডেকে বলে—এখানে আসুন জনবাবু। পান—; ও না, পান তো খান না! পান খান না, সিগারেট না, তবে খাবেন কি? আপনি হোপলেস!

জন হাঁপ ছেড়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে, সে উত্তর দেয় না; একপাশে গিয়ে চুপ ক'রে বসে।

এর পর আর একটা সিনে তার পার্ট। তারপর আর নেই। কিন্তু ছুটি তার হবে না। এর শেষে হবে গানের রিহারস্যাল।

সব দিন গানের রিহারস্যাল হয় না ; একদিন দুদিন পরপর হয়। যেদিন গানের রিহারস্যাল হয় সেদিন সবশেষে জনের ছুটি। সেদিন মন্টি মিত্তির আর সুজিত চক্রবর্তী তাকে গাড়ীতে লিফট দেয়। আজ গানের দিন। পুতুলও থাকে—গান ওর সঙ্গে। পুতুলকে ট্যাক্সিভাড়া দিতে হয়, চাকরেরা ট্যাক্সি ডেকে আনে। না পেলে ভাড়া নিয়ে পুতুল চলে যায়—বলে পথে দেখে নেবে।

গাড়ীতে সেদিন মন্টি মিত্তির বললে—কল্যাণ। জনকে বলছি। তোমাকে জন বলতে কেমন লাগে হে।

—বলুন।

—একটা কথা ঠিক বল তো ?

—বলুন।

—Do you feel shy or embarrassed with Putul ? পুতুল কি তোমাকে জ্বালাতন করে—I mean does she try to—মানে—তোমাকে টানতে চেষ্টা করে ও ?

চুপ ক'রে রইল জন। ঠিক বুঝতে পারলে না কি বলবে। সত্যই কি পুতুল তাকে আকর্ষণ করে ? পুতুলের ওই আচরণ তো সবার সঙ্গেই। তার সঙ্গে পার্ট আছে বলে, হয়তো তাকে ওই নিয়ে ব্যঙ্গকৌতুকের সুযোগ বেশী পায়।

উত্তর না-পেয়ে মিত্তির বললে—মেয়েটা ওই রকম। তবে কি জান—এ সব লাইনে এলে মেয়েপুরুষ দুই তরফই একটু অন্য রকম হয়। I dont mean—যে তারা খারাপ হয়ে যায়। তা নয়—তবে একটু বাঁধন আলগা হয়ে যায়। পুতুল একটু বেশী এবং ওর দুর্নামও আছে। কারণও আছে। মানে ও ঠিক যাকে বলে সচরাচর সামাজিক জীব নয়। ওদের সমাজ—। কি বলব ?

চক্রবর্তী কথা জুগিয়ে দিলে—বল না সোজা কথায় হাপ-গেরস্ত।

মন্টি মিত্তির বললে—ডেভিড আমাকে বলেছে তোমার কথা। তোমার বাবা মিষ্টার বিশ্বাসকে আমি জানি। ধার্মিক লোক, সৎলোক। তোমার শিক্ষা যা তাতে এসব একটু বেশী বেশী মনে হবে। কিন্তু সেও হয়তো দুনিয়ায় ঠিক সচরাচর সাধারণ—মানে—common or natural নয়। একটু adjust করে নিয়ো। আর ভাল থাকা মন্দ থাকা সে তোমার নিজের হাতে। ডেভিডকে আমি তাই বলেছি। সে আমাকে বলেছিল—দেখবেন, আপনার হাতে দিচ্ছি, একটু নজর রাখবেন ওর ওপর। ফাদার বিশ্বাসের ইচ্ছা ঠিক ছিল না ওকে আসতে দিতে। আমি কথা দিয়েছি। তবে কি জান, এ খারাপ হওয়ার পথ—পৃথিবীতে—

সুজিত হেসে বললে—আদিম এবং অকৃত্রিম। ইভ এ্যাণ্ড এ্যাডাম—জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েই যত সমস্যা। পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক। নইলে ও খেলা তো চলছেই। চলছেই। দিনে রাত্রে—সর্বক্ষণ, দেবমন্দির-কর্মজগৎ নির্জন প্রান্তর সর্বত্র—কোথা নয়? আমার আপিসে মেয়ে কেরাণী আছে তিনজন। বিয়ে হয় না—চাকরী চাই। চাকরী হল। ছমাস যেতে না-যেতে আমারই আপিসের কেরাণীর সঙ্গে বিয়ে হল একজনের। প্রেম হয়েছে আপিসের কাজের মধ্যেই। একজন মেয়ে বিষ খেলে। শুনলাম She was—; চুপ করে গেল সুজিত। সুজিতের অর্ধসমাপ্ত কথাটুকুর অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় নি জনের। যাকে মেয়েটি ভালবেসেছিল তাকে সে পায় নি। মন তার গভীর বেদনায় ভরে উঠেছিল। এমনই গাঢ় এবং এতই বিপুল সে বেদনা যে দেখতে দেখতে যেন বাইরের জগৎ-জনতা যানবাহন-মুখর আলোকিত কলকাতার পথ বাজার সব তার দৃষ্টি থেকে বিলুপ্ত না হলেও অর্থহীন ছায়াছবির মতই নিরর্থক হয়ে উঠেছিল। শুধু

দুপাশে চলন্ত গাড়িটার গতির সঙ্গে সমতা রেখে ছুটে চলে যাচ্ছিল পিছন দিকে। সামনেটা এগিয়ে আসছে বড় বড় দোকানের ঘুরন্ত বিজ্ঞাপনের মত। মনটাও যেন শূন্য—মধ্যে মধ্যে ভেসে উঠছে লনার মুখ—আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় চমকে উঠল সে। লনা—লনা—যদি—। লনা যদি আত্মহত্যা করে মেয়েটির মত? সে স্থানকাল বিস্মৃত হয়ে চীৎকার করে উঠল—ওঃ! মন্টি মিত্তির, সুজিত ছিল সামনের সিটে, সে বসেছিল পিছনে; মন্টি মিত্তির মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে—Yes? কি হল জন?

অপ্রস্তুত হয়ে গেল জন।—না—কিছু না। কেমন একটা খ্যাঁচ করে পিঠে লেগে গেল। সেরে গেছে।

সুজিত বললে—উঁহু। ওরকম খচ ক'রে লাগা ভারী খারাপ হে। ওই ক'রেই ফিক্‌ব্যথা ধরে যায়। নার্ভে কিম্বা শিরায় এমন লাগে!

জন চুপ ক'রেই রইল। ভাল লাগছিল না তার কথা বলতে। বার বার লনা এসে মনের মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। বার বার। বিষণ্ণ মুখ। প্রতিবারই তাই।

সে তাকে মনে মনেই বললে—লনা—তুমি হাস। একবার হাস। বিশ্বাস কর—তোমার প্রতি আমার বিশ্বস্ততা বারেকের জন্য—এতটুকু পরিমাণেও ক্ষুণ্ণ করি নি আমি। তুমি হাস। বিশ্বাস কর আমাকে।

—কল্যাণ ওহে কল্যাণ জন—মিস্টার বিশ্বাস!

চমকে উঠল জন। গাড়িটা দাঁড়িয়েছে—মন্টি মিত্তির ডাকছে।

—এঁ্যা!

—নাম। এখানেই তো নামবে তুমি?

—এসপ্লানেড এসে গেছে? ও—তাই তো। আমি ভাবলাম ট্রাফিকের জন্যে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, এই তো মেট্রো!

—বেশ আছ। কি ভাবছ বল তো?

সুজিত বললে—পুতুলকে ভাবছ নাকি জন? উঁহু উঁহু—she is dangerous— ; আচ্ছা গুড নাইট!

—He is valgur—মনে মনে বললে জন। সুজিত সৎ মানুষ নয়। সে জানে না। জানে না—কোথা থেকে কোথায় আসছে জন!

ওরা চলে গেল। জন কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে রইল মেট্রোর দিকে তাকিয়ে। সে তাকিয়ে থাকাও অর্থহীন। অথবা শিশুর দৃষ্টিতে এই আলোগুলোর ঝলমল শোভার যেটুকু বা যতটুকু মূল্য তার থেকে বেশী নয়। দীপ্তি—রঙ—অনেক মানুষ। নারীপুরুষও নয়—মানুষ—শুধু মানুষ।

সব ভুলে গেল সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। ভারী ভাল লাগল—এত দীপ্তি এত বর্ণচ্ছটা—এত আনন্দচঞ্চল মানুষ! অফুরন্ত। ওই লিপটনের চায়ের বিজ্ঞাপনে আলোর ধারায় চা পড়ছে—কাপে কাপে। রেখায় রেখায় লেখা ফুটছে।

হঠাৎ একটা কথা—অত্যন্ত মৃদুস্বরে একটি কথা কানের পাশে বেজে উঠল।

—মেমসাব—চাই সাব!

চমকে উঠল জন। পাশ ফিরে তাকালে। পল্টন? না। রামেশ্বর? না। তবে ওদেরই কেউ।

—বহুৎ আচ্ছা চিজ সাব! টেন রুপী ওনলী।

মুহূর্তে চোখের সামনে আলো রঙ মানুষ সব যেন হিজিবিজি কিলিবিলি করে নেচে উঠল—নড়ে উঠল। মানে যার কিছু ছিল না—তার মানে বেরিয়ে এল। সর্বাগ্রে নিরীহ পোস্টারটা কথা কয়ে উঠল। তাই তো—ওটা তো চোখে এতক্ষণ পড়েও পড়ে নি! একটি উলঙ্গ মেয়ে, হ্যাঁ,—উলঙ্গ; শুধু একটা চাদর গায়ে দিয়ে সন্তর্পণে চকিত সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা বাড়ির করিডোর অতিক্রম ক'রে চলে যাচ্ছে। সর্বাঙ্গ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল।

কি আশ্চর্য! ওই মেট্রোর আলোয় ঝলমল সামনেটায় ওই মেয়েটি যাচ্ছে—কি বিচিত্র সচেতন পদক্ষেপ! ওই মেয়েটি কি উল্লাসে ডগমগ হয়ে পুরুষটির হাত ধরে চলেছে! ওই পুরুষটির কি ক্ষুধার্ত দৃষ্টি! ওই মেয়েটি! ওই মেয়েটি!

অন্ধকার থেকে নয়, আলোর মধ্যেই এরা লুকিয়ে ছিল। একমুহূর্তে আলিবাবার ডাকাতদের সেই চিচিং ফাঁক শব্দটির মত একটি কথায় আলোর ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল।

—সাব।

রূঢ়কণ্ঠে সে নেহি ব'লে সেখান থেকে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে চেপে বসল।

—চলো সারকুলার রোড।

বাড়ির দরজায় নেমে সে উত্তেজিত উল্লাসে লাফ দিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে উপরে উঠে এল—লনা! লনা!

শান্ত লনা—সেই বিষণ্ণতা আর প্রসন্নতায় মেশানো শুক্লা দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চাঁদের মত ক্ষীণ দুর্বল হাসি হেসে দরজাটি খুলে দাঁড়াল।

—এস।

—এসেছি।

তারপর হঠাৎ বললে—ওঃ লনা—তোমার জন্যে যে কি মনটা ছটফট করছিল—কি বলব!

লনা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললে—চুপ, ফাদার—

জন তবু বললে—চল, ওপাশে চল, বসব—গল্প করব।

ওপাশটা নির্জন। তার নিজের ঘরের সামনেটা। ছোট্ট একটুকরো নির্জন উঠানের মত। সেখানে এসে সে লনার হাত ধরলে। সেই ঠাণ্ডা হাত। তার হাতে সেই জ্বরের উত্তাপ।

তবু সে বললে—আত্মসম্বরণ সে করতে পারলে না—বললে—give me a kiss Launa।

—জন!

—লনা!

—তা হয় না জন। অবুঝ হয়ো না। প্লিজ। ছাড়। হাত ছাড়।

স্থিরদৃষ্টিতে লনার দিকে তাকিয়ে রইল জন। লনা সেই বিচিত্র বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে—আমি তো তোমারই। I am yours—কিন্তু we are not married yet. please—

হাত ছেড়ে দিল জন। বললে—আচ্ছা। আমি কাপড় জামা বদলে নি।

সে চলে গেল নিজের ঘরের মধ্যে।

॥ এগার ॥

পরের দিন ছিল রবিবার।

সকালবেলা চার্চ থেকে ফিরে রবিবারের সকালবেলার শোতে ফাদার তাদের নিয়ে 'কুয়ো ভেডিস্' ছবি দেখতে গিয়েছিলেন। চোখের জল ফেলে পরিপূর্ণ মন নিয়ে ফিরে এসেছিল। সারাটা দুপুর আশ্চর্য আনন্দে কেটে গেল। দুখানি পাশাপাশি চেয়ারে দুজনে দুজনের হাত ধরে বসে রইল। একবারের জন্যও লনা হাত টেনে নিলে না, জনও না। ছবির গল্পই হচ্ছিল। ফাদার ঘরে বসে আজ বাইবেলই পড়ে যাচ্ছেন।

রবিবারের দুপুর—আজ ছুটির দিনে রোদ একটু পড়ে আসতেই ছাদে তরুণ তরুণী ছেলেমেয়েদের ভিড় জমেছে। এরা ওদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। পাশের বাড়ির ছাদে মেয়েরা ওদের দেখে হাসছিল। লনা এবং সে ঠিক বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা কি।

এবং হাসিটাকে ঠিক গ্রাহ্য করে নি। লক্ষ্যস্থল যে তারা তা মনে হয় নি। এতই তারা আনন্দমগ্ন ছিল। কথাটা শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিলে ওরাই। ফাদার বিশ্বাসের বাড়িটির সঙ্গে আশপাশের বাড়িগুলির ধারাধরণেও মিল যেমন ছিল না তেমনি তাদের সঙ্গে খুব মাখামাখিও ছিল না। তা ছাড়া বাড়িগুলি সবই ভাড়াটে বাড়ি। স্থায়ী বাসিন্দা নয়। জীবিকাতেও এরা প্রায় নিম্নমধ্যবিত্ত। এরা হিন্দী ইংরিজী মিশিয়ে কথা বলে; মেয়েরা ফ্রক পরে; ছেলেরা স্যুট ছাড়া পড়ে না। এদের সঙ্গে বাঙালী কৃশ্চান ফাদারের একটা বিরোধ অন্তঃসলিলার মত চিরদিন বেয়ে চলেছে। ফাদার বিশ্বাস গোড়া থেকেই অতি সন্তর্পণে এদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করতে দেন নি। লনার কথাই নেই। লনা শান্ত বিষণ্ণ—জীবনে সে একক, উল্লাসহীন। জীবনে উল্লাস নেই বলেই শুধু মিষ্টি কথার শান্ত সম্পর্ক ছাড়া কোন সম্পর্ক গড়ে না। জন উল্টো; তার অনেক উচ্ছ্বাস—অনেক আবেগ—সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভয়, অনেক শঙ্কা। ফাদার তাকে প্রায় দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। তাই এদের সবার সঙ্গেই সম্পর্ক মৌখিক। কখনও কখনও দু-চারটে কথা হয়—তার বেশী নয়। এদের দেখে ওরা ঠাট্টা বিদ্রূপই বেশী করে। আজ এদের হাসির মধ্যে বিদ্রূপ ছিল না বলেই লনা এবং জন সেটা ধরতে পারে নি। হঠাৎ একসময় কালো লম্বা মেয়ে কেটি এসে আলসেতে দাঁড়িয়ে ডাকলে—হ্যালো! হ্যালো—লনা!

লনা সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বললে—আমাকে বলছ?

—Yes—তোম দোনোকে বোলতা। দোনোকে বলছে।

—কি?

—তোম দোনোকে সাদী কব হোগা? আজ কেয়া এনগেজমেণ্ট হো গিয়া?

লনা জবাব দিতে পারে নি। কারণ প্রশ্নটার মধ্যে মাথামুণ্ডু

খুঁজে পায় নি সে। জন হেসে বলেছিল—কে বললে? কে দিলে এ খবর?

—তোম দোনো—নিজুসে খবর দিচ্ছ। হাঁতে হাঁত রেখে বসেছ। হাউ সুইট এণ্ড বিউটিফুল পেয়ার ইউ হ্যাভ মেড!

লনার শুভ্র মুখখানি এবার রাঙা হয়ে উঠল।

জন বললে—হবে। এবং খবর নিশ্চয় দেব।

—খিলাবে না? ডিনার?

—খাওয়াব।

অপরাহ্ণটি রঙে রঙে যেন রঙীন হয়ে উঠল এক মুহূর্তে। লনার হাতও যেন উষ্ণ উত্তপ্ত মনে হল জনের। গভীর আবেগের সঙ্গে নিজের হাতের মধ্যে হাতখানিকে চেপে ধরলে সে। লনার দিকে হেসে তাকালে। লনা মুখ নামালে। তারপরই লনা হাতখানা টেনে বললে—ছাড়।

—কেন?

—ওঠ তুমি। কটা বাজে খেয়াল রাখ? রিহারস্যালে যাবে তো?

ও! হ্যাঁ। রিহারস্যাল! জন উঠতে গিয়েও বসল; বললে—না। আজ যাব না।

লনা তার দিকে তাকালে।

—খুশী হবে না?

লনা হাসলে। বললে—নিশ্চয়ই হই। কিন্তু না, কথা যখন দিয়েছ তখন যাবে—যেতে হবে। তোমার এ কাজ আমার ভাল লাগে নি। কিন্তু নিয়েছ যখন তখন না গেলে অন্যায় হবে। যাও। ওঠ।

অখুশী মনেই বের হল জন। লনা বিচিত্র। মনে হল কেন এই কর্তব্যপরায়ণতার বাড়াবাড়ি। পবিত্রতার বাড়াবাড়ি। কেন? আজকের সন্ধ্যাটি কত মধুর মনোরম হতে পারত।

বেরিয়ে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মন এই ভাল না-লাগার সুর, এই অখুশী ভাব কাটিয়ে উঠে খুশী হয়ে উঠল। মুক্ত স্বাধীন পৃথিবী। বিকেল বেলাটির রোদ আজ আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পশ্চিম আকাশে দিগন্তে মেঘ রয়েছে। এখানে ওখানে টুকরো টুকরো মেঘ। সূর্যের আলোয় নানান রঙের আমেজ ধরেছে তাতে। আজ আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে নামবার সময় নেই। আজ রিহারস্যালে না গিয়ে লনাকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এলে বড় ভাল হ'ত। কেমন মেয়েটি আর ছেলেটি গাছতলায় মুখোমুখি বসে কথা বলছে। মেয়েটি ঘাস ছিঁড়ে ডাঁটি কাটছে দাঁত দিয়ে।

চার্চের ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজছে। তার ঘড়িটা চার মিনিট স্লো যাচ্ছে।

রিহারস্যালের বাগানে যখন পৌঁছল তখন সাড়ে চারটে। মণ্টি মিত্তির, সুজিতবাবু এখনও আসে নি। গাড়ী নেই। লোকজনও নেই। শুধু পুতুল বসে আছে একটা গাছতলায় মাটির তৈরী একটা বেদীর উপর। সে তাকে দেখেই ভুরু তুলে বিচিত্র হেসে বললে—কি? আপনি শুনেছি সকলের আগে আসেন! এত দেরী কেন? দেরী হলে লেটফাইন দিতে হয় জানেন তো!

জন মুহূর্তে নার্ভাস হয়ে গেল। ভয় পেলে—চঞ্চল হল। কথার উত্তর খুঁজে পেলে না। পুতুল বললে—কি, কথা নেই যে!

পাশের জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—বসুন।

—বসব?

—এই তো, বেশ সরমজড়িত বোকা-বোকা ভাব ফুটছে। রিহারস্যালে কাঠ হয়ে যান কেন? ও মা—তবু দাড়িয়ে থাকে! বসুন। জনের হাতখানা ধরে সে টেনে বসাতে চাইলে।

জন বললে—না—এই তো দাঁড়িয়ে বেশ আছি।

—না, বেশ নেই। বসুন।

বসতে হল জনকে। পুতুল পানের ডিবে বের করে খুলে ধরলে —নিন।

—আমি তো পান খাই নে।

—ওমা, আমি ভুলে গেছি! কিন্তু পান খান না, সিগারেট খান না—এখানে এসেছেন কেন? তা ছাড়া—রাগ করবেন না তো?

—না না, রাগ করব কেন?

—আপনি এত বোকা কেন?

—কেন—বোকা কি করে হলাম? কিন্তু পার্ট করা এই প্রথম। প্রথমেই কি নিখুঁত হয়?

—আমরা তো দেখি আপনি বোকা। মেয়েরা আপনাকে জন বলে না—বলে সুজন চন্দ্র। বোকারাম।

—তা বলুন। কিন্তু বোকা আমি নই।

—নন? সব বোঝেন?

—নিশ্চয়। কেন বুঝব না?

—সুমি সেনকে বোঝেন? বসে থাকেন তো মাটির দিকে মুখ নামিয়ে।

—মানে?

—মানে গগল্‌সের কালো কাচের ভিতর থেকে চোখ দুটো কি করে দেখেছেন?

ভুরু কুঁচকে সবিস্ময়ে জন বললে—কি বলছেন আপনি?

—হুঁ, ন্যাকা আপনি। না—কিছু দেখেন নি?

—কি দেখব?

—আপনাকে দেখে।

বুকের ভিতরটায় একটা কিছু দিয়ে কেউ প্রচণ্ড আঘাত হানলে। সে চঞ্চল অধীর হয়ে উঠল—সুমি সেন! তার দিকে তাকিয়ে থাকে! পা থেকে রক্তস্রোত উঠছে তার মাথার দিকে।

আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল সে। লজ্জা সঙ্কোচ—সব যেন একটা বিস্ফোরণে কোথায় উড়ে গেল। সে পুতুলের হাত চেপে ধরলে—সজোরে চেপে ধরে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে, কি বলছেন আপনি ?

—উঁ! উৎসাহের যে সীমা নেই!

জন ভুল বুঝতে পারলে। সে আত্মসম্বরণ করে অভিনয় করেই বললে—উৎসাহ নয়। এ আমার কাছে—; কি বলব ? এই ধরনের কথা আমি পছন্দ করি নে। কোন পুরুষমানুষ বললে আমি মিষ্টার মিত্তিরকে বলতাম। শুধু তাই নয়—আমি তা হলে জবাব দিয়ে চলে যেতাম।

—চলে যেতেন ?

—হ্যাঁ।

—না, যেতেন না। আমি অনেক বুঝি—অনেক দেখেছি। ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন। লোক আসছে। গেট খুলছে দারোয়ান। ছাড়ুন।

সে হাত ছেড়ে দিল। পুতুল উঠে দাঁড়াল—এবং বললে—হাত এত গরম কেন আপনার ? একেবারে আগুন! বুকের আগুনের আঁচ না কি ?

গেটের ভিতর ট্যাক্সি ঢুকছে; ভিতরে স্নমি সেন। হ্যাঁ স্নমি সেন। পুতুল মুহূর্তে আবার এসে তার পাশে বসল। বললে—পার্ট বলুন। রিহারস্যাল দিচ্ছি আমরা।

জন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। পুতুল বলে গেল—উ কে—কি বুলছিলি তু ? আঁ ? বোল রে জোয়ান—!

জন বললে না—পুতুলই বললে—বোকার মত বলুন—মানে কৈফিয়ত নেই,—তবু দিতে হবে—সুতরাং নিরীহের মত যা ভেবে পেয়েছেন তাই বলছেন।

—হামি—হামি—। হামি বলছিলম বুলবুল—ওই গাইয়াটা

কেমুন হাম্বা হাম্বা ডাকছে। বলে কাষ্ঠহাসি—যাকে বলে দাঁত মেলে দেওয়া—শুধু তাই দেন। অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার হয়ে যাবে। তখন আমি জোর পাব। বলব—আক্রোশ ভরে বলব—ঝুট—ঝুট—ঝুট। লেকিন শুনরে বেদিয়া, তু বেদিয়া, হমি ভি বেদিয়ানী—বেদিয়ানী জান দিবে, তব ভি জোয়ান দিবে না। নিজে জান দিবে—উসকা পহেলে জান ভি লিবে। হাঁ!

সুমি সেন চলে গেল, দাঁড়াল না—কথা বললে না। শুধু একবার ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চলে গেল।

জন বললে—ছাড়ুন।

হাত ছাড়িয়ে সে উঠে পড়ল।

পুতুলও উঠল। সে বললে—বেশ ভঙ্গি করে হাত দুটো নেড়ে বললে—চেহারার গরমেই গেল! দাড়াও না, একটা বছর যাক না—চোয়াল চড়িয়ে ভাঙবে, চোখের কোণে কালী পড়বে, কুঁজো হবে, তখন দেখবে! কতই দেখলাম। তুমি বাকী।

*　　　*　　　*

ফাদার বললেন—মধ্যে মধ্যে বলেন—পৃথিবীতে পাপের আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণের মত—সে যত প্রবল, তত বিস্তৃত—পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে—প্রতিটি বিন্দুতে সে ছড়িয়ে রয়েছে, টানছে মাটির সঙ্গে, বেঁধে রাখছে। মাটি টানে দেহকে—পাপ টানে মনকে। Divinity—ঊর্ধ্বে নিশ্চল হিমালয় শৃঙ্গের মত রয়েছে – পবিত্রতা তার মাধুর্য্য সে শুধু মাধুরীর আহ্বানে ডাকে। মানুষ উঠতে যায়, যত ওঠে, পাপ তত টানে।

জন ভাবছিল সেই কথা। রিহারস্যালের শেষে সে দাঁড়িয়েছিল। অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে সে, সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিতও হয়েছে। ভিতরটা দুয়ের তাড়নায় কাঁপছে।

রিহারস্যালের মধ্যে আজ সে লক্ষ্য করেছে সুমি সেনকে। লক্ষ্য করতে গিয়ে সেও তাকিয়ে থেকেছে তার দিকে। পুতুল

মিথ্যে কথা বলে নি—সুমি সেন গগল্‌সের কালো কাচের ভিতর থেকে তাকে দেখছিল। চোখে চোখ মিলতেই সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে অধিকাংশ বার। দু একবার চোখে চোখ মিলিয়ে তাকিয়েও থেকেছে। ঠোঁটে যেন আশ্চর্য ক্ষীণ রেখায় হাসির আভাসও ফুটে উঠেছে। আজ সে ভাল করে দেখেছে সুমি সেনকে। গম্ভীর সুমি সেন—ছিপছিপে পাতলা—বরং রোগা। মাথার স্যাম্পু-করা চুলের বোঝা ফুলে ফেঁপে বেমানান রকমের দেখায়—কিন্তু ওইটেই যেন ওর রূপের সব থেকে বড় আকর্ষণ। মধ্যে মধ্যে গগল্‌স খুললে আশ্চর্য দুটি বড় ঢলঢল চোখ সন্ধ্যার আকাশের ভেনাসের মত নীলাভ দীপ্তিতে জ্বলে ওঠে। সুমি সেন মিনিট খানেক পরেই গগল্‌স প'রে নেয়। কদাচিৎ হাসে। দাঁতগুলি একটু বড়। কিন্তু ভালই দেখায়।

হ্যাঁ, পুতুলের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। গগল্‌সের ভিতরেও তার চোখ তারই দিকে তাকিয়েছিল। জন চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল কিন্তু উত্তেজনার সীমা ছিল না। কিন্তু সুমি সেনের দৃষ্টি ফেরে নি। স্থির হয়ে নিবদ্ধ ছিল। গম্ভীর সুমি সেন এতটুকু চঞ্চল হয় নি। মধ্যে মধ্যে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে সিগারেটের কেস বের ক'রে সিগারেট ধরিয়ে খেয়েছিল। সুমি সেন সিগারেট খায়।

একসময় পার্টের রিহারস্যাল দিতে দিতে পুতুল তাকে মৃদুস্বরে বলেছিল—দেখতে পেয়েছ? বলে হেসেছিল। আর একবার বলেছিল—কতবার দেখবে? উঁ?

আজ কিন্তু তার পার্ট ভাল হয়েছে। তারিফ করেছে সকলে। বহুরূপী বলেছে—ওয়াণ্ডারফুল। আশ্চর্য ন্যাচারাল। এবং ফুল অব লাইফ।

মিত্তির বলেছে—ভেরী গুড জন, ভেরি গুড!

আজ সে পুতুলের কাছে অর্থাৎ কোয়লার কাছে ধরা পড়ে—অন্যদিনের মত শক্ত প্রাণহীন হয়ে যায় নি। বার বার পুতুলের সামনে মনে হয়েছে—মনে থেকেছে যে পুতুল দেখেছে তাকে সুমি সেনের দিকে তাকিয়ে থাকতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে গেছে, গলা কেঁপেছে, ঢোক গিলেছে।

যখন সে কৈফিয়ত দিয়ে কোয়লাকে বলেছে—হমি, হমি -

পুতুল ইচ্ছে করেই তাকে ভেঙিয়ে বাড়তি কথা বলছে—হাঁ—হাঁ। হমি হমি—তু কি বলছিলি রে উ ছোকরীকে? আঁ? হমি কুছু বুঝে না, না?

সে ঢোক গিলে বলেছিল—হমি বলছি না—বুলবুল—ওহি গাইয়াঠো কেমুন হাম্বা হাম্বা ডাকছে।—সঙ্গে সঙ্গে শুকনো হাসি।

দলের লোকেরা হেসে সারা হয়ে গিয়েছিল। সুমি সেনও খুব হেসেছিল। ওটকু শেষ হতেই পুতুলও বলেছিল—আজ ঠিক হয়েছে। তারপর মৃদুস্বরে বলেছিল—আমার কিন্তু ওই কথা। জান দিব · জোয়ান দিব না। দিতে হলে জান লিব। হাঁ।

আশ্চর্য চতুরতার সঙ্গে সকলকে দেখিয়েও সবার অগোচরে কথা বলতে পারে এরা। আশ্চর্য চতুর।

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলে সে। চুপ ক'রে একপাশে বসে রইল। বহু জনের প্রশংসাতে তার মনের আড়ষ্টতা কাটছে না। বিচিত্র মন। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে।

ফাদার! হঠাৎ ফাদার এসে মনের মধ্যে উঁকি মারেন।—

ফাদার! লনা!

অস্থির হয়ে উঠে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। ফাদার! লনা! মনে মনে সে বললে—না না, আমি শপথভঙ্গ করি নি। না।

—স্যার জন! এখানে? অন্ধকারে? কি ব্যাপার?

চমকে উঠল জন—কে?

—আমি ব্রাদার। স্যার বহুরূপী। একমুখ হাসি নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

জন শুধু বললে—ও। আপনি।

বহুরূপী বললে—ওয়াণ্ডারফুল! তোমাকে আমি বলছি তুমি হবে shooting star! আজ যা রিহারস্যাল দিয়েছ, না? অদ্ভুত!

—Thank You.

—না না, ওসবের ধার আমি ধারি না। আমি মধুমক্ষিকা—গন্ধ মধু যে ফুলে আছে তার পাশেই গুনগুন করি, গুণগান করি। তোমার গন্ধে মধুতে আজ মোহিত হয়ে গেছি। কিন্তু এখানে কেন? Waiting for any body? সরে যাব?

জন বললে—না না না। ওখানে আমার কেমন অস্বস্তি লাগছিল—

—লাগবেই। আনাঘ্রাত পুষ্প তুমি। আর জায়গাটা তো যত ভাল তত মন্দ। মেয়েগুলো না। অবশ্য ভাল মেয়ে আছে। সুমি সেন, তারপর ওই বোনের পার্ট করছে সীমা বোস। ওরা হল ভাল। সত্যি ভাল। সীমা সত্যি ভাল। জান, বেচারীর স্বামী বেকার। বাঁচবে না। সীমা এই থেকে খরচ চালায়। কারুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টিতে নেই। ডিগ্‌নিফায়েড মেয়ে। সুমি সেন দাম্ভিক চালিয়াৎ। নইলে সে ভাল। অবশ্য দু একটা উড়ো কথা শোনা যায় কিন্তু বিশ্বাস করি নে আমি। আর বাদবাকী না—বাপরে বিষাক্ত মক্ষিকা। পুতুল তো ডাকসাইটে। ওর আবার বিষ হুল দুই আছে।

চুপ করে রইল জন।

—আচ্ছা চলি। আজ পালাব।

—দাঁড়ান, অমিও যাব।

—যাবে? কিন্তু—

কিন্তু শব্দটা জনকে থমকে দিল। বহুরূপী বললে—আজ আমার নিরুদ্দেশ যাত্রা। মানে—ময়দানে ঘুরব। অনেকদিন ঘুরি নি। তবে অবশ্য তোমাকে এসপ্লানেডে সঙ্গে নিতে পারি। সেখানে আমার ট্যাক্সি আছে বাঁধা—সেই ট্যাক্সি নেব। সেখান পর্যন্ত আসতে পার। আসবে? অপেক্ষা করব?

—না। আপনি যান।

—Thats good, good night.

চলে গেল বহুরূপী। জন ফিরে গেল রিহারস্যালে। সুজিতের সঙ্গে সুমি সেনের তখন রিহারস্যাল হচ্ছে।

আশ্চর্য ভাল অভিনয় করে সুমি সেন—অন্তত: যেখানে আবেগ আছে সেই সব জায়গাগুলিতে ওর অভিনয়ের তুলনা হয় না। কাটা-কাটা কথার জায়গাগুলিও চমৎকার করে। শুধু যেখানে হাস্যরস সেইখানে ও ভাল পারে না। ম্লান হয়ে যায়।

নায়ক সুজিত চক্রবর্তী বেদিয়ার দল থেকে চলে যাচ্ছে ফিরে তার ঘরে। তার মনে পড়েছে অতীত কথা। মায়ের কথা, বাপের কথা, ঘরের কথা; তার বোন কেঁদেছে, অন্তরটা টনটন্ করেছে; তাকে ধরেছে নায়িকা বুলবুল, তারও বুক ভেঙে যাচ্ছে। বলছে—না না, তু যাবি না—তু যাবি না। তু গেলে হামি বাঁচবে না। যাবি তো মার হমাকে, খুন কর খুন কর। মারকে যা। মোর কলিজা উখার দিয়ে পাঁওয়ে মাট্টির সাথ মিশায় দে—তব যা।

সুমি সেন বললে আশ্চর্য দরদ দিয়ে আশ্চর্য আবেগের সঙ্গে। এবং শেষটায় 'বেইমান তু বেইমান' বলে আছাড় খেয়ে পড়ল।

মিত্তির উল্লাসের আতিশয্যে হাততালি দিয়ে বলে উঠল—বই হিট! মিস সেন, এবার ছবিতে আপনার হিরোইনের পার্ট সিওর।

সুমি সেন হেসে বললে—Thank you.

সুজিত বললে—best acting-এর জন্যে আমি একটা সোনার মেডেল দেব। আমার বলা রইল।

পুতুল হাসলে। এবং জনের কানের কাছে মুখ এনে বললে—সেটা পাবে সুমি সেন। বুঝেছ? তবে সুমি সেন তোমাকে দেওয়াতে পারে।

বিরক্ত হল জন এই প্রগল্‌ভার প্রগল্‌ভতায়। কিন্তু তাতে পুতুল দমল না। আবার বললে—তোমাকে ও ছাড়বে না। কিন্তু হামি দিব না—হাঁ!

মিনিট কয়েক পর জন উঠে মিত্তিরের কাছে এসে বললে—আমি আজ যাচ্ছি। আমার শরীরটা ভাল নেই।

—শরীর ভাল নেই? আচ্ছা, তা হলে যাও। কোন দিকে না চেয়ে সে বেরিয়ে এল। চলে যাবে সে। একটা নিদারুণ অস্বস্তিতে সে পীড়িত হচ্ছে। বাড়ি না গেলে সে স্বস্তি পাবে না।

*　　　*　　　*

পথে থিয়েটার রোডের ধারে সে যেন আপনা থেকেই ট্রাম্ থেকে নেমে পড়ল। মোড়ে ফুটপাথের ধারে কে দাঁড়িয়ে? স্যার বহুরূপী! তার একটু দূরে ও কে! দেহের রক্ত তার চন্‌চন্ করে উঠল। বেবী কৃষ্ণা! ঠিক তেমনি মাথায় খাটো তেমনি কালো! যাকে দেখে অমাবস্যার রাত্রির কথা মনে হয়। রোশনির কথা মনে পড়ে! বুকের ভিতরটায় যেন পুঞ্জপুঞ্জ অন্ধকার তোলপাড় করে উঠল। ময়দানের দিকে ফুটপাথে নেমে ওপারের দিকে আসতে আসতে বহুরূপী আর মেয়েটি অপেক্ষমান একটি ট্যাক্সিতে চেপে চলে গেল, সে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার মাঝখানেই।

একজন ড্রাইভারের ধমকে তার চেতনা ফিরল—এই উল্লু কাঁহাকা! সে সচেতন হয়ে উঠে এ দিকের ফুটপাথে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরই চোখে পড়ল একটু দক্ষিণ দিকে একটি লাইটপোস্টের

নিচে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তির মত। জন ফাদারের নিজের ছেলে জন নয়; সে জন এই জন্মেই এক বিচিত্র বিধানে—খণ্ড জন্মান্তরে বাচ্চি ছিল। সে পল্টনের সঙ্গে ফিটনের পিছনে বেড়িয়েছে। তার সেই জন্মান্তরের দৃষ্টি আজ জাগ্রত হয়ে উঠল। চিনতে তার দেরী হল না। দুর্বার আকর্ষণে তাকে টানছে। মাথার মধ্যে যেন রক্তস্রোত ঘুরপাক খাচ্ছে। বুকের ভিতরে হৃদ্‌পিণ্ড উল্লাসে মাথা কুটছে। মন আতঙ্কে ঝড়ের মুখে পাতার মত কাঁপছে। কে যেন বলছে—না। আবার সামনে থেকে কে যেন টানছে—নিষ্ঠুর প্রবল আকর্ষণে টানছে। বাস্তব পৃথিবী মুছে যাচ্ছে। চৌরিঙ্গীর আলো, পথের মানুষ—কিছুই নেই। আছে ওই প্রতীক্ষমানা নারীটি, আর সে। সারা পৃথিবীতে তারা দুজন। এই অন্ধকার রাত্রে একখণ্ড নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে একটি ছোট্ট পৃথিবীর সৃষ্টি করবে দুজনে। হন হন করে চলল সে। বুকের ভিতরে আর্ত ক্ষীণকণ্ঠে ধ্বনিত—না শব্দটি স্তব্ধ হয়ে গেছে। কি বলবে? নমস্কার? না—। সোজা বলবে—চল বেড়িয়ে আসি। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হল। মাত্র দশ হাত দূর। দাঁড়াতে হল। একখানা ট্যাক্সি পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটির পাশে। একটা মানুষের মাথা বের হল একবারের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি এগিয়ে গেল। অল্প কয়েকটা কথার পর মেয়েটি ট্যাক্সিতে উঠল এবং ট্যাক্সিটা চলে গেল। জনের বুকের ভিতরটা একটা নিষ্ফল ক্ষোভে চীৎকার করে উঠতে চাইল কিন্তু গলা দিয়ে চীৎকার বের হল না। সে ক্ষোভ পড়ল নিজের উপর—ভীরু অক্ষম অপদার্থ! কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার চলল এগিয়ে। সে জানে, তার মনে পড়ছে রাস্তাটার অন্ধকার স্থানগুলিতে এরা ছড়িয়ে আছে। জীবনের বাসনা-সমুদ্রে তুফান উঠেছে। থামবার তার ক্ষমতা নেই। ফাদার—।

না—ফাদার নয়। তুমি নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মত জনের জীবনে এসেছ! না—তুমি নয়! ওই—ওই—!

ওই—ওই তো একটি ছায়ামূর্তি—একান্ত ভাবে উদাসীনীর মত যেন মন্থর পদক্ষেপে অল্প একটু জায়গার মধ্যে ঘুরছে। কোন দিকে দৃষ্টি নেই। ওই তো! চার্চের দিকের সরু ফালি ফুটপাথটিতে একা ঘুরছে।

সে নামল রাস্তার উপর। এপার থেকে ওপারে ওর কাছে গিয়ে বলবে—একলা বেড়াচ্ছেন? সঙ্গে বেড়াতে পারি?

My god! থমকে দাঁড়াল সে। একখানা বড় ভ্যান এসে দাঁড়িয়ে গেল ব্রেক কষে। পুলিস-ভ্যান। হ্যাঁ, পুলিস-ভ্যান। দুজন কনেষ্টবল লাফিয়ে নামল। ওরাও মেয়েটিকে দেখেছে। মেয়েটি ঢুকছে—চার্চের উত্তর দিকে বড় গাছের তলায় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে। সে একপা একপা করে পিছিয়ে এসে ফুটপাথে উঠল। হাত পা তার কাঁপছে। ওঃ, ওরা ওই চলেছে ওর পিছনে পিছনে—ওই গাছের তলার অন্ধকারে টর্চ দিয়ে চিরে। ওই! ওর আজ নিষ্কৃতি নেই। হে ভগবান!

ভগবানকে সে মনে মনে প্রণাম করলে। আর একটু হলে ওকেও পালাতে হত—পলাতক কুকুরের মত!

না, ও পথ নয়! ও পথ নয়! ভগবান বোধ হয় দেখিয়ে দিলেন তাকে। সম্ভবত ফাদার এবং লনার প্রতি করুণা করেই তিনি তাকে এইভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। সে ফিরে যাবে। একটুখানি দাঁড়িয়ে নিজের ভয়চকিত স্নায়ুচাঞ্চল্য সামলে নিয়ে সে ওপার থেকে এপারে এসে ট্রাম ধরলে। এসপ্ল্যানেডে দাঁড়াল না মুহূর্তের জন্য। এলিয়ট রোডের ট্রামে চেপে বসল। বাড়ি এসে ডাকলে—লনা!

মিষ্ট হেসে লনা বারান্দায় বেড়িয়ে এল—জন! পরমুহূর্তেই

সে শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—এ কি জন—তোমার চেহারা এমন কেন? তুমি কি অসুস্থ?

ক্লান্ত স্বরেই জন বললে—হ্যাঁ, আমি আজ অসুস্থ লনা। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। যেন ভেঙে পড়ছি।

—চল—শোবে চল।

বিছানায় শুয়ে জন বললে—ঈশ্বর আছেন—তার আজ প্রমাণ পেয়েছি লনা।

সবিস্ময়ে লনা তার মুখের দিকে তাকালে।—তারপর বললে—কি হয়েছিল জন?

জন তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—একেবারে আছাড় খেয়ে পড়ে যেতাম, পা পিছলে গিয়েছিল; কিন্তু একেবারে স্পষ্ট অনুভব করলাম কে যেন আমাকে ধরলে—ধরে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচালে।

—ওঃ! শিউরে উঠল লনা। তারপর বললে—পা পেছলাল কেন? কিসে পা পেছলাল?

—কিছুতে পা পড়েছিল। ঠিক বুঝলাম না। অন্ধকারের মধ্যে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হচ্ছিলাম। আর জান—যদি পড়তাম তো রাণওভার হ'য়ে যেতাম। একটা পুলিস-ভ্যান খুব জোরে চলে গেল পাশ দিয়ে।

লনা বললে—তুমি বড় হেস্টি—বড় কেয়ারলেস! না না, এমন করে তুমি পথ চলো না।

—আর চলব না। ওঃ! হে ভগবান! একটু চুপ করে থেকে বললে—ফাদারকে বলো না। কেমন?

—জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যা বলব?

—জিজ্ঞাসা করলে বলবে, কিন্তু তুমি না বললে তো তিনি জানবেন না। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন না।

—তুমি মারাত্মক দুষ্টু। Naughty—very very naughty—সে হাসলে।

—তুমি দুষ্টু লোক একেবারেই ভালবাস না, না?

—তুমি দুষ্টু কিন্তু তার চেয়েও বেশী মিষ্টি!

—তুমি ভালবাস আমাকে? কতটা বাস তা জানি না। আমি তোমাকে কত বাসি জান? অনুভব করি—'তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে'—ওই লাইন দুটো যেন আমার কথা। আমি পথে কুড়োনো ছেলে—আমার জীবন—

বাধা দিয়ে লনা বললে—প্লিজ—জন! প্লিজ! আমার কান্না পায়। এমন করে তুমি বলো না।

জন চুপ ক'রে গেল। একটু পর বললে, আমি তোমাকে চাই লনা।

—আমি তোমার জন। I love you। না না জন—এমন করে টেনো না—আমি ভয় পাই জন। না।

—লনা!

—জন!

—আমি তোমাকে চাই। ফাদারকে বলব—আমাদের বিয়ে হয়ে যাক। লনা!

আতঙ্কিত হয়েই যেন লনা অকস্মাৎ তার হাতখানা টেনে নিলে। আতঙ্কিত কণ্ঠেই বললে—না।

—লনা! উত্তেজিত হয়ে জন বিছানায় উঠে বসল।

—না না। আমি অক্ষম। আমি খোঁড়া মেয়ে। ক্ষমা করো আমাকে। না—না—

লনা চলে গেল। জন বিছানায় শুয়ে পড়ল ক্লান্ত হয়ে।

একটু হাসলে। মর্মান্তিক তিক্ত হাসি। আবার উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে।

লনার ঘরের দিকে জানালাটা খোলা ছিল, সেটা দিয়ে আলো আসছে। সেটা ভেজিয়ে দিতে গিয়ে সে দেখলে লনা বিছানায় বসে—ক্রাইষ্টের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে।

জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে একটু অপেক্ষা করে লনাকে দেখলে, দুর্বল-দেহ খোঁড়া লনা! জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে মনে মনে বললে—হতভাগিনীই বটে! একটা প্রাণহীন পুতুল!

সরে এসে অন্ধকারের মধ্যেই সে বিছানার উপর বসল।

মনের চোখের সামনে এই অন্ধকারের সুযোগে ছবিগুলো কি স্পষ্ট!

বহুরূপী আর সেই মেয়েটা—বেবী কৃষ্ণার মত মেয়েটা! বহুরূপী তাকে বলছে—নাও না একে। মেয়েটা হাসছে। হি—হি—হি—হি—হি—হি।

—না ওটা কুৎসিত—ভালগার! না—

পুতুল পেছন থেকে এসে তাকে টানছে। ওদের দুজনের সামনে ভেসে উঠছে একটা গগলস-পরা মুখ। ঠোঁটে লিপষ্টিক। সব মুছে যাচ্ছে হিজিবিজির মধ্যে। অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। তার মধ্যে বাতি জ্বেলে মুখের কাছে ধরে একটা কালো কাপড়-পরা কালো মেয়ে। বেবী কৃষ্ণা! না। বেবী কৃষ্ণা রোশনি মিশে এক হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে!

পরের দিন সকালে প্রেয়ারের পর ফাদার তাকে বললেন—জন, তোমাকে একটা কথা বলব।

ফাদারের ঘরে এলে ফাদার তাকে বললেন—জন!

—ফাদার!

—লনা আমাকে বলেছে। তুমি রাগ করেছ?

একটু চুপ ক'রে থেকে জন বললে—রাগ করি নি। I pity her—কিন্তু আমি যে তাকে চাই ফাদার।

—কিছুদিন অপেক্ষা কর জন। লনা এখনও বড় হয় নি। She has not grown—বুঝেছ আমার কথা।

আঙুল নেড়ে সে জানাল—হঁ্যা। এবং আস্তে আস্তে সে চলে এল ঘর থেকে। নিজের ঘরে ঢুকে চুপ করে গেল। এ কি নিষ্ঠুর জীবন তার! এ কি যন্ত্রণা! ওঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল লনা বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে আছে তার ঘরের দিকে। চোখে চোখ পড়তেই লনা মুখ ফেরালে। এ কি? তার দেহটা দুলে দুলে উঠছে। লনা কাঁদছে।

একান্ত ভাবে ছেলেমানুষ। করুণায় তার মন ভরে উঠল। বড় কোমল বড় ভীরু—বড় শিশু লনা।

না, লনাকে আর সে কখনও বলবে না। সে অপেক্ষাই করবে। প্রয়োজন হয় আজীবন।

॥ বারো ॥

সাত দিন পর।

গভীর রাত্রে জন অন্ধকার ঘরে জেগে রয়েছিল।

স্থির নিস্পন্দ বিস্ফারিত দৃষ্টি। মাথার মধ্যে তার উত্তপ্ত কল্পনা, উত্তেজিত চিন্তা। সাত দিনের মধ্যে সব তার উলটেপালটে গেছে। সব ভেসে গেছে। কেমন ক'রে গেল—কি ক'রে কি হ'ল—ন্যায় কি অন্যায় সে সব সম্পর্কে কোন ভাবনা নেই, বিচার নেই, বিশ্লেষণ নেই। হয়ে গেছে। তবে এইটুকু মনে আছে—হয়তো বা তার যুক্তি হিসেবেই আছে যে প্রতিদিন রাত্রে সে ফিরেছে—ফেরার পথে তার চোখে পড়েছে কলকাতা শহরের পথের মোড়ে মোড়ে—অন্ধকার ফুটপাথে—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রান্তরে গাছের

তলায়—চৌরিঙ্গীর জনস্রোতের চলমানতার মধ্যে জীবনের এই বিচিত্র লীলা চলছে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত উন্মত্ত রক্তস্রোত বয়ে গেছে। বুকের ভিতরটায় হৃদ্‌পিণ্ড উদ্বেগের মত আবেগে মাথা কুটেছে—অধীর হয়ে মাথা কুটেছে।

সব কথাও তার মনে নেই। হারিয়ে গেছে। ভুলে গেছে সে। ঊর্ধ্বশ্বাসে একটি লক্ষ্য সামনে রেখে ছুটে চললে যেমন পথের কথা মনে থাকে না—চোখে পড়ে না—ঠিক তেমনি। পিছন থেকে কে ডেকেছে—কিছু বলেছে—তাও তার কানে ঠিক যায় নি। দু একটা ডাক কানে এসেছে কিন্তু সে তাতে বিরক্ত হয়েছে। উপেক্ষা করেছে।

মনে পড়েছে চার দিন আগে—সেই সকালে—লনাকে কাঁদতে দেখে তার করুণা হয়েছিল। সে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। তাকে বলেছিল—লনা, আর আমি কখনও বলব না বিয়ের কথা। তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি—এই তো শ্রেষ্ঠ পাওয়া। তুমি যেদিন ডাকবে যেদিন আমাকে চাইবে সেদিন মুখে না পার ইঙ্গিতে বলো। জানিয়ো। একটি রাঙা ফুল আমার ফুলদানীতে রেখে এস। অন্যদিন রেখো সাদা ফুল। কিম্বা তোমার এই সাদা পায়রাটার কপালে একটি লাল টিপ পরিয়ে দিয়ো।

লনা হেসেছিল।

সেদিনও প্রসন্নহাস্যের মধ্যেই সে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে। পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে এসে মনে পড়েছিল গত রাত্রির কথা। আত্মগ্লানি অনুভব করেছিল। আবার মনে পড়েছিল কালকের সেই মুহূর্তটিতে ঈশ্বরকে মনে করার কথা। মনকে দৃঢ় ক'রে সে এসেছিল রিহারস্যাল স্টুডিয়োতে। গোটা পার্টটা মনের মধ্যে ভাবতে ভাবতেই ঢুকেছিল বাগানে। সোনার মেডেল! সেটা তাকে পেতেই হবে। সুমি সেনের করুণায় নয়, নিজের জোরে। হঠাৎ একটা

কথা তার মনে হল। পুতুল বললে—স্থমি সেন তাকে দেওয়াতে পারে? কি ক'রে?

পুতুল মেয়েটাকে তার ভাল লাগে না। না। না। তাকে সে আর প্রশ্রয় দেবে না। কখনও না।

বাগানের মধ্যে পুতুল আর বহুরূপী বসেছিল সেদিন। জনকে দেখেই পুতুল এগিয়ে এসে বললে—কাল যে আগে চলে গেলেন?

শুষ্ককণ্ঠে সে উত্তর দিল—শরীরটা ভাল ছিল না।

—আজ ভাল আছে?

—আছে। তবে খুব ভাল—মানে ঠিক সহজ বলতে পারি না। বহুরূপী বসে সিগারেট টেনেই চলেছিল—নির্বাক অচঞ্চল ভাবে। সেই এবার পুতুলকে বাধা দিয়ে বলেছিল—জান পুতুল, অরুণের গল্প!

—ঢং রাখ তোমার। অরুণ আবার কে?

—সূর্যের সারথি। গরুড়ের বড় ভাই। অসময়ে ডিম ভেঙে তাকে বের করা হয়েছিল বলে বেচারীকে চিরদিন সূর্যের পায়ের তলায় উত্তাপের জন্য থাকতে হয়েছে। তা দাও।

—মরণ, বুঝেছি।

—কি বুঝেছ?

—ঠিক বুঝেছি। ডিম ভাঙে নি বুঝি? ভেঙেছে। ও পাখী আকাশে উড়তে পারে। ওড়ে কি না কে বলবে। কি মশাই, ওড়েন না কি?

জন অত্যন্ত বিরক্তি বোধ ক'রে বলেছিল—আপনাদের এই ধরনের কথাবার্তা আমি ঠিক বুঝি নে। আমাকে মাফ করবেন।

রিহারস্যালের সময় হঠাৎ এক সময় ছোট্ট একটি ঢিল এসে পড়েছিল তার গায়ে। সে তখন সব ভুলে তাকিয়েছিল স্থমি সেনের গগলস-পরা চোখের দিকে। গগলসের কালো কাচের ভিতরেও চোখের দৃষ্টি কোথায় তা' বোঝা যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

দেখলে। ঢিল খেয়ে সে চমকে উঠেছিল। বুঝতে বাকী ছিল না ঢিলটা কে মেরেছে। তবুও সে চোখ ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করে নি। কিন্তু পুতুল ছাড়ে নি। সে কাছে এসে পিঠে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—একেবারে হুঁশ নেই। উঠুন। পার্ট আসছে। আপনার, আমার।

বিরক্ত হয়েই সে বলেছিল—এদেরটা শেষ হোক।

—উঠতে উঠতেই হবে। উঠুন। যে রকম সানসংজ্ঞা হারিয়েছেন! নিন।

উঠতে তাকে হয়েছিল। পুতুল বলেছিল—এ দিক থেকে ঢুকব আমরা। আমি আগে আপনি পরে। এন্ট্রান্সটা একসঙ্গে হলে আমার অসুবিধে হবে। আমি বেঁটে—আপনি লম্বা। ভাল মানাবে না।

একপাশে নিয়ে গিয়ে সে মৃদুস্বরে বলেছিল—সব দেখেছি আমি। ভারী মিষ্টি—না?

তার মুখের দিকে তাকাতেই সে ফিক ক'রে হেসে বলেছিল—আমি তোমায় ছাড়ব না—আমি তোমায় ছাড়ব না।

তারপরই বিচিত্র লাস্যে ঘাড় বেঁকিয়ে বলেছিল—চল না আজ রাত্রে আমার বাড়ি?

সারা দেহে মনে সে এক বিচিত্র অনুভূতি। দেহের ভিতর একটা নদীর বাঁধ ভেঙে যেন বন্যার জলস্রোত ছড়িয়ে পড়ছিল।

সেই মুহূর্তেই বাঁশী বেজেছিল—তাদের সিন শুরু হচ্ছে। প্রথম সিন—গানের মধ্যে। দুজনে তারা গান গাইছে।

পার্ট করতে করতে চোখে পড়েছিল—সুমি সেন চোখের গগলস খুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

সে দিন বিচিত্র ঘটনা ঘটল।

রিহারস্যাল-শেষে ভাঙা ভাঙা দলে সব বের হচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। মেয়েরা একখানা গাড়িতে যায়। হঠাৎ সুমি

সেন একটা সিগারেট মুখে পুরে তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল —দেশলাই আছে ?

হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে।—ও, আপনি বুঝি smoke করেন না! বলে নিজের খালি দেশলাইটা ফেলে দিয়েছিল তার পায়ের কাছে। মৃদুস্বরে ওটা নিন বলেই সে ফিরেছিল। আবার ঘুরে বলেছিল—সিগারেটটা ধরুন। দেওয়া নেওয়া চলে।

পুতুল দূরে ছিল। সে দেখেছিল এবং এগিয়েও আসছিল। কিন্তু সুমি সেন তার সামনে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা তুলে নিতে সময় দিয়েছিল। পুতুল অবশ্যই এসেছিল। এবং প্রশ্ন করেছিল—কি কথা হ'ল ? দেশসুদ্ধ লোক যে হাসছে! সাবধান কিন্তু।

মণ্টু মিত্তির তাকে বাঁচিয়েছিল।—পুতুল, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন মিত্তিরের গাড়িতে সে আসে নি। একলা এসেছিল বাসে। পথে দেশলাইয়ের বাক্সটা খুলেছিল। কিন্তু কিছুই ছিল না। উলটে দেখতে চোখে পড়েছিল—she is a bad girl—beware !

পথে কতবার যে লেখাটা পড়েছিল তার হিসেব নেই। সেদিন আর তার চোখ পথের উপর একবারও কাকেও দেখে নি, খোঁজে নি। বাড়িতে এসেও সে ক্লান্ত হয়ে শোয় নি। অনেক গল্প করেছিল লনার সঙ্গে। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কভাবে বলেছিল। অনেক মিথ্যা বলেছিল। একবারও নাম করে নি পুতুলের। সুমি সেনের নাম করেছিল। বলেছিল—ভারী চমৎকার মহিলা। গম্ভীর। কারুর সঙ্গে বাজে কথা বলেন না। পার্ট করেন, চলে যান। বেশী বলেছিল মণ্টু মিত্তিরের কথা।

রাত্রে ফাদার এসে তার সঙ্গে কথা বলে খুশী হয়েছিলেন। সে বলেছিল—খুব সম্ভব ফিল্ম হবে বইটা। মিত্তির বলেছিলেন—

ডিরেক্ট উনি করবেন। আর নাটকে পার্টটা ভাল হ'লে আমাকেই উনি হিরো করবেন।

ফাদার কথা বলেন নি। সে নিজের মনেই বলে গিয়েছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা।

হঠাৎ এক সময় সে নিজে থেকেই বলেছিল—আমি পরে ভেবে দেখেছি ফাদার। লনা সময় চেয়েছে—সে সময় তার পাওয়া উচিত। আমি অপেক্ষা করব।

মাথায় হাত বুলিয়ে ফাদার তাকে বলেছিলেন—God will bless you my boy. লনা সত্যই এখনও বালিকা। She has not grown up.

রাত্রে আলো নিভিয়ে শোওয়ামাত্রই অন্ধকারের মধ্যে সেদিন গগলস-পরা গম্ভীর একটি মুখ ভেসে উঠে একটু হেসে বলেছিল—very good—well done ! খুব ভাল এ্যাক্টিং করেছ। সোনার মেডেল তোমার। But Putul is very bad, don't—! তেরছা ক'রে মুখ বেঁকিয়েছিল। আঙুল তুলে শাসিয়েছিল।

আশ্চর্য মেয়ে সুমি সেন। পরের দিন আর সে তাব দিকে একবারও তাকায় নি, গম্ভীর মুখে অন্য দিকে তাকিয়ে বসেছিল। কিন্তু বারদুয়েক তার সঙ্গে নাটকে কথাবার্তা ছিল। বুলবুলের সঙ্গে দুবার ছিল ঝুনঝুনের নিভৃতে আলাপ। তারই মধ্যে কখন যে সুমি সেন পকেটে একখানা পাতলা রুমাল কাগজ গুটিয়ে ভরে দিয়েছিল তা বুঝতে পারে নি সে। হঠাৎ একটি মিষ্টি গন্ধ সে অনুভব করেছিল—তার পোশাক থেকে উঠছে। গন্ধ তার রুমালেও ছিল কিন্তু এ গন্ধ অন্যরকম। একসময় পকেটে হাত দিয়ে কাগজটা পেয়েছিল সে। ছোট একটা পেনসিলের মত গুটোনো। জন বের করতে গিয়েও বের করে নি। সে বুঝেছিল। আসবার সময় খুলে দেখেছিল—পেন্সিল কলমে লেখা একটি ছত্র—'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই—নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।'

পরের দিন কাগজ পায় নি—দেশলাইয়ের বাক্সও পায় নি। শুধু কানের পাশে এক সুযোগে একটি মৃদুস্বরের কথা ভেসে এসেছিল—Oh my love! পাশ দিয়ে গম্ভীর মুখে চলে গিয়েছিল সুমি সেন।

ছুটি কথা নয়—একটা ঝড়—উল্লাসের একটা ঝড়। মনের মধ্যে গান গুঞ্জন করে উঠেছিল—

চিড়িয়া বোল বোল কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী ?
গাগরিয়া ভরকে নয়নিয়া মারকে
হেলকে ঢুলকে পাঁজারিয়া বাজাকে ঝুমুর ঝুমুর ঝুম
পাঁজারিয়া বাজাকে কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী ?

সেদিন ফিরবার পথে সে কালিঘাট পর্যন্ত ট্রামে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল। উল্লাসের ঝড়ে যেন আগল ভেঙে গেছে। ট্যাক্সিতে চেপে মনে হয়েছিল টাকার কথা। টাকা আছে তো! ভিতর-পকেটে হাত পুরে সে যা ছিল বের ক'রে দেখেছিল। একখানা পাঁচটাকার নোট দুখানা একটাকার—পকেটে কিছু খুচরো পয়সা। হবে। এতে এসপ্ল্যানেড যাওয়া হবে। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলেছিল—বহুত জোরসে নহি; ধীরসে জানা। পথে পেতে রেখেছিল তার তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি।

ওই—ওই। ও কে? দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটা!

—কেয়া? খাড়া কঁরু? ড্রাইভার সামনে বসে—তাকে না দেখেও তার নড়াচড়ার শব্দে তার কথা বুঝেছে।

লজ্জিত হয়ে সে বলেছিল—না। সিধা এসপ্লানেডে।

—ভিক্টোরিয়া নেহি ঘুমিয়েগা? বহুত ঘুমতি হোগা উধর।

—নেহি জী।

—কেয়া নওজোয়ান আপ? আঁ?—

সে চটে নি। হেসেছিল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার তবু ছাড়ে নি। মোড়ের জায়গায় বলেছিল—ক্যা ?—ভিক্টোরিয়া নেহি যাঁউ ? সিধা চলে ?

সে বলেছিল—নেহি জী। উ বুরা কাম। নেহি কর না।

—বুরা কাম ? বলেই ছোট্ট একটুকরো হাসি হেসেছিল। বাবা—ই কাম বুরা তো ছুনিয়াই বুরা হ্যায়। তামাম ছুনিয়াভর চল রহা হ্যায়। কুছ বুরা নেহি সাব—কুছ বুরা নেহি। দিন ভর কাম করো। সামকো খানা খাও, দারু পিয়ো, রাতমে মজা করো। ওয়ো দেখিয়ে। বুঢ্ঢা ঘুমতা হ্যায়—উয়ো ছোকরীকে পিছে উয়ো।

ভারী হাসি পেয়েছিল তার। মন তার সান্ত্বনার আনন্দে ভরে উঠেছিল। বাড়ির দোরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। নিজেকে সংযত করতে হবে। সহজ করতে হবে।

সাবধান সে হয়েছিল। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কথা বলেছে। লনাকে স্নেহ করেছে, ফাদার শ্রদ্ধা দেখিয়েছে—তবু—আশ্চর্য—ছুদিন পর ফাদার তাকে প্রশ্ন করলেন—জন !

—ফাদার !—সে সকালে কামাতে বসেছিল।

—একটা কথা বলতে এসেছি।

—কি ফাদার ?

—আমি চিন্তিত হয়েছি জন। তুমি

—ফাদার !

—তুমি দূরে চলে যাচ্ছ !

চমকে উঠেছিল সে। মুহূর্তে সে উত্তপ্ত হয়ে বলেছিল—আপনাদের সন্দেহ কি কোনকালে যাবে না ফাদার ?

—না জন ! We—আমি লনা—we are feeling like that. তুমি যেন অত্যন্ত কৃত্রিম হয়ে উঠেছ। ঠিক ছুতিন দিনে যেন পাল্টে গেছ।

—মিস সেনকেও কে বলেছে।

—তাই বা কি করব ?

—ও রাক্ষুসী আমি বলে রাখলাম। সাবধান !

গুঞ্জনটা বেড়ে চলেছিল স্টুডিয়োতে। সে নিজে বুঝতে পারে তার উল্লাস প্রকাশ হয়ে পড়েছে—লাউডস্পীকারে ধ্বনিত, গানের মত। সুমি সেন এলেই সে লাউড হয়ে ওঠে। সংযত হতে সে চেষ্টা করে কিন্তু সব সময় মনে থাকে না; ভুলে যায় সে।

আজ রিহারস্থালে সুমি সেন তাকে অপমান করে বসল। ঝুনঝুন আর বুলবুলের রিহারস্থালের সময় হঠাৎ সে পার্ট বলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল। প্রমটারের দিকে তাকিয়ে বললে—এক মিনিট। তারপর সে জনের দিকে তাকিয়ে বললে—কল্যাণবাবু !

জন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালে।

—একটা কথা বলব। অফেন্স নেবেন না।

—বলুন।

—আপনার পার্ট হয়তো ভালই হচ্ছে। হয়তো সোনার মেডেল আপনিই পাবেন, কিন্তু ভাববেন—আমরা জিপ্সীর ভূমিকায় অভিনয় করছি, আমরা জিপ্সী নই—আমরা ভদ্রলোক—আমি ভদ্রলোকের মেয়ে। সেই ব্যবধানটুকু রেখে পার্ট করবেন—কেমন। এতখানি কাছাকাছি আসা—সে পার্টের সময়ও বটে—অন্য সময়ও বটে—আমি অন্তত পছন্দ করি না। যাঁরা করেন তাঁদের সঙ্গে আপনি যা খুশি করতে পারেন। কেমন ? নিন—বলান পার্ট। প্রমটার—প্লিজ গো অন।

পুতুল ফোঁস করে উঠেছিল। ঝগড়া একটা বাধত। কিন্তু থামিয়ে দিয়েছিল মিত্তির।

অপমানটা লেগেছিল জনের। কিন্তু সে অপমান মুছে

দিয়েছিল পুতুল। সে সেই আসরেই ওই সুযোগটি নিয়ে এসে নিবিড়ভাবে তার গা ঘেঁষে বসেছিল।

সেও আর সুমি সেনের দিকে তাকায় নি। ক্ষুব্ধ চিত্তে বসে ভাবছিল কি ভাবে এই কথার জবাব সে দেবে।

বিচিত্র সুমি সেন। রিহারস্যালের শেষে সুমি সেন সর্বসমক্ষেই বলেছিল—কল্যাণবাবু!

কল্যাণ মুখ তুলে তাকিয়েছিল। সুমি সেন এগিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—আমি হয়তো একটু রূঢ় হয়েছিলাম। আমরা একসঙ্গে অভিনয় করেছি—আনন্দ করব। আঘাত পেয়ে থাকলে আমাকে ক্ষমা করবেন।

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সুমির মুখের দিকে, কিন্তু সে তার হাতের মধ্যে অনুভব করছিল—সুমি সেন হাত চেপে ধরার সুযোগের মধ্যে সিগারেটের মত কিছু গুঁজে দিয়েছে। কিন্তু সেটা সিগারেট নয়। আরও কিছু অনুভব করেছিল হাতের চাপের ইঙ্গিতের মধ্যে। সর্বশরীরে সে একটা শিহরণ অনুভব করেছিল। সে এক উন্মাদনা। বুঝতে পেরেছিল সেটা সিগারেট নয়—চিঠি। হাত ছাড়ার আগে সুমি সেনের ব্যাগটা মাটিতে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুমি হেঁট হয়ে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে হেসে সকলকে নমস্কার ক'রে চলে গিয়েছিল। জন সেই সুযোগে সিগারেটের মত পাকানো কাগজটাকে পকেটে পুরে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

. কাগজটা চিঠি।

এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পকেটে হাত রেখে চিঠিখানাকে মুঠোয় ধরে এসে মেট্রোর নীচে উজ্জ্বল আলোয় পড়েছিল—সুমি সেনের চিঠি। বুকের ভিতরটায় যেন উল্লসিত উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল। সুমি সেন লিখেছে—তোমাকে ভালবাসি। I love you—তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে চাই। তুমিও চাও। কিন্তু আমি পুতুল নই। সুমি সেনের ঘর আছে, মান আছে, সম্ভ্রম

আছে। কিন্তু তুমি অধীর হয়েছ। আমিও হয়েছি গো। কিন্তু করব কি? পাপ মানি নে আমি—ঈশ্বর মানি নে কিন্তু সম্ভ্রম মানি যে। আজ তুমি পুতুলের দিকে ঘুরে বসলে। ছেলেরা এমনই বটে। হোক এর অবসান। কাল ঠিক ছ'টায় মেট্রোর নীচে দাঁড়িয়ে থেকো। সুমি যাবে। তারপর—একটি আনন্দ-রজনী। অবশ্যই সেজে এস। পত্র ছিঁড়ে ফেলো।

হাজার হাজার বাতি জ্বলে উঠেছিল মুহূর্তের জন্য তার চোখের সামনে—উল্লাসের হাসির একটা কলোচ্ছ্বাস বেজে উঠেছিল কানের পাশে; সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিল—এখনও তার রেশ রয়েছে। হাজার হাজার বাতির ছটা উল্লাসের হাসি কলোচ্ছ্বাস মুহূর্তের জন্য—মুহূর্ত পরে আর তার অস্বস্তি ছিল না কিন্তু তার দেহের কম্পন অনেকক্ষণ ছিল।

ঘরে এসেও ছিল, এখনও আছে। বিছানায় সে শুয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে, চোখের সামনে অন্ধকারের সুযোগে অনেক কল্পনার ছবি ফুটছে, মিলিয়ে যাচ্ছে—পরে পরে সাজানো হয়ে একটি সুসজ্জিত আনন্দলোক আনন্দরাত্রি রচিত হয়ে চলেছে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে তার শরীর এখনও কাঁপছে। সে স্থির হ'তে পারছে না। কালকের সন্ধ্যা ছ'টা ভিন্ন স্থির হতে পারছে না। পারবে না। পারবে না। হয়তো ছ'টায় শেষও হবে না। বাড়বে—যে মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখা হবে সেই মুহূর্তে এ কম্পন শতগুণ হয়ে উঠবে।

স্বস্তি সে কিছুতেই পাচ্ছে না, ঘুম তার কিছুতেই আসছে না। কল্পনায় দেখছে মেট্রোর জনতার মধ্যে সে উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—একটা ট্যাক্সি এসে মেট্রোর সামনে থামল—গাড়ির মধ্যে গগলস-পরা একরাশ খাটো স্যাম্পু করা চুলের ঘের দেওয়া একখানা মুখ। গাড়ির দরজা খুলছে। ভাড়া দিচ্ছে। কিন্তু ভাড়া সে দেবে।

তার টাকা চাই। না, খাটো সে হ'তে পারবে না। তার

টাকা চাই। একটি টাকাও সে তাকে খরচ করতে দেবে না। না। কিন্তু কোথায় পাবে সে টাকা? সে তো এ বাড়ির অনুগৃহীত পোষ্য। মাত্র সেদিনের তিরিশ টাকার গোটা বারো টাকা অবশিষ্ট আছে।

উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল সে। ঘরে ঘরে সব ঘুমুচ্ছে। হ্যাঁ। আস্তে অতি সন্তর্পণে উঠল সে। জানালায় কান পাতল। না, এতটুকু জেগে থাকার শব্দ নেই। আবার শুনল। ফাদারের ঘরের দরজায় কান পাতল। ফাদারের নাক ডাকছে। হ্যাঁ। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে বাইরে ছাদে দাঁড়াল। না, আলো ভাল লাগছে না। আবার ঘরে ফিরে এল। টাকা চাই তার। ফাদারের ঘরের দরজায় হাত দিল। বন্ধ থাকে না দরজাটা। খুলেই রাখেন ফাদার। মধ্যে মধ্যে সন্তর্পণে খুলে দেখেন সে কি করছে। মনে মনে তার ক্ষোভ হয়েছে—অভিমান হয়েছে—আজ সে খুশী হ'ল। খুললে সে দরজাটা—ঢুকল ভিতরে। সে জানে কোথায় কি থাকে। পকেটে ব্যাগ আছে। ওই দিকে ড্রয়ারে থাকে সঞ্চয়ের টাকা। নিঃশব্দ পদক্ষেপে সে অগ্রসর হ'ল। হঠাৎ জাগলে কি বলবে? সারিডন খুঁজছে সে—মাথা ধরেছে।

॥ তেরো ॥

পরের দিন, ছ'টা। মেট্রোর সামনে অধীর আগ্রহে জন দাঁড়িয়েছিল। বাড়ি থেকে সে বেরিয়েছে খুব সকালে। টাকা চুরি ক'রে থাকতে সে সাহস করে নি। ঘুরেছে সারাটা দিন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে; বাড়ির ভাবনা—ফাদার লনা কারও কথা কারও মুখ বারেকের জন্যও মনে পড়ে নি, সব পিছনে বিস্মৃতির মত অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। সামনে সুমি সেন—সুমি সেন। জীবনে তার প্রথম নারী। প্রিয়া। যে দেহ

মন সমর্পণ ক'রে তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবে। এর কাছে আর কিছু নেই—কিছু নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে যাবে—মিনিটে মিনিটে বিলুপ্ত হয়ে আসছে। এ কি উত্তেজনা—এ কি আবেগ—এ কি উৎকণ্ঠা—এ কি উদ্বেগ! এ কি অস্বস্তি—এ কি উল্লাস! খেয়েছিল একটা হোটেলে। কিছুক্ষণ ছিল গঙ্গার ধারে—কিছুক্ষণ ঘুরেছে ইডেন গার্ডেনসে। কিছুক্ষণ ঘুরেছে ডালহৌসি স্কোয়ারে। বিকেল চারটে থেকে এসেছে চৌরিঙ্গীতে, বারকয়েক চা খেয়েছে। খানিকটা ঘুরেছে মার্কেটে। একটা সেন্ট কিনেছে সুমি সেনের জন্য। দামী সেন্ট—দশ টাকা দিয়ে কিনেছে। আরও কিছু কেনবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু টাকা কম। যা বের ক'রে এনেছে মুঠো ধরে তা গুনে দেখে পেয়েছে একশো তিরিশ টাকা। দশ টাকা পাঁচ টাকা আর একখানা একশো টাকার নোট। জীবনে বস্তিতেও এমনভাবে চুরি সে কখনও করে নি। বাজারে বেগুন আলু চুরি করেছে, রামেশ্বর দবির পকেট কেটেছে—সে পাহারা দিয়েছে কিন্তু এমন চুরি করে নি। ওটাতে ভয় ছিল। কিন্তু সে ভয় আর নেই। সকাল পর্যন্ত ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে কেটে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিনিটে মিনিটে মিলিয়ে যাচ্ছে—ওটা কি ক'রে থাকবে। নেই। চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে। বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ড লাফাচ্ছে। কই—কই—কই? সুমি সেন? গগল্‌স পরা লম্বা মেয়েটি—। ওই—। না—ও নয়। গাড়িটা চলে গেল। গাড়ির পর গাড়ি। গাড়ির স্রোত। হঠাৎ পিছন থেকে পিঠে হাত দিল কে! চমকে উঠেছিল জন—মনে হয়েছিল—ফাদার! কিন্তু পিছন ফিরে সে উল্লাসে অধীর হয়ে উঠেছিল। সুমি সেন!

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা বলতে নিষেধ ক'রে সুমি সেন এগিয়েছিল। ওপারের দিকে। ওখানে ট্যাক্সি নিয়ে বলেছিল—হোটেল। ফ্রী ইস্কুল স্ট্রীটের বগলে।—

—হোটেল ?

—হ্যাঁ হোটেল ! মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য মদির হেসে সে বলেছিল—কিছু জান না। আমিই তোমাকে পাপে ডোবালাম।

—বলো না ও কথা !

—পৌরুষে আঘাত লাগছে ? কিন্তু ওই জন্যেই তোমার জন্যে এত অধীরতা আমার ! তুমি উচ্ছিষ্ট নও। চল। ভয় নেই। আমার জানা জায়গা।

ঢং ঢং ক'রে কোথায় ন'টা বাজল। চমকে উঠে বসল সুমি সেন। ঘরের আলোটা জ্বাললে। টেবিলের উপর মদের বোতল গ্লাস। চারটে খাবারের ডিস। মদে প্রায় বেহুঁশ হয়ে রয়েছে জন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার কাছে। সুমি সেন তাকে ডেকে বললে—চল।

চমকে উঠল জন—কোথায় ?

—বাড়ি। তুমি তোমার বাড়ি যাও। আমি আমার বাড়ি। স্বপ্নলোক গ্রীনল্যাণ্ড অবাস্তব অস্থায়ী বন্ধু !

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল জন তার দিকে।—বাড়ি ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আবার শূন্যতা থেকে বাষ্পের আকার নিয়ে গড়ে উঠছে। ধীরে ধীরে কঠিন রূপ নিচ্ছে। কঠিন শক্ত পৃথিবী, অসাবধানে হুঁচোট খেলে পড়ে আঘাত লাগে, রক্ত ঝরে। কঠিনতর কিছুর সঙ্গে আঘাত পেলে জ্ঞান হারায়। সেই পৃথিবী। এ পৃথিবী আনন্দের মধ্যে লুপ্ত হয়েছিল—আবার গড়ে উঠল—শুধু তার বাড়িটা চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

—জন ! ওঠো।

—না।

—বড়ি চলো।

—আমার বাড়ি নেই ! কোথায় যাব ? সত্যিই নেই।

নেশার মধ্যেও জনের এটুকু বোধ আছে যে যেখানে গৃহপ্রবেশ বাধা কেউ না দিলেও সেখানে ঢুকবার অধিকার তার নেই! নেই! নেই! সে চুরি করেছে, সে সুমি সেনকে নিয়ে ব্যভিচার করেছে —তাতে তার বাধে নি—সংকোচ হয় নি। কিন্তু না—ওখানে— ফাদার এবং লনা যেখানে আছে সেখানে ঢুকতে সে পারবে না।

সুমি সেন চলে গেল। একটু হেসে বলে গেল—বেচারী! একেবারে গোবেচারী! তারপর সে হোটেলের বয়কে ডেকে বলে গেল—সায়েব রাত্রে রইল। থাকবে। বুঝলে? আমি আফিসে টাকা দিয়ে যাচ্ছি।

জন একা লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। কাঁদতে চাইলে। কিন্তু কান্না এলো না।—কি করবে সে? কি করবে? চোখে পড়ল মদের বোতলটা। একটা পাঁইট বোতল—তার কিছুটা পড়ে আছে। সুমি সেন চতুরা—সে বেশী খায় নি। খায় না। কিন্তু না-হলেও মনে হয় এই গোপন উল্লাস সম্পূর্ণ হ'ল না। জনের প্রথম মদ্যপান। কিন্তু তবুও সে সুমির চেয়ে বেশী খেয়েছে। খানিকটা পড়ে আছে। সেটুকু সে গ্লাসে ঢেলে খেয়ে নিলে। বেশ লাগল। সিগারেটের প্যাকেট ছিল টেবিলে—একটা বের ক'রে ধরালে। আজ সে আবার সিগারেট ধরেছে। ধরবেই তো। ফাদার লনা—ওদের সঙ্গে সব শেষ। আর বাধা কি? কিছু না। আরও মদ খানিকটা। সে অজ্ঞান হয়ে যেতে চাচ্ছে। এবং মদের নেশার একটা অপরূপ স্বাদ এবং আকর্ষণ অনুভব করছে। সে ডাকলে—বয়।

বয় এসে দাঁড়াল।—আর একঠো পাঁইট। পকেট থেকে টাকা বের করলে সে। একশো টাকার নোটটা দিলে। অনাবশ্যক-ভাবে প্রশ্ন করলে—মেমসাব চলি গেয়ি?

—হাঁ হুজুর।

জনের মনে পড়ে গেল পুরনো গান।—

চিড়িয়া বোল বোল কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী—

গাগরিয়া ভরকে ঘুঙুটিয়া বাজাকে ঝমক ঝমক ঝম্

বয় ফিরে এল বোতল নিয়ে। টেবিলের উপর বোতল রেখে নোটের চেঞ্জ হাতে দিল। তখনও সে গাইছে। দরজাটা খোলা। হঠাৎ বিস্মিত দৃষ্টি চোখে মেখে দাঁড়াল এক কালো মেয়ে। পরনে সালোয়ার পাঞ্জাবি, ওড়না, মাথায় বেণী, ঠোঁটে লিপস্টিক। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বয় বললে—যাও যাও, বাহার যাও।

জন বললে—নেহি। রহনে দেও। Come in honey—sit down.

বয় দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেল।

মেয়েটি বললে—সেলাম সাব। আচ্ছা গীত। আপ তো বহুৎ আচ্ছা গাহেতে হেঁ। হম ভি গানা করে?

—করো। আগাড়ী পিয়ো। দারু পিয়ো।

গ্লাসটি নিঃশেষ ক'রে সিগারেট ধরিয়ে ঘাড় দুলিয়ে মুচকি হেসে সে ধরলে—চিড়িয়া বোল বোল—হাসির মধ্যে ছোট ছোট দাঁতগুলি ঝিলিক দিয়ে উঠল। সবিস্ময়ে জন তার মদের নেশায় বিভ্রান্ত চোখ বিস্ফারিত ক'রে তার দিকে তাকালে। দুই হাতে তার মুখ ধরে কাছে এনে দেখতে দেখতে বললে—ক্যা নাম তুমারি? আঁ?

—শিরিন—

—নেহি। রোশনি। তু রোশনি—

সে চমকে উঠল। সরে যেতে চাইলে। কিন্তু সবলে তাকে কাছে টেনে জন বললে—হুমি বাচ্চি। চাই নে স্নমি সেন তোমাকে। চাই নে। জীবনে সে রোশনিকে ফিরে পেয়েছে। আবার সে তার সহজ জীবন ফিরে পেয়েছে। রোশনি রোশনি রোশনি। কিছু আর মনে রইল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবার ধীরে

ধীরে নয় এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। রোশনির সঙ্গে জড়ানো পল্টন—সেও না।

*   *   *   *

দুটো দিন বিশ্বজগৎ ছিল না। তৃতীয় দিনের প্রভাতে বিশ্বজগৎ আবার স্বরূপে প্রকাশিত হ'ল জনের সামনে। বয় এসে সকালে ডেকে ঘরে এসে ঢুকল চা নিয়ে। বললে—আজকের রূপেয়া সাহেব? রহেঙ্গে আজ?

—না। চলে যাব চা খেয়েই।

টাকা ফুরিয়েছে। শুধু ফুরিয়েছেই নয়, গতকাল বয়কে তার রিস্টওয়াচ আর আংটি বিক্রি করেছে সন্ধ্যাবেলা। তখনও খেয়াল হয় নি। তখন সন্ত এসে রোশনি ঘরে ঢুকেছে।

এ দু'দিন ঠিক সন্ধ্যায় রোশনি এসেছে, সারারাত্রি কাটিয়ে চলে গেছে ভোরবেলা। মদ্য পান করেছে দুজনে। আর উল্লাসে আনন্দে মৃদুস্বরে গানে মৃদুচরণে নেচে পরস্পরের বাহুবন্ধনের মধ্যে কেটে গেছে সারা রাত্রি। রোশনির এখন এই পেশা। হোটেলে হোটেলে ফেরে। পথে পথে বেড়ায়। ময়দানের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকে ট্যাক্সিতে নিয়ে যায়। সবিস্ময়ে বার বার বলেছে—বাচ্চি, মেরি বাঁশুরিয়া, তুমি এমন সুন্দর হয়েছ, এমন বড় আদমী হয়েছ—আমার বহুৎ সুখ। তুমি জান না, তুমি জান না, সারা জিন্দিগী ভোর আমি তোমাকে চেয়েছি। স্রিফ তোমাকে। কি যে ভাল লেগেছিল! সেই প্রথম দিন থেকে! বদমাশ দুশমন শয়তান পল্টন সব বরবাদ ক'রে দিয়েছে।

চমকে উঠেছিল জন—বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তার মুখ—পল্টন—! সে কোথায়? সে কি তোর কাছে থাকে রোশনি—

—না। তার উপর সাত আট পরোয়ানা ঘুরছে পুলিসের। মারপিঠ—রাহাজানি—চুরি—। সে নেশাখোর গুণ্ডা বন গিয়েছে—কোথা কোথা লুকিয়ে থাকে—কভি কভি আসে—দিনের বেলা

আসে। নেহি তো হমাকে তো মিলে না। টাকা লিয়ে যায় জবরদস্তি ক'রে। তুমার কুনো ডর নাই বাচ্চি। হমি সব জানি। তাকে তুমার কথা কভি বলব না। কভি না।

—ঈশ্বরের নাম নিয়ে বল।

—খোদা কসম মেরা বাঁশুরিয়া—ভগবান কসম। তুমার সে হমার কোই বড় না আছে বাচ্চি!

বিশ্বজগৎ নির্মেঘ নীল আকাশের মত বাধাবন্ধহীন শুধু নীলাভ সুষমাতে পরিণত হয়েছিল—তাতে সে আর রোশনি দুটি নক্ষত্রের মত ভেসে বেড়িয়েছিল। পল্টনই নয়, সুমি সেনকেও মনে পড়ে নি। ফাদার লনা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।

আজ ভোরে সে রোশনিকে বলেছে তার অবস্থার কথা। রোশনি টাকাটা নিতে চায় নি, সে জোর ক'রে দিয়েছে। রোশনি বলেছিল—তবে আমার কামরাতে চলো। তোমার দুখ হবে, তকলিফ হবে, তব ভি তো জাগা মিলবে। তারপরই বলেছে—না বাচ্চি, না। পল্টন কৌন জানে কৌন বক্ত এসে যাবে তো কি হবে। আজ তক তুমার পর বহুৎ গোস্সা। না।

—আমার জন্যে ভাবিস নে রোশনি। পথ আমি ক'রে নেব। ঠিক করেছিল মিত্তিরের কাছে গিয়ে সে পায়ে ধ'রে মাপ চাইবে। ওই বাগানেই একটা আস্তানা ক'রে নেবে। উপার্জন সে করতে পারবেই। না হয় হোটেলে গিয়ে বাজনা বাজাবে। হোটেলে বাজায় যারা তাদের চেয়ে সে অনেক ভাল বাজায়।

—তুমার সাথে হমার দেখা হোবে না?

—কোথায় দেখা হবে বল? টাকা তো নেই। ঘরের ভাড়া তো নেবে। মাত্র পাঁচটা টাকা ক' আনা আছে।

—ময়দানে বাচ্চি। হমি তুমার লেগে খাড়া থাকব। ওই পারক্ স্ট্রীটের উধারে ওই রাস্তার জংসনে। গাছের তলায়। দশ বাজে নও বাজে ইগারা বাজে তক থাকব হমি বাচ্চি!

একটু ভেবে সে বললে—আসব রোশনি। তুই ছাড়া আমার জীবন কেউ ভরে দিতে পারবে না। মনে মনে বলেছিল—তাই হয়তো ভাগ্যচক্রের ফল। আমি অপবিত্র, ফাদার বলে মূর্তিমতী পবিত্রতা লনা—তাকে দিয়ে আমার জীবন ভরবার নয়; রোশনি, তুই অপবিত্র আমারই মত—হয়তো তুই পাপ। তোকে নইলে জীবন তো পূর্ণ হবে না আমার। সুমি সেন পুতুল ওদের দিয়েও নয়। ওরা কিছুটা আলো, কিছুটা অন্ধকার, তুই পূর্ণ অন্ধকার। অমাবস্যা। বেবী কৃষ্ণাও নয়। তুই।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সারাটা দিন কাটিয়েছিল প্রথম দিনের মত। ইডেন গার্ডেনস্—গঙ্গার ঘাট। যেন যে পথে পথে হোটেলে এসেছিল সেই পথ ধরেই ঘুরে যাচ্ছিল। বেলা তিনটের সময় সে এসে দাঁড়িয়েছিল ধর্মতলা চৌরিঙ্গীর জংসনে—টালিগঞ্জের ট্রাম ধরবে। এরই মধ্যে ফিরিঙ্গী কৃশ্চান স্বৈরিণীরা ফুটপাথে বেরিয়েছে। সে জানে, শুনেছে, ওই হোটেলটায় দেখেছে, বারে ওরা গিয়ে বসবে। গোটা দুনিয়াটার এই চেহারাই আজ তার চোখে পড়ছে। কিন্তু রোশনির মত কেউ নয়। সে বাসে উঠে বসল। মাথায় একটা অবসাদ। বাসের আয়নাটায় নিজের চেহারা দেখে সে চমকে উঠল। কিছুক্ষণ পর মনে হ'ল কি ক'রে গিয়ে ওই চেহারা নিয়ে দাঁড়াবে? পুতুল কি বলবে? সুমি সেন গগল্‌সের ভিতর দিয়ে তাকাবে। কি ভাববে? না না। সে উঠে দাঁড়াল। আবার বসল। আবার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বাসটা থামতেই নেমে পড়ল।

হাজরা রোডের মোড়। সে পার্কে গিয়ে বসল এক কোণে পশ্চিম দিক ঘেঁষে। ছায়া পড়েছে ওদিকটায়। অপরাহ্নে বাতাস একটু মধুর হয়ে এসেছে। ক্লান্ত দেহ নিয়ে বেঞ্চে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। অল্পক্ষণ অবশ্য। বিকেলে পার্কে মানুষের সমাগম

হচ্ছিল। সে উঠে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ফুটপাথে। কোথায় যাবে? সামনে রাত্রি নামছে। কোথায় যাবে সে? ফাদারের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা মনেই আসে না। চিরদিনের জন্যে সে তাদের পিছনে ফেলে এসেছে। আজ সে প্রমাণ করেছে চলে এসে যে কবর থেকে সে উঠে এসেছিল বলে এবং দেখতে সে অনেকটা ফাদারের মরা ছেলে জনের মত বলে সে জন নয়, জন নয় —সে বাচ্চি; পিতৃমাতৃ-পরিচয়হীন জ্ঞাতিহীন গোত্রহীন বাচ্চি; বাচ্চি আবার তার নিজের পথে চলবে। যে শিক্ষা তুমি দিয়েছ ফাদার তার জন্যে সে কৃতজ্ঞ থাকবে—তাই দিয়েই সে ক'রে খাবে —পারবে ক'রে খেতে। সে পশ্চিম ফুটপাথ থেকে পূর্বদিকে এল; যাবে সে মন্টি মিস্ত্রিরের কাছে। তা ছাড়া পথ নেই। কিসের লজ্জা! কিসের সংকোচ! মন্টি মিস্ত্রিরের তো বলা উচিত নয় যে সে অপরাধ করেছে। কিন্তু আশ্চর্য—পারলে না। উঠতে গিয়েও পারলে না। পকেটে পাঁচটা টাকার চারটে এখনও আছে। রাতটা চলে যাবে। তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে ময়দান। অন্ধকারের প্রতীক্ষায় হৃদ্‌পিণ্ড অধীর আগ্রহে যেন দৌড়তে চাচ্ছে। ময়দানে গাছের তলায় রোশনি আসবে। রোশনি অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ কল্পনা জেগে উঠল। ময়দানে কোন ঘনছায়াপল্লব গাছের তলায় আজ বাসর পাতবে। ভোরবেলা রোশনিকে বিদায় দিয়ে আরম্ভ করবে জীবন। নতুন জীবন। যাবে—মিস্ত্রিরের বাড়িতে যাবে। সে ফিরে এল পশ্চিম দিকের ফুটপাথে। চড়ে বসল বাসে। এসে নামল মেট্রোর সামনে। এখনও সন্ধ্যা নামে নি। কোন হোটেলে খেতে হবে। সস্তা কোন হোটেলে। তারপর কোন দিশী মদের দোকান। মদ নইলে বল পাচ্ছে না।

হঠাৎ তার হাত ধরল কেউ। চমকে উঠল সে। কে?—ফাদার! তার মুখখানা কেমন হয়ে গেল সে জানে না তবে বুকটা ধড়ধড় ক'রে যেন হা—হা ক'রে কেঁদে উঠল;—না—কেঁপে উঠল,

না—না—না বলে চীৎকার ক'রে উঠল। কিন্তু ফাদারের মুখ প্রশান্ত—চোখ দুটি বেদনায় ছলছল করছে। কিছু বললেন না তিনি। তিরস্কার না—অনুযোগ না—কিচ্ছু না। বললেন—চল, বাড়ি চল।

শুধু চল, বাড়ি চল। হাত ধরে আকর্ষণ ক'রে বললেন—এস। একখানা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি এলেন। গাড়িতে সারাটা রাস্তার মধ্যে একটি কথা বলেছিলেন—ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন জন! তুমি যে আমাকে কি কষ্ট দিয়েছ জান না। ওঃ!

চোখের কোণ থেকে দুটো জলের ধারা নেমে এসেছিল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে কিন্তু জনের সারা অন্তর না—না—না বলে চীৎকার ক'রে উঠল। সে থমকে দাঁড়াল।—আমি যাব না ফাদার, আমাকে ছেড়ে দিন।

—জন! মাই বয়! না না, এমন করে না। হ্যাভ পিটি অন মি, অন লনা! জন! প্লিজ!

হাত ধরে টানলেন তিনি—সেও গেল কিন্তু তার অন্তর চীৎকার ক'রে বললে—এর মধ্যে মরে যাব—আমি মরে যাব। না—না—না। আবার বললে—কোন্ অধিকারে? মূর্খ লজ্জাহীন, কোন্ অধিকারে তুই যাবি? কোন্ মুখে তুই গিয়ে দাঁড়াবি লনার সামনে? সে তার সেই বড় বড় শুভ্র দুটি চোখ মেলে তোর দিকে তাকাবে—সে দৃষ্টি কি ক'রে তুই সহ্য করবি? কিন্তু তার পূর্বেই ফাদার তাকে তার ঘরে এনে বসিয়ে দিয়ে বললেন—তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। কেউ আসবে না। বিশ্রাম কর তুমি। নিজে গিয়ে বিস্কুট কেক কফি এনে দিয়ে বললেন—খাও।

আলোটা জ্বেলে দিয়ে চলে গেলেন। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত সে কেক বিস্কুট কফি খেয়ে শান্ত হ'ল একটু। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে। আলো ভালো লাগছে না। অন্ধকারেই যেন স্বস্তি। মনটা মাথা তোলে।

ওপাশে মৃদুস্বরে কথা বলছে চাচী। লনা নীরব। পাথর হয়ে গেছে। তাই যাবে—তাই ওর ভাগ্য। মধ্যে মধ্যে ফাদার বাইবেল থেকে আবৃত্তি করছেন। সেও ভাল লাগছে না তার।

ঘড়িটা ঢং ঢং শব্দে বাজতে লাগল। এক—দুই—তিন—ছয়—সাত—আট। প্রতিটি শব্দের প্রতিধ্বনি উঠল তার হৃদ্‌পিণ্ডে। উঠে এসে সে জানালায় দাঁড়াল। গাছের তলায় রোশনি এসেছে? নিশ্চয় এসেছে। অথবা আসছে।

—জন! এস, প্রার্থনা করবে এস।

—না। রূঢ় স্বরে বললে জন।

—জন!

—না। না।

ফাদার, হতভাগ্য প্রৌঢ় চলে গেলেন। প্রার্থনা হচ্ছে—অসহ্য মনে হ'ল জনের। না—না—না। সে সইতে পারছে না। পারছে না। প্রার্থনা শেষ হ'ল। অস্থির পদচারণা তার ক্ষান্ত হ'ল। আবার দাঁড়াল জানালায়। চাচী খাবার দিয়ে গেল নীরবে নিঃশব্দে। কিন্তু সে আর সে খেল না। রুচি হ'ল না। ওধারে ওরা খাচ্ছে। আবার ঘড়ি বাজল—সাত—আট—নয়। অস্থির হয়ে উঠল জন।

হঠাৎ ও ঘরে বাজনা শুরু হ'ল। ফাদার বেহালা বাজাচ্ছেন। সেই সুর। যে সুর তাঁর মৃত ছেলেমেয়েকে শোনাতে কবরখানায় যান দুর্যোগের রাত্রে—সেই সুর। সমস্ত শরীর মন কেমন যেন হয়ে যায় জনের ওই সুর শুনলে। আত্মা আর্তনাদ ক'রে উঠল তার, সেই কবরখানায় সেই রাত্রে যেমন আর্তনাদ করে উঠেছিল তেমনি আর্তনাদ। সে চীৎকার ক'রে উঠল—না—না—না।

ওদিকে ঘড়িতে বাজল—ঢং। সাড়ে নয়।

চীৎকার ক'রে উঠল সে—না। ফাদার, আমি থাকতে পারব না। না, আমি চললাম। বলেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িটায় দুড়দুড় শব্দে নেমে ছুটল। চোখের সামনে কিছু নেই—

আছে ময়দানের গাছতলার অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত রোশনি। সে ছুটল। এখানে সে থাকতে পারবে না।

পিছনে চীৎকার ক'রে উঠলেন ফাদার—জন! জন! জন! তিনিও ছুটলেন। উন্মাদের মত ছুটলেন। জন এলিয়ট রোড থেকে ওয়েলেসলি হয়ে পার্ক স্ট্রীট ধরে ছুটল। অঞ্চলটা জনবিরল হয়ে এসেছে। সে ছুটল—। পিছনে আর্তকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে—জন! জন! জন!

চৌরিঙ্গীর মোড়ে এসে দাঁড়াল। একসময় ছুটে পার হয়ে গেল রাস্তা। অন্ধকার গাছতলা ধরে ছুটল—রোশনি! রোশনি! ওই রোশনি!

—রোশনি!

—বাচ্চি পালা! বাচ্চি—পল্টন! উ তোর পাতা পেয়েছে বাচ্চি!

চমকে উঠল জন! মুহূর্তে কোন অন্ধকার ভেদ ক'রে অথবা মাটি ফুঁড়ে সামনে দাঁড়াল পল্টন। ভয়ংকর পল্টন! একটা চাপা গর্জন ক'রে উঠল সে—শালা হারামী! ওই আসছে! কাছেই।

জন আতঙ্কে ছুটল—মুহূর্তে মনে পড়ল ফাদারকে। চীৎকার করলে—ফাদার! ফাদার! ফাদার! উর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটল আলোকিত চৌরিঙ্গীর দিকে। সাড়া পেলে—জন! জন! জন!

ফাদার! ফাদার! হঠাৎ পায়ে গাছের শিকড় আটকে আছাড় খেয়ে পড়ল জন। লাফ দিয়ে পড়ল তার উপর ভয়ংকর পল্টন! সে শেষ চীৎকার করলে—ফাদার!—তার বুকের উপর পল্টন। ওদিক থেকে আর একজন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। কি হ'ল! কিছুক্ষণের মিনিট দুয়ের একটা সংঘর্ষ। ফাদার পড়ে গেছেন—পল্টন আবার বসেছে তার বুকের উপর। দুটো হাত নেমে আসছে গলায়। সে চেপে ধরল হাত দুটো। কিন্তু নিষ্ঠুর

জোরের সঙ্গে হাতটা নামল—নামল মুখে। আঃ শব্দে নিষ্ঠুর চীৎকার ক'রে সে নামিয়ে দিল তার ধারালো নখ। চোখে। কপালে। নাকে।

—শালা! রোশনি বলে চোখের বাহার! শালা।

—গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর রেখা খেলে গিয়ে সব অন্ধকার হয়ে গেল। ফাদার চীৎকার করেই চলেছেন—হেল্‌প —হেল্‌প—খুন—হেল্‌প—

রাস্তা থেকে লোক ভিড় ক'রে ছুটে এসেছে। পুলিস-ভ্যানের সাইরেন বাজছে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পল্টনের উপর। পল্টন চারিদিক চেয়ে দেখে আবার তার দিকে তাকিয়ে দেখে বললে—শালা হারামী উয়ো শালী কসবী কাঁহা গয়ি? শালী।

ময়দানের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একটি ছায়ামূর্তি তখন গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপে মিশিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

॥ চোদ্দ ॥

পাঁচ বৎসর পর। পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে একটি ছোট ফ্ল্যাটে বিছানায় শুয়েছিল বিখ্যাত বেহালাবাদক জন বিশ্বাস। অন্ধ জন। দুটি চোখ—সুন্দর দুটি চোখ তার দুটি ক্ষত চিহ্নে পরিণত হয়েছে। গলায়ও একটা ক্ষত চিহ্ন। নিষ্ঠুর মৃত্যুদূতের মত ভয়ঙ্কর পল্টনের নখের আঘাত। জন মধ্যে মধ্যে হাত বুলোয় আর ভাবে—বাঘের নখও কি পল্টনের নখের চেয়ে হিংস্র ও কঠিন। পল্টন মৃত্যু-দূত নয়—শয়তানের দূত—চর, তার ক্রোধ তার হিংসামূর্তি নিয়ে জন্মেছিল। পুরাণ সব সময় মিথ্যা নয়—এমনি মানুষের উপমা খুঁজে পাই না, এমন হওয়ার কারণ খুঁজে পাই না—তাই এই কল্পনা ছাড়া তো সিদ্ধান্ত হয় না। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে পল্টন গাছের অন্ধকারে লুকিয়েছিল—সে এসেছিল রোশনিকে অনুসরণ

ক'রে। জন এসে দাঁড়াবামাত্র রোশনি তাকে বলেছিল আর্তকণ্ঠে —পালা! বাচ্চি পালা! পল্টন! পল্টন!

সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র চাপা গর্জন ক'রে পল্টন বেরিয়ে এসেছিল। সে ভয় পেয়েছিল—নিজের দেহের শক্তি এক মুহূর্তে যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঘুরে দাঁড়াবার, আত্মরক্ষার জন্য লড়বার সাহস হয় নি। পালিয়েছিল—ওই বাঘের মত বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে দুর্বল আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টার মতই শেষ চেষ্টা করেছিল সে পালিয়ে। এবং সেই গাছতলার অন্ধকারের মধ্যে কাউকে খুঁজে পায় নি; মনে পড়েছিল ফাদারকে। পার্ক স্ট্রীটেও সে ফাদারের পদশব্দ শুনেছে—তাঁর ডাক শুনেছে। সে তাঁকেই ডেকেছিল —ফাদার—ফাদার! হেল্‌প্‌ মি। ফাদার!

ফাদার তার অনুসরণে ক্ষান্ত হন নি; জন—তার মৃত সন্তানের প্রতিমূর্তি জন—সেই কবর থেকে উঠে আসা ছেলে—সে উন্মার্গ-গামী হয়ে ছুটে পালাচ্ছে শয়তানের হাতছানির ইসারায়—তাকে ফেরাতে এসে ফিরে যান নি। তিনিও চৌরিঙ্গী পার হয়ে এ মাথায় এসেছেন তখন। তিনি শব্দ লক্ষ্য করে সাড়া দিয়ে ছুটে এসেছিলেন। তখন জন গাছের শিকড়ে পা আটকে পড়ে গেছে, পল্টন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হত্যা সে করবেই বাচ্চিকে।

পল্টন কোর্টে বলেছিল—বাচ্চিকে জানসে খতম করে দিব—ই হামার কসম ছিল। সে রোজ—ওই হারামীকে পেলম—উর পর ঝাঁপিয়ে পড়লম—ছুরি চালাব—সাহেব—ওই ওস্তাদ ফাদার হামাকে পাকড়ালে পিছেসে। হামার মগজে তখুন নেশা—চন্‌চন্‌ করছে—উসকে সাথ খুন চড়েছে। হমি ঝাটসে উঠে পহেলেই সাবকে মারলম ছুরি—আর ছুরিটা হাঁতসে নিক্‌লে গেল—সাহেবের কল্‌জা পর আটকে গেলো। কি করব তখুন—রাস্তার পর সোর উঠেছে। সাবটা চিল্লাছে। হমি ফিন বাচ্চির পর ঝাঁপিয়ে

পড়লম। শালার পাঁওটা কিসে আটকে গিয়েছিল। হাতে ছুরি ছিল না—পহলে ধরলম উসকা গলেমে। বড়া বড়া নখ হামার—ওহি দিয়ে খতম করে দিব। তো—উ ভি জোয়ান—জানকে লিয়ে হামার দোনো হাত পাকড়ালে, জোরসে ছাড়িয়ে দিলে—তখুন হামার হাত পড়ল ওর মুখে। ঝটসনি মনে হোয়ে গেলো—কি—সেই বচপনসে রোশনি হারামীর চোখের তারিফ করে। তখন দিলম হামার নখ ওর চোখে বিন্ধে।

আরও বলেছিল—হমার ফাঁসী হোবে হামি জানছে। ওহি হোনা আচ্ছা হ্যায়। কেঁও কি ফাঁসী না হোবে তো হামার দুশমন কোই হাঁতসে জান যায়েগা। বহুত দুশমন হামার। নেহি তো—কোই রোজ—কোই কেস্‌মে পাঁচ দশ বরেষ ফাটক হো যায়েগা। উসসে ফাঁসী আচ্ছা হ্যায়। আফ্‌সোস ভি হ্যায়—ইয়ে সাবটোর জান হম লিয়া। উ আচ্ছা আদ্দমী থা। বহুত আচ্ছা বাজা বাজাতা। হমি শুনেছি। কবরখানে বাজা বাজাতো কভি কভি বর্ষাকে রাতমে, হামি শুনেছি। আঁখসে আঁসু নিকালতা। আউর আফ্‌সোস ওহি কসবী রোশনিকে জান লেনে নহি সকা। বাচ্চি—হারামী—নানী বোলতা থা, কুত্তাকে বাচ্চা; উসকো হামি ভি পেয়ার করতম; আচ্ছা গানা গাহাথা থা—আচ্ছা দোনো আঁখ থা—। উয়ো রোশনিকে সাথ দেখা হোয় গেল; বাস সব বদল গেলো। রোশনিকে হমি আনলম—রহনেকা জাগা দিলম—উসকা বুঢ়োয়া একঠো থা—উকে গাঁজা দিতম, ভাঙ দিতম, রোশনি ডরকে মারে—হামাকে পেয়ার করত লেকিন দিলসে উ পিয়ার করতি থি বাচ্চিকো। উসকা আঁখ আউর সুরতসে উ ভুল গয়ি। বাচ্চিকে জান বহুত রোজ পহেলে লিতম লেকিন উসকা নসীব আচ্ছা। এক রোজ নানীর সাথ ঝগড়া করকে ভাগ গিয়া—কবরস্তানসে গিয়া—হুঁয়াসে এই উস্তাদ সাব—সব লোক উনকে ফাদার বোলতা—আচ্ছা আদমী—ধার্মিক আদমী—

খানদানী আদমী, উসকে উঠায়কে লে গিয়া। আপনা লেড়কার মতুন যতন কিয়া, জানসে বাঁচায়া, লিখাপড়ি ভি শিখলায়া, একদম রইস বনা দিয়া। হমলোক নানীকে খুন করকে—উসকো রূপেয়া উঠা লিয়া। পাকড় গিয়া ওই বাচ্চিকে বাতসে। তখুন উ সাহব বোলা—দেখো বাচ্চি, ঝুট বাত নেহি বোলনা। মৎ বলো। সচ বলো। হাঁ, বাচ্চি সচ বোলা, হামলোক খুন কিয়া নানীকে। লেকিন হামার পিতাজী বহুৎ রূপেয়া খরচা কিয়া—বালিষ্টর দিয়া। কেস ফাঁস্ গিয়া—হমলোক খালাস হো গিয়া। তখুন কসম লিলম—উ হারামীকে জান লিব। উসকে বাদ ওই রূপেয়া লিয়ে রোশনিকে লিয়ে বহুৎ ফুর্তি কিয়া। বুড়োয়ার জান হমি লিলম। দাঙ্গার বক্ত। উসকে বাদ সব কুছ বদল গিয়া। দাঙ্গামে বহুৎ খেলা হমলোক খেলা থা। হমিলোকের যো কুছ থা, সব চলা গিয়া। যো হম গুণ্ডা বন গেয়া। রোশনিকে লিয়ে থাকতম। বহুৎ রুপেয়া উসকে দিয়া পিছে হমারা নামসে হুলিয়া হুয়া—হ ফেরারী হো গয়া, রোজগার গেয়া। হমারা আওর দো আওরৎ হ্যায়, কভি হিঁয়া কভি হুঁয়া রহনে লগা। রোশনি সনঝকে টাইম সে ‘ডিরেস’ করকে বিবি বনকে—হোটেলমে যাতি থি—চৌরঙ্গীমে ঘুমতি থি—রোজগার কর দুপহর রাতমে চলা আতি থি। উসমে সে—হামকো ভি—রূপেয়া দেতি। উসমে হামার কুছু দুখ নেহি হোতা। কুছ না। উ রোজ উ হোটলসে সমুচা রাত লৌট নেহি আয়ি। হামি উ রোজ সামকে উসকি ঘরমে রহেনেকে মতলব লিয়ে এসেছিলম। সমুচারাত যখুন ঘুমল না তখন ভাবনা হুয়া। কেয়া পুলুশ পাকড় লিয়া। তো হোটলমে গিয়া। পুছকে মালুম হুয়া। বহুৎ খুবসুরত এক ছোকরা রইসকে সাথ উ ঘরমেই রহ গিয়া পূরা রাত। তো হম চলা গিয়া। দিনমে রোশনি কি ঘরমে হম নেহি ঠারতা। কেঁও কি পুলুশ জানতা কি রোশনি হামার পেয়ারকে ঔরৎ হোতি হ্যায়। ফিন উ রোজ

সামকো আয়া তো দেখা উ চলি গেয়ি। উ রোজ ভি পুরা রাত উ না লৌটি। তো উ রোজ দিনমে ছুপহরকে বক্ত হম আয়া। আউর উসকো পুছা। কেয়া বাত? কেতনা রোজগার হুয়া? পহেলে উ কুছ নেহি বোলি। দারু দিয়া, বিশঠো রুপয়া ভি দিয়া। লেকিন হমকো চলা যানেকো বোলা। হম উসকে হাত পাকড়া তো হাত ছিনা লিহিস। উ ভি দারু পিয়ি থি—আউর রইস বনা হুয়া—খুবসুরত বাচ্চিকে মহব্বতিসে বাউরা ভি বন গয়ি। মুঝে বোলা—তুম আউর মৎ আও, আয়েগা তো রূপেয়া লেকে চলা যাও, মুঝকো হাত মৎ পাকড়ো—মৎ ছুঁয়ো মুঝে। কভি না। মুঝে তাজ্জব লাগ গিয়া। আরে ই ক্যা বোলতি হ্যায়? ক্যা ব্যাপার? তো গরম গরম বাত হোনে লাগি। ঝগড়া হোয় গেলো। তো হমি তখুন উসকে হাত পাকড়কে এইসা করকে—দাব দিয়া। ছুরি নিকালকে ডর দেখলায়া। তব ভি উ নেহি বোলা। লেকিন হম পল্টন হ্যায়। গুণ্ডা লোগ ভি বোলে—সয়তানকে সাথ হমারা দোস্তি হ্যায়। দো ঘণ্টা বাদ উ কবুল দিয়া। বাচ্চিকে সাথ উসকি মোলাকাত হুয়া। দো দো রাত উসকা সাথ হোটলমে গুজর দিয়া। বহুৎ দারু পিয়া, গানা গায়া। আজ ময়দানমে উসকে সাথ মোলাকাত হোনেকা বাত হ্যায়। হমার দিলমে আগ লাগ গিয়া। জ্বল গিয়া বিলকুল। উয়ো বাচ্চি! উয়ো কুত্তাকে বাচ্চা! নানীকে ঝুড়ি শিরপর লেকে ঘুমতা। ঝুটা উঠাকে খাতা! শালা রইস বন গিয়া। রোশনি উসকে মহব্বতিসে দেওয়ানা হো গয়ি! মুঝে ছোড়কে! ঠিক হ্যায়! মতলব ঠিক কর লিয়া। রোশনিকে হম নেহি ছোড়া এক মিনটকে লিয়ে। রাতকো বোলা—চল্, হম ভি যায়েগা সাথ সাথ। ট্যাক্সি মাঙায়া। কি পয়দলমে যানেসে রাস্তামে গোল উঠায়কে ভাগ যায়েগী। ময়দানমে ট্যাক্সিসে উতারকে উসকে সাথমে লিয়ে হাত পাকড়কে—ঠারনে লাগা—কভি হাত নেহি ছোড়া। রোশনি

চুপ চুপসে কাঁদছিল। হামি বোলা—কাঁদো, খুব কাঁদো—লেকিন মৎ চিল্লাও। চিল্লাবি তো জান মারকে ভাগ যায়েগা হম।

মতলব থা—বাচ্চির জান লিব লিয়ে—কসবীর জান ভি লিব। তু-তিন মিনিটকে কাম। বাস—ভাগ যায়েগা আঁধিয়ারামে। লেকিন ওহি সাহব আয়কে বিলকুল গোলমাল কর দিয়া। রোশনি ভি ভাগ গয়ি আঁধিয়ারামে। উসকি পাতা নেহি মিলা হ্যায়। উ ভাগ গয়ি। লেকিন হামারা আফ্‌সোস হ্যায়—

পল্টনের ফাঁসী হয়ে গেছে। রোশনিকে সত্যই পাওয়া যায় নি।

* *

জন অন্ধ হয়ে বেঁচেছে। শুধু অন্ধ নয়, তার গলাও নষ্ট হয়ে গেছে। ওই পল্টনের নখরাঘাতে গলার স্বরতন্ত্রী জখম হয়েছে। মধ্যে মধ্যে একেবারে বসে যায়। যখন সুস্থ থাকে তখনও স্বরটা ধরা ধরা। জন আর গান গায় না। তবে যন্ত্রী হিসেবে সে বিখ্যাত হয়েছে।

লনা নেই। সে সন্ন্যাসিনী হয়ে কনভেণ্টে চলে গেছে। ঈশ্বরের সেবিকা সে। যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, সংবাদ পেল—ফাদার নেই—তাকে মামলায় সাক্ষী দিতে হবে—সেদিন সে কাতরস্বরে বলেছিল—তা হলে আমাকে লনার কাছে পৌঁছে দিন। লনা—লনা—লনা!

খবরটা দিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রীটের পুলিস-অফিসার। তিনিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন এলিয়ট রোডের বাড়িতে। কিন্তু সে বাড়িতে কেউ ছিল না। তালা বন্ধ ছিল। আশ্রয় নিয়েছিল সে ডেভিডের বাড়িতে। ডেভিডই তাকে খবর দিয়েছিল—লনা বলে গেছে জন যেন তার খোঁজ না করে। ঈশ্বরের সেবা ছাড়া আমার পথ নেই। আমি দুর্বল, আমি খোঁড়া। তা ছাড়া,

আর সম্ভবপর নয়। তার আর আমার মধ্যে ফাদারের রক্তের নদী বইছে। সেও সইতে পারবে না আমার মত নির্জীবকে, আমি সইতে পারব না তার জীবনের উত্তাপকে। ফাদার তাকে সমস্ত বাজনাগুলি দিয়ে গেছেন। আমাকে দিয়ে গেছেন বাড়িটা। আমি বিক্রী করে দিচ্ছি বাড়ি। ফাদার একহাজার টাকাও জনকে দিয়েছেন। সব পাবে এ্যাটর্নীর কাছে গেলে।

তারপর সে নাকি সজল চোখে ডেভিডকে বলেছে—আমাকে ভুলে যেতে বলবেন মিঃ ডেভিড। ঈশ্বরকে স্মরণ করে আমিও তাকে ভুলতে চেষ্টা করব। বাজনাগুলি আর ফাদারের দেওয়া টাকা সে যেন নিয়ে আসে। ফাদার বলে গেছেন, তাকে বলো—আমি তাকে ক্ষমা করেছি। যা দিয়ে গেলাম সে যেন ছেলের অধিকারেই গ্রহণ করে। এবং তাকে আমি গান শিখিয়েছি। সেই গান গেয়ে সে যেন জীবিকা উপার্জন করে, প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। আর নির্জনে নিরালায় সে যেন গান গেয়ে ভগবানের নাম করে।

চাচী চলে গেছে বেনাগড়িয়া।

জন একা সংসারে। দেহ তার ভগ্ন। তার সে লাবণ্য নেই। নাকটা খাঁড়ার মত দাঁড়িয়ে উঠেছে। অন্ধ চোখের চারিটা পাশ কালো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে নিদারুণ প্রহারের চিহ্ন। চারটে বৎসর তার চলেছে বিচিত্র ভাবে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষে করেছে। চাইতো না। বাজনাই বাজাত। যে যা ইচ্ছে দিয়ে যেত। বস্তীতে থাকত।

ডেভিড তাকে অনেক বলে—বুঝিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে নিয়ে যায়। বেহালার দুখানা রেকর্ড হিট হয়। তারপর নাম ছড়ায়। তারপর আবার তার খোঁজ থাকে না। ডেভিড তাকে পায় একটি মেয়ের বাড়িতে। তখন বাসা তার হোটেলে। যখন

নিয়ে আসে মদে সে তখন অচেতন। অসুস্থ হয়ে জনই ডেভিডকে খবর দিয়েছিল।

ডেভিড নিয়ে এসে এই ফ্ল্যাট ভাড়া করে তাকে রেখেছে। টাকার তার খুব অভাব ছিল না। রেকর্ডের মারফত খ্যাতি অর্থ দুই হয়েছিল। চিকিৎসায় জন বেঁচে ওঠে। আবার কিছুদিন সুস্থ। কিছুদিন অসুস্থ। মধ্যে মধ্যে ছুটে যায় কবরস্থানে। ফাদারের কবরে বাজনা শুনিয়ে আসে। কখনও চার্চের বাইরে দাঁড়িয়ে বাজায়। এবার কঠিন অসুখে পড়েছে। কি হয়েছে—ঠিক ধরা যায় নি। তবে দিন দিন শীর্ণ হচ্ছে। দুর্বল হচ্ছে।

এ ক'মাস আগেও গাড়ি করে বেহালা রেকর্ড করে এসেছে। আর শক্তি নেই।

ডেভিড তার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। বিশ্বজগতে সেই শুধু তার আপন জন। ডেভিড থেকেই তো তার সব। সেই তাকে থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ডেভিডই তাকে বার বার ফিরিয়ে এনেছে জীবনের দুই বিপরীত প্রান্ত থেকে। কখনও জন সব ছেড়ে পথে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষে করেছে, কিছুতেই ফিরতে চায় নি। ডেভিড দিনের পর দিন অনুরোধ ক'রে ফিরিয়েছে। তাকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে নিয়ে গেছে, হোটেলে নিয়ে গেছে। চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে। ক্রমে জনের খ্যাতি হয়েছে। অর্থ পেয়েছে। আবার সে মদ ধরেছে—উন্মত্তের মত নারীর পিছনে ছুটেছে। বার বার অসুস্থ হয়েছে। ডেভিডই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়েছে। সারিয়েছে। কিছুদিন হোটেলে ছিল। কিন্তু সেখানে জনের স্থান হয় নি। মাতাল জন রাত্রে—নিশীথ রাত্রে বেহালা বাজায়। সে বাজনা শুনে মানুষের অন্তর এমনই হায় হায় করে যে তারা তা সহ্য করতে পারে না। শেষ নিজের ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাটে তাকে এনেছে। একটা চাকর আছে।

জন আবার ধরাগলায় ডাকলে—ডেভিড!

ডেভিড ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে ফিরে এল—জন!

জন মাথার বালিশের তলায় হাত দিয়ে একখানা চিঠি খুঁজে বের ক'রে তার হাতে দিয়ে বললে—আমার মৃত্যুর পর—

—জন! কেন মৃত্যু মৃত্যু করছ—

—ডেভিড, আমি জানি—আমি বুঝতে পারছি এবং আমি চাই। তাই আমি চাই। বড় কষ্ট—

—শরীর সুস্থ হলেই ও সব থাকবে না জন

—শরীরের কষ্টই কি কষ্ট ডেভিড! আমার অন্তরের কষ্ট তুমি জান না। অবশ্য জানা উচিত। এ কষ্ট এ ব্যাধিতে সব—সব মানুষ ভুগছে। জীবনে অনেক দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ঈশ্বর। সবারই কিছু কিছু থাকে—আমার অনেক ছিল। দেহ—রূপলাবণ্য—সুন্দর কণ্ঠস্বর—অনেক। বস্তিতে পড়েছিলাম। ফাদার আর লনা এলেন জীবনে। ঈশ্বরের তপস্যা একজন—একজন মূর্তিমতী পবিত্রতা। আমাকে কত দিলেন। কিন্তু পাপ—বস্তির পাপ—হয়তো জন্মগত পাপ—মানুষের ধাতুগত পাপ আমাকে টেনে নামিয়ে দিলে। কি হ'ল আমার? ডেভিড, আমি এক এক সময় ভিক্ষে করতাম—কেন জান? সে আমার পবিত্রতার তপস্যা। আবার হঠাৎ টানত পাপ। অন্ধ হয়েছি, চোখ কেড়ে নিলে, পাপ নিলে, এমন কণ্ঠস্বর নিলে—তবু—তবু এর কি অমোঘ আকর্ষণ ডেভিড, অন্ধ আমি নারীদেহ খুঁজেছি, কান দিয়ে চোখের অভাব ঘুচিয়েছি। কণ্ঠস্বর শুনলে নারীর তারুণ্য আমি বুঝতে পারি। একদিনের কথা বলি ডেভিড। আমি ভিক্ষে করি। তুমি যাও, অনুরোধ কর কর্মজীবনে ফিরতে। ফাদারের দোহাই দাও। আমি ফিরি নি। ফিরলাম একদিন। কেন ফিরলাম জান? তোমার কথায় নয়। সেদিন ভিক্ষে করছি, একে থমকে দাঁড়াল। মিষ্টি গন্ধ পেলাম। মন চঞ্চল হল—

নারী নারী। হঠাৎ চাপাগলায় সে বললে—জন! জনকে [illegible]।
কে? কে? সে বললে—আমি সুমি। তুমি এমন হয়েছ?
আমি জানি সব। কাগজে পড়েছি। ভিক্ষে করছ। সেই দিন
ফিরলাম। অর্থ চাই। যেদিন অর্থ হল, আমার রেকর্ড হিট
হল—সেদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে সুমির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।
সেদিন তাকে চাই নি—চেয়েছিলাম লনাকে। কিন্তু যেতে সাহস
হয় নি। জান ডেভিড, সারা পৃথিবীতে এই বিয়োগান্ত নাটক।
মানুষ উঠতে চাচ্ছে—পারছে না। উপর থেকে যে টানে সে যদি
একটু নেমে আসত ডেভিড! লনা—পবিত্র লনা যদি এগিয়ে
এসে আমায় টেনে নিত!

তাই লিখলাম লনাকে। ঈশ্বরের তপস্যা করছ। তাঁকে
বলো—তোমার মত পবিত্রতার মূর্তি যারা তারা কি একটু উত্তাপ
নিয়ে আবেগ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে না! কেন তিনি
তোমাকে পঙ্গু করলেন, দুর্বল করলেন?

হয়তো মানুষ জয়ী হবে। কিন্তু সে কবে? আমরা তো
হেরে গেলাম।

—রাখ, পত্রখানা রাখ। তুমি নিজে হাতে লনাকে দিয়ে এস।
বলো যেন ফেলে না দেয়। পড়ে।

—দাও, আমার বেহালাটা দাও। বাজাই।

কাঁদতে লাগল বেহালা। জনের চোখ থেকেও ধারা গড়াচ্ছিল।
ডেভিড জানালায় উদাস মনে দাঁড়িয়ে আছে। সুরটা ছড়িয়ে
পড়ছে আকাশে বাতাসে।

॥ সমাপ্ত ॥